৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ ■ আনন্দমেলা পত্রিকা ■ সাত টাকা

আনন্দমেলা

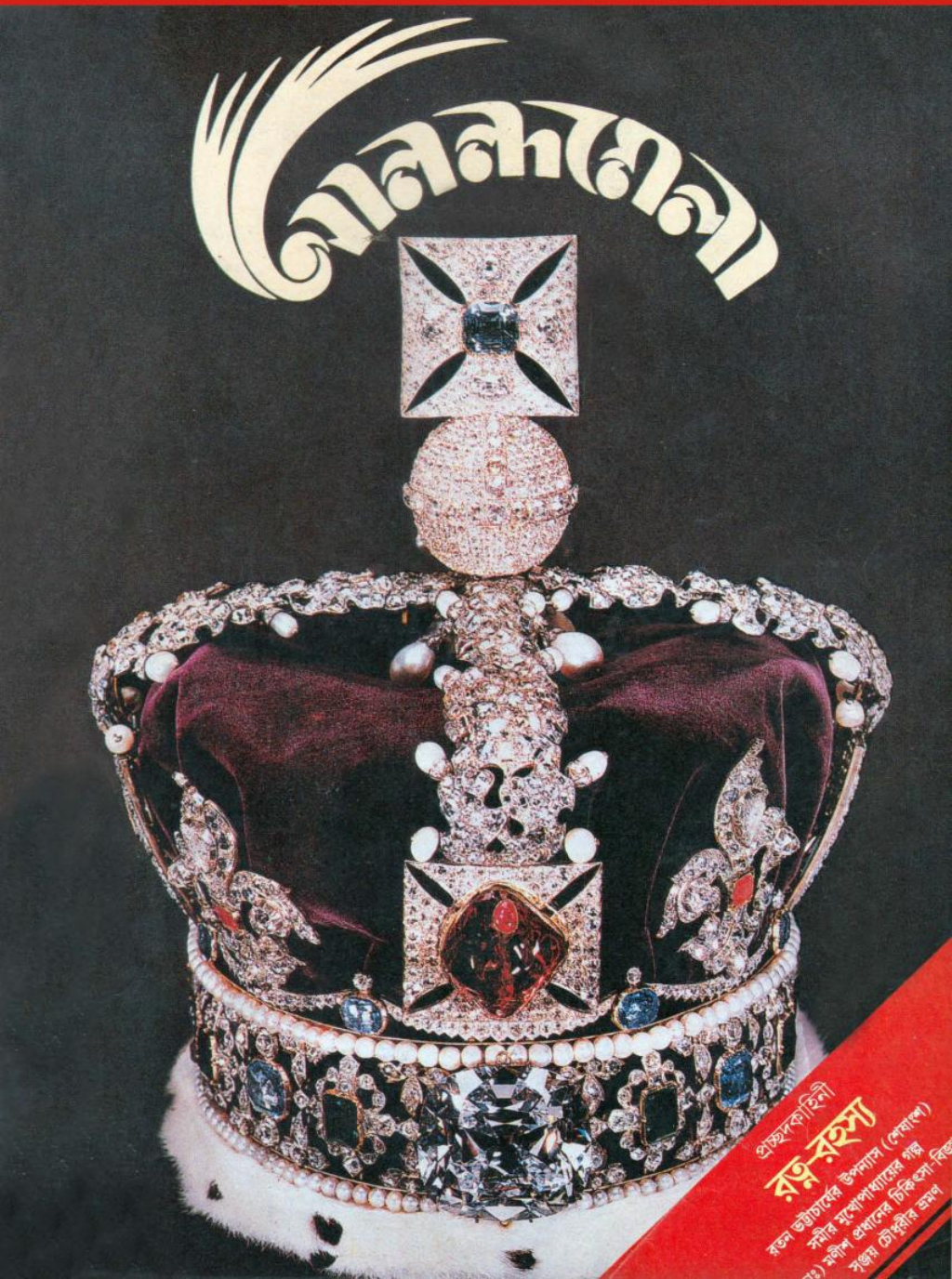

প্রচ্ছদকাহিনী
রত্ন-রহস্য
রতন ভট্টাচার্যের উপন্যাস (শেষাংশ)
সমীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প
মণীশ প্রধানের চিকিৎসা-বিজ্ঞ
সঞ্জয় চৌধুরীর ভ্রমণ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

শুভ্রতার চমক বেশী

রিন একটুখানি

একটুখানি রিন বোলান....তাতেই দেখুন কাপড়ে শুভ্রতার কি চমক! সে এমন এক শুভ্রতা, যা অন্য কোনো ডিটারজেন্ট কেকের সাধ্যের বাইরে।

সুপার পাওয়ার রিন-এর মহাশক্তিই এর কারণ। সেইজন্যই তো রিন – আনে শুভ্রতার চমক বেশী, কাপড় ধোয় রাশি রাশি। আর আপনার রিন লাগে একটুখানি।

মহাশক্তি রিন

হিন্দুস্তান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্যে বরদান

১ কিলো চকোলেট কমপ্লান

Complan®
COMPLETE PLANNED FOOD
CHOCOLATE FLAVOUR

FREE!
Collect a ceramic mug with this pack.

No need to add milk

বিনামূল্যে!

৫০০ গ্রামের দুটিন চকোলেট কমপ্লান কেনার বদলে, ১ কিলোর একটিন কিনুন আর ৪/- টাকা বাঁচান, সঙ্গে লাভ করুন বিনামূল্যে একটি সেরামিকের মগ্ !
কমপ্লান-এ আছে আপনার পরিবারের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

আজই কিনুন !

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

কমপ্লান®

GX/58/244 BEN

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

রেলগাড়ির কামরায় রতন ভট্টাচার্য ৭০

গল্প

চাকা-চরিত সমীর মুখোপাধ্যায় ৩২
লাশকাটার রূপকথা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮
বিন্নির খই, লাল বাতাসা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮

প্রচ্ছদকাহিনী

রত্ন-রহস্য ১২
কোহিনূরের সন্ধানে সঙ্কর্ষণ রায় ১৩
রত্ন-কাহিনী চঞ্চল পাল ১৮

বিজ্ঞানবিচিত্রা

লুই পাস্তুর অরবিন্দ পাল ৩৮
করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি (ডাঃ) মণীশ প্রধান ৮৩
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ৮৬

কবিতা

ভাদ্রের কবিতা হেমন্তবালা দেবী ৭
খুকুমণির ছড়া দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭

কলকাতা ৩০০

দিগ্‌দর্শন থেকে রামধনু সিদ্ধার্থ ঘোষ ৫৭

ভ্রমণ

প্রাণচঞ্চল নিউ ইয়র্ক সৃঞ্জয় চৌধুরী ৫২

কেরিয়ার গাইড

বিমান-সেবিকা হতে হলে দেবাশিস দত্ত ২২

কমিকস

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৬১, গাবলু ৬৯, টিনটিন ৮৭, পক্ষরত্ন ৮৯

বিদ্যালয়-পরিচিতি

জেনকিনস স্কুল, কোচবিহার নীরদ রায় ৯১

খেলাধুলো

বিশ্বকাপ ফুটবল ···তরুণ রায় ৪১
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪২
দেশের হয়ে খেলতে চায় শঙ্কর রাজীব রায় ৪৪
আমি সুমিতা লাহা ৪৫
টেনিসে সুইডেন ··· সমীরণ নন্দী ৪৬
লিনেকার কি পারবেন ··· অঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪৭
খেলার খবর ৪৮
ইভান লেন্ডল ৪৯, গ্যারি লিনেকার ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, কে প্রথম ১০, কুইজ ২৫, শব্দসন্ধান ৩৭, নিজের হাতে বানাও ৬৮, আকাশে ওড়ার কথা ৮১, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৯৫, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

৫২

মাইলের পর মাইল জুড়ে যতদূর চোখ যায় শুধু গাছ আর গাছ। বস্টন থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে এই দৃশ্য চোখে পড়বে। সেই নিউ ইয়র্ক, মার্কিন দেশের মানুষ যাকে বলে

১২

রত্নের আকর্ষণ দুর্নিবার। রত্নের খোঁজে মানুষ দুর্গম পাহাড় থেকে শুরু করে গভীর সমুদ্রের তলদেশে পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছে। নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়েছে খনির অন্ধকারে। আর এভাবেই হাতে এসেছে মূল্যবান এক-একটি রত্ন। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে এরকমই কিছু রত্নের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত কোহিনুর কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় গোলকোণ্ডা হিরের খনির খ্যাতি কী করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিদেশী পর্যটকরা কেন ভারতকে 'হিরের দেশ' বলেছিলেন, এসব বিষয়ে জানানো হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এ ছাড়াও আছে চুনি, পান্না, গোমেদ ইত্যাদি রত্নের কথা।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'বিগ অ্যাপল'। এক সময় গাছের সংখ্যা কমে আসে। বাড়তে থাকে বাড়ির সংখ্যা। তারপর হাডসন নদীর সেতু পেরিয়ে নিউ ইয়র্ক। এবারের ভ্রমণ এই নিউ ইয়র্ক শহরে। মানহাটান থেকে হারলেম-এ। বিভিন্ন সংগ্রহশালায়।

২২

বিমানযাত্রীদের সেবার জন্য মহিলাদের নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এলেন চার্চ। তখন মহিলাযাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। চার্চ বলেছিলেন, বিমান-সেবিকারাও রোজ বিমানে যাচ্ছেন, এটা জানতে পারলে তাঁদের বিমান ভ্রমণের ভয় কেটে যাবে। আর এখন বিমান সেবিকার কেরিয়ার বেশ লোভনীয়।

৩২

"চাকাকে দেখুন। আমাদের কলোনিকে ও একাই ফেমাস করে ছেড়েছে।" সমীর মুখোপাধ্যায়ের নতুন স্বাদের গল্প 'চাকা-চরিত'।

৪৬

বিয়র্ন বর্গ-এর দেশ সুইডেন থেকে উঠে এসেছেন নামীদামি সব টেনিস-খেলোয়াড়।
ফর্মে থাকলে এঁরা যে-কেউ যে-কোনওদিন বিশ্ব-টেনিসের শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়টিকেও হারিয়ে দিতে পারেন। টেনিসে সুইডেন কী করে এত সফল হল সে-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে একটি নিবন্ধে।

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদকাহিনী : সন্দীপ রায়ের ছবি

গুপী-বাঘা ফিরে এল

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস (প্রথমাংশ)

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

শিশির কর ও চুনীলাল রায়ের গল্প

Disproportionate Returns for SMALL INVESTMENTS & What more & Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:
1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?
ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ ও তিন ইঞ্চি ব্যাসের দূরবিন

আনন্দমেলা ৯ অগস্ট সংখ্যায় পীযূষকান্তি ঘোষের লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র সম্পর্কে চিঠি পড়ে এ-প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই।

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র (১৬-৭-১৮৭৮—৩-৪-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর দীর্ঘজীবনের সঞ্চিত মূল্যবান গ্রন্থসামগ্রী ও তাঁর ব্যবহৃত একটি তিন ইঞ্চি ব্যাসের দূরবিন বারাসাতে অবস্থিত তাঁর বাড়ির কাছের সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ নামে একটি স্কুলকে দিয়েছিলেন। তবে এর পিছনেও একটু ইতিহাস রয়েছে। সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ ও বারাসাতের আরও কয়েকটি স্কুল 'সত্যভারতী' নামে সমাজসেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরি। আমি বারাসাতের এই প্রতিষ্ঠানের একেবারে শুরু থেকে একজন সক্রিয় সদস্য। বলতে বাধা নেই, এই প্রতিষ্ঠান থেকেই অশেষ গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে রাধাগোবিন্দ চন্দ্রকে আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবার সুযোগ পেয়েছিলাম—প্রতি বছর ১ শ্রাবণ (অবশ্য তিথি অনুসারে তিনিই দিন ধার্য করে দিতেন) সামান্য হলেও একটি ধুতি, চাদর, মিষ্টির প্যাকেট, ফুলের মালা সহকারে তাঁকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানানো হত। এই ভাবেই সত্যভারতীর সঙ্গে তাঁর যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতেই তিনি সত্যভারতী প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুসামগ্রী আনন্দের সঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পীযূষবাবুর বর্ণিত ব্যক্তিরাও আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

রাধাগোবিন্দবাবুর বিভিন্ন বক্তৃতায় (সত্যভারতী আয়োজিত) শুনেছি, তাঁর ব্যবহৃত আরও একটি দূরবিনের কথা, তবে সেটি আমি কখনও দেখিনি। বর্তমানে সেটি দক্ষিণ ভারতের কাভালুর মানমন্দিরে রয়েছে।

পীযূষবাবুর সঙ্গে আমিও একমত, রাধাগোবিন্দবাবু যে-উদ্দেশ্যে তাঁর

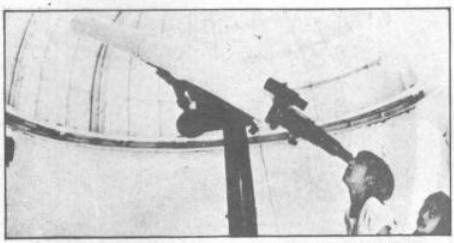

তিন ইঞ্চি ব্যাসের এই দূরবিনটি কিনেছিলেন রাধাগোবিন্দ চন্দ্র

পুস্তক ও দূরবিনটি সত্যভারতী বিদ্যাপীঠকে দান করেছিলেন তা কার্যকর হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে এই মূল্যবান দূরবিনটি একজন শিক্ষকের বাড়িতে আছে বলে শুনেছি। এবার জুলাই (১৮-৩০ জুলাই) মাসে কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম রাধাগোবিন্দ সম্পর্কে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, সেখানেও এই দূরবিনটি ওই শিক্ষকের বাড়ি থেকে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। আমার মনে হয়, রাধাগোবিন্দ-স্মৃতিবিজড়িত তিন ইঞ্চি ব্যাসের এই দূরবিনটি এভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় না থেকে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম বা এ-ধরনের কোনও সংস্থাকে দেওয়া উচিত, যাতে এটির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব।

জীবনরতন কাঞ্জিলাল
নবপল্লী, বারাসাত

জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র সম্পর্কে ৯ অগস্ট আনন্দমেলায় প্রকাশিত পীযূষকান্তি ঘোষের চিঠির কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য এ-চিঠির অবতারণা। তাঁর চিঠিতে এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জেনে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

রাধাগোবিন্দ-ব্যবহৃত দুটি টেলিস্কোপ-এর মধ্যে একটি তিন ইঞ্চি, অন্যটি ৬½ ইঞ্চি ব্যাস-যুক্ত। তিন ইঞ্চি টেলিস্কোপটি তিনি ইংল্যান্ডের F. Bernard নামে এক টেলিস্কোপ বিক্রেতার কাছ থেকে ১৬০ টাকা (রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের রোজনামচায় আছে—মোট ১৬০ টাকা ১০ আনা ৬ পয়সা) দিয়ে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সংগ্রহ করেছিলেন। সত্যভারতী বিদ্যাপীঠকে আসলে এই টেলিস্কোপটি রাধাগোবিন্দ চন্দ্র দিয়েছিলেন। বর্তমানে এটি এই বিদ্যালয়েই থাকার কথা।

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র ৬½ ইঞ্চির অন্য টেলিস্কোপটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে পেয়েছিলেন। আমেরিকার হার্ভার্ড অবজারভেটরির 'আভসো' (The American Association for Variable Star Observers সংক্ষেপে AAVSO) সংস্থা ও Mr Elmer ওদেশ থেকে সুদূর যশোরের গ্রামে রাধাগোবিন্দকে পাঠিয়েছিলেন, তবে এই টেলিস্কোপটি মূলত দুটি শর্তে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। (১) এই যন্ত্রে প্রত্যক্ষ করা বিষয়গুলি হার্ভার্ড অবজারভেটরিতে পাঠাতে হবে। এবং (২) ব্যবহার শেষে টেলিস্কোপটি হার্ভার্ড অবজারভেটরিকে ফেরত দিতে হবে। দেশবিভাগের পর রাধাগোবিন্দ যশোর ছেড়ে প্রথমে পানিহাটিতে কিছুদিন ছিলেন। এইখানে এই টেলিস্কোপটি পানিহাটির ত্রাণনাথ বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। পরে রাধাগোবিন্দ সপরিবারে স্থায়ীভাবে বারাসাতে স্থানান্তরিত হলে তিনি হার্ভার্ড অবজারভেটরিকে টেলিস্কোপটি ফেরত নিতে অনুরোধ জানান। অবশেষে এটি এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেইনু বাপু (এম. কে. ভেইনু বাপু ১০-৮-১৯২৭—১৯-৮-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) নৈনিতাল অবজারভেটরিতে থাকাকালীন এই টেলিস্কোপটি হার্ভার্ড অবজারভেটরির অনুমতিক্রমে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাছে আসে। তবে পানিহাটি থেকে ঠিক কবে ভেইনু বাপুকে যন্ত্রটি দেওয়া হয়েছিল অথবা কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল কি না জানা নেই। পরে ভেইনু বাপু টেলিস্কোপটি কাভালুর অবজারভেটরিতে অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে স্থানান্তরিত করেন। এই অবজারভেটরির বর্তমান ডিরেক্টর ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জানা যায় রাধাগোবিন্দ-ব্যবহৃত এই টেলিস্কোপটি 'বাপু-চন্দ্র টেলিস্কোপ' নামে কাভালুর-এ স্থাপিত আছে।

রণতোষ চক্রবর্তী
সম্পাদক, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি
নবপল্লী, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

আনন্দমেলা
গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়
এক বৎসর
১৮২.০০ টাকার পরিবর্তে
১৫৫.০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর
৩৫৪.০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০.০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)
আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফ্‌ট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান :
সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
ডাক মাশুল লাগবে না

ভাদ্রের কবিতা

হেমন্তবালা দেবী

হপ্তাখানেক গুমোটের পর
আজকে নামল বৃষ্টি,
ঘরকন্নায় শুরু হয়ে গেল
রাজ্যের অনাসৃষ্টি।
না পারি ছবিটি আঁকতে,
হিসেবপত্র রাখতে—
যেদিকে তাকাই ঘোলাটে ধোঁয়াটে
চলে না স্বচ্ছ দৃষ্টি।

দরকারি কাজে যাবেন শম্ভু
ছত্র নেইকো মাথাতে,
কাকভেজা হয়ে সাতসকালেই
চলেছেন কলিকাতাতে।
ফিরে এসে যদি বলেন, 'গা ব্যথা',
ওষুধের দাম বলো পাব কোথা ?
মাসের শেষেতে নামল বাদল
ঘনমেঘ কালীকৃষ্টি।
ভালয় ভালয় ছেড়ে গেলে বাঁচি
হাসুক শরৎ মিষ্টি।
নদীতীরে মাথা দোলাক না কাশ
আসুক হরেক ফুলের সুবাস
সোনালি-রুপোলি আলোর বন্যা
শেফালি পুষ্প-বৃষ্টি।

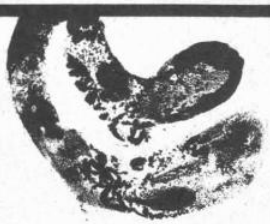

খুকুমণির ছড়া

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জড়ামড়ি দুটো ছড়া সেই খুকুমণির ছড়ার বইয়ে
ছেঁড়া পাতে শুয়ে হানটান করে উঠছে নাপার হয়ে।
খুকু বড় হয়ে অবধি কেউ আর ডাকে না : কই রে, এলি ?
এত যে ডাকছি পুতুল আর আমি, খেলি !

ছেঁড়া পাতখানা আরো ছিঁড়ে খায় পোকাতে-ধুলোতে মিলে।
ভয় করে, বুঝি এখুনি তাদেরও গায়ে পড়ে ছিঁড়ে নিলে !
হাঁ করে দেখে, সে গান কই ? সেই কুহুগান, গলা জোড়া ?
উঠতে যেতেই ও মা ! খসে গেল তোড়া !

ও মা ! সেই যে সে নিদুলিমাসির দাওয়া-মেলা ফুলপাটি,
চারধারে সোর করছে খুকুর পুতুল আর খেলাবাটি।
আর যেদিনকে সীতেনাথ আসে—সে কী মজা ! সে কী ধুম !
তোড়া-পরা ছড়া নেচে ঘোরে ঝুমঝুম...

নিদ-পড়া দিন, ঘুম-ছোটা রাত, কত কার আসা যাওয়া—
ঘোর পাতা ছড়া নেচে ঘোরে, যেন কানা মেঘে দিশে-খাওয়া !
মাসি রয়ে রয়ে তারই মাঝে খালি কাঁদে আর ছড়া পড়ে—
খুকু বলে খালি : ও মাসি গো, তারপরে ?

তারপর ভরদিন ধরে জ্ঞাত-কুটুমের ডাকাডাকি,
জড়ামড়ি ছড়া ডানায় ঝাপ্‌টে উড়ে ভেসে পড়ে পাখি—
দেখে, খুকু নায় চুল আছাড় দিয়ে ঘাটে, তার সোনা-গোলা
ঘরটুকু তারই চোখের ধারায় ঘোলা !

কেঁচো-খোঁড়া দাওয়া, চিকচিক করে আষাঢ়ে গাছের ডগা।
আনমনা হয়ে ঠায় বসে বসে ঢোলে বগি আর বগা।
ছেঁড়া পাতখানা আরো ছিঁড়ে খায় পোকাতে-ধুলোতে মিলে,
এবারে তাদেরও খেলে বুঝি গোটা গিলে !

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নিস্তব্ধ রাত। যজ্ঞশালায় কেউ নেই, শুধু মহারাজ মহাচূড়ামণি আর রাজপুরোহিত ছম্ভী বসে আছেন মুখোমুখি।

মহারাজ এক-একবার ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন, কেঁপে উঠছে তাঁর সর্বাঙ্গ। আবার তিনি দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছেন হুহু করে। এমন গভীর সংকটে তিনি জীবনে পড়েননি!

চম্পক বিদ্রোহ করেছে। মহাচূড়ামণি এক ফুৎকারে সেই বিদ্রোহ দমন করে দিতে পারেন। কিন্তু চম্পককে মারতে গেলে মহারানি তলতাদেবীকে বাঁচানো যাবে না। সেই পাষণ্ডটা দূর থেকে মহারাজের সৈন্যবাহিনী দেখতে পেলেই তলতাদেবীকে হত্যা করবে বলেছে। মহারানিকে হারালে এ-রাজ্য ফিরে পেয়েও লাভ কী?

রাজাদের অনেক রানিও থাকে। এক রানি গেলে তার বদলে অন্য রানি পাওয়া যায়। কিন্তু রাজ্য চলে গেলে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু তলতাদেবীর সঙ্গে অন্য কোনও রানিরই তুলনা চলে না। তাঁর বুদ্ধিতেই এতদিন এই রাজ্য চলেছে। মহারানিকে হারিয়ে মহারাজ আর কিছুই পেতে চান না।

একসময় চোখের জল মুছে রাজপুরোহিতকে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে এখন কী উপায়?"

ছম্ভীও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মহারাজ, আমি তো কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না!"

মহাচূড়ামণি বললেন, "তবে কি এই রাজ্য, আমার এই প্রিয় রাজ্য আমি ওই উল্লুকটার হাতে তুলে দেব? যে সিংহাসনে আমার ঠাকুর্দা বসেছেন, আমার বাবা বসেছেন, আমি বসেছি, সেখানে এসে বসবে ওই নরকের কীট?"

ছম্ভী আঁতকে উঠে বললেন, "চম্পক এসে বসবে এই সিংহাসনে! তার আগে আমি এই রাজ্য ছেড়ে বিবাগী হয়ে চলে যাব।"

মহাচূড়ামণি বললেন, "তবে কি আপনি বলতে চান, মহারানির জীবনের বিনিময়ে আমি বিদ্রোহ দমন করব?"

ছম্ভী এবারেও একইরকম ভাবে বললেন, "না, না, মহারাজ, তিনি এই রাজ্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। যেদিন থেকে তিনি এই রাজ্যের রানি হয়ে এসেছেন, সেইদিন থেকেই এখানকার কত উন্নতি হয়েছে। এই তো সেদিন তাঁর বুদ্ধিতেই দাবানল থেকে রক্ষা পেল রাজধানী। মহারানিকে বিসর্জন দিলে এই রাজ্যের সাঙ্ঘাতিক অকল্যাণ হবে।"

"তা হলে আমি এখন কী করব, বলে দিন!"

"অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না, মহারাজ!"

"অপেক্ষা করব? কতদিন অপেক্ষা করব? আমার মহারানি এই মর্কট চম্পকের হাতে বন্দিনী, এটা আমি এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছি না! মহারানিকে মুক্ত করতে না পারলে আমার আর ঘুম হবে না! ওঃ, ওঃ, আমার আর ঘুম হবে না! আমি এখন কী করব?"

"মহারাজ, শান্ত হোন! শান্ত হোন!"

"কী করে শান্ত হব, গুরুদেব? আমার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে। আমার মাথা ঘুরছে।"

রাজপুরোহিত ছম্ভী চক্ষু বুজে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "একটাই মাত্র উপায় আছে!"

মহাচূড়ামণি লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, "আছে? আছে? উপায় আছে? কী করতে হবে, এক্ষুনি বলুন!"

ছম্ভী বললেন, "ভাল করে শুনুন, মহারাজ। চম্পক জানিয়েছে যে, আপনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে গেলেই সে আগে মহারানি তলতাদেবীকে হত্যা করবে। তার এ-কথা মিথ্যে হবে না। মহারানির মৃত্যুর ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না!"

মহাচূড়ামণি বললেন, "তা তো কিছুতেই নিতে পারি না।"

ছম্ভী বললেন, "মহারানির বিনিময়ে চম্পক আপনাকে বিনা যুদ্ধে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বলেছে। সেটাও সম্ভব নয়।"

মহাচূড়ামণি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "বিনা যুদ্ধে ওকে আমি সিংহাসন ছেড়ে দেব? মামার বাড়ির আবদার? তার আগে, আমি এই সিংহাসন ভেঙে টুকরো টুকরো করব, সারা রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেব! ওই শকুনির ডিম চম্পকটা কিচ্ছু পাবে না!"

ছম্ভী বললেন, "এত প্রজাসমেত গোটা রাজ্যটা ধ্বংস করাও তো কাজের কথা নয়। আমি অন্য একটা উপায় চিন্তা করেছি। চম্পকের চিঠির কথা আমরা কাউকে জানাব না। সেনাবাহিনীকে আমরা যুদ্ধের সাজে সাজাব না। এই রাত্রে সবাই যেমন ঘুমিয়ে আছে, তেমন থাক। চম্পকের চর আছে নিশ্চয়। সে জানবে, তাকে আমরা আক্রমণ করতে যাচ্ছি না।"

মহাচূড়ামণি অস্থিরভাবে বললেন, "তাতে কী লাভ হল? তাতে তো আর মহারানি উদ্ধার পাচ্ছেন না!"

ছম্ভী বললেন, "আমার পরিকল্পনা পুরোটা শুনুন, মহারাজ। আমরা সৈন্য সাজিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছি না জেনে চম্পক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে। সেই সুযোগে আমরা যাব।"

মহাচূড়ামণি বুঝতে না পেরে বললেন, "আমরা যাব মানে? আমরা কোথায় যাব?"

"চম্পকের শিবিরে।"

"চম্পকের শিবিরে! আপনি কী বলছেন, গুরুদেব? চম্পকটা একটা উল্লুক হতে পারে, কিন্তু সে কি এতই গর্দভ যে, শিবিরের সামনে পাহারা রাখবে না? সেখানে নিশ্চয় অষ্টপ্রহর প্রহরীরা থাকবে। আমরা যত গোপনেই যাবার চেষ্টা করি, সেই প্রহরীরা আমাদের দেখেই শিঙা বাজিয়ে দেবে। সবাই জেগে উঠবে। আর তক্ষুনি যদি চম্পক হত্যা করে মহারানিকে?"

"আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। চম্পক কোথায় শিবির খাটিয়েছে জানেন? রাজ্যের উত্তর প্রান্তের জঙ্গলে। এই জঙ্গলটা কোথায় আপনার মনে আছে? জঙ্গলের পেছনেই একেবারে খাড়া পাহাড়। মহারানির সঙ্গে যে গুপ্তচরটি গিয়েছিল, সে পালিয়ে এসেছে কোনওক্রমে। তার কাছে আমি শুনেছি, চম্পকের নিজের শিবির একেবারে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে, পাহাড়ের গায়ে। যাতে পেছন থেকে কোনও শত্রু তাকে আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু মহারাজ, এই

পাহাড়ের একটা সুড়ঙ্গপথের কথা আমি জানি। সেই সুড়ঙ্গপথে গিয়ে আমরা চম্পককে অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারি।"

মহাচূড়ামণি কয়েক পলক ছত্তীর দিকে তাকিয়ে কথাটা ঠিকমতন বুঝে নিলেন। তারপর উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "পাহাড়ে সুড়ঙ্গপথ আছে ? এ-কথা এতক্ষণ বলেননি কেন ? চলুন, চলুন, আর দেরি নয়।"

ছত্তী তবু চিন্তিতভাবে বললেন, "মহারাজ, যেতে হবে খুব সঙ্গোপনে। কাক-পক্ষীটিও যেন টের না পায়। কোথায় কোন্ বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে, তার ঠিক কী ?"

মহাচূড়ামণি বললেন, "শুধু আপনি আর আমি যাব। কেউ টের পাবে না।"

ছত্তী বললেন, "আরও একটা কথা আছে। সুড়ঙ্গপথ ধরে নেমে গিয়ে প্রথমেই চম্পককে হত্যা করতে হবে, তার সৈন্যরা কেউ কিছু বুঝবার আগেই। না হলে কিন্তু আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না।"

মহাচূড়ামণি বললেন, "সে ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। চম্পককে দেখামাত্রই আমি তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দেব। মৃত্যুর সময় সে যদি বিকট চিৎকার করে, তাতেও কিছু আসে যায় না। তার পঞ্চাশ-একশোজন সৈন্য তা শুনে ছুটে এলেও আমি একাই কচু-কাটা করব তাদের।"

ছত্তী বললেন, "তার আর প্রয়োজন হবে না। চম্পক নিহত হলেই অন্য সৈন্যরা আপনাকে দেখে ভয় পাবে। চম্পক ছাড়া মহারানির শরীরে হাত ছোঁওয়াবার সাধ্যও হবে না অন্য কারও। চম্পককে শেষ করতে পারলেই বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে।"

মহাচূড়ামণি বললেন, "এই শাখামৃগটাকে শেষ করার জন্য আমার হাত নিশপিশ করছে। আপনি আমাকে গোপন সুড়ঙ্গপথটা দেখিয়ে দিন শুধু। আমি আর দেরি করতে পারছি না।"

ছত্তী এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাদের দু'জনকেই শুধু যেতে হবে। অন্য লোক নেওয়া যাবে না। অনেকটা দূরের পথ। দুটো ঘোড়া লাগবে। মহারাজ, আপনি নিজে অশ্বশালায় গেলে সব প্রহরী কৌতূহলী হবে। এত রাত্রে ঘোড়া সাজাতে বললে কেউ-না-কেউ সন্দেহ করবেই। আমি অন্য জায়গা থেকে দুটি ঘোড়া নিয়ে আসছি। আপনি নিজস্ব ঘোড়া ছাড়া অন্য ঘোড়ায় যেতে পারবেন তো ?"

মহারাজ বললেন, "অবশ্যই পারব। এখন কি আর বাছাবাছির সময় আছে ?"

ছত্তী বললেন, "তা হলে আমি দুটি ঘোড়া নিয়ে আসছি। একটু সময় লাগবে। মহারাজ, আপনি যদি পোশাক পরিবর্তন করে নিতে চান তাও করে নিন। তবে আপনার রাজমুকুটখানি অবশ্যই সঙ্গে নেবেন। আপনি এ-দেশের রাজা, সব সময় রাজবেশেই আপনাকে মানায়। চম্পককে শেষ করার পর তার সৈন্যরা যাতে আপনাকে চিনতে পারে, সেজন্যও মুকুট থাকা দরকার। ওইসব পাহাড়ি সৈন্য অনেকেই আপনাকে পূর্বে দ্যাখেনি, কিন্তু আপনার মুকুট দেখে চিনতে পারবে।"

মহারাজ বললেন, "মুকুট আমার মাথায় থাকবে। আপনি ঘোড়া আনুন, আমি চুপিচুপি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সামনের পথে অপেক্ষা করব।"

ছত্তী চলে গেলেন ঘোড়া আনতে, মহাচূড়ামণি ফিরে এলেন প্রাসাদে।

মুকুটটা নেবার পর হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হল রাজকুমার দু'জনকে

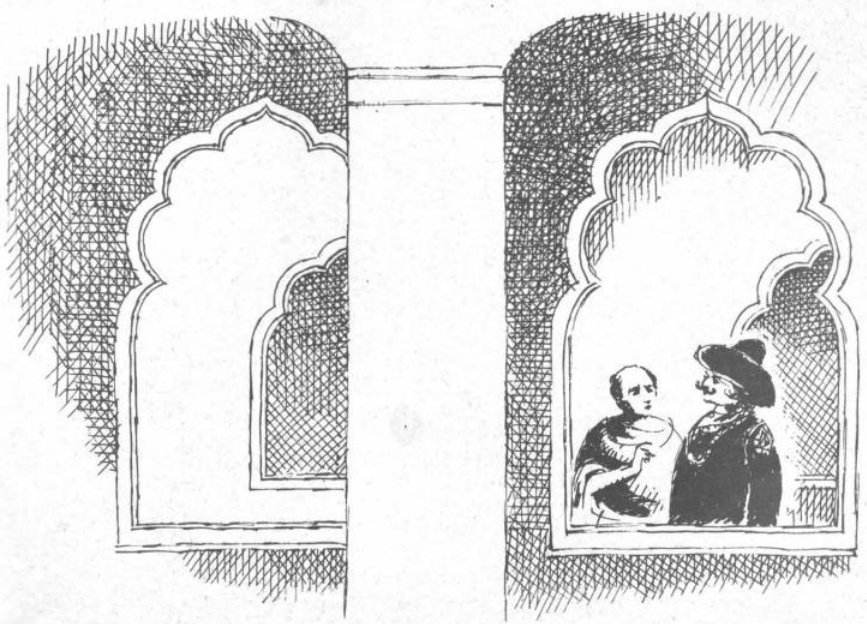

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের

সোনার গণপতি হিরের চোখ

একবার দেখে যেতে। মহারানির কথা মনে পড়তেই তাঁর বুকখানা হুহু করে উঠল। রাজকুমার দু'জন এখনও বেশ ছোট, তাদের মাকে চম্পক হত্যা করতে চায়! ওঃ, লোকটা এত পাষণ্ড! অথচ, মহারানি চম্পককে বিশেষ স্নেহ করতেন। মহারানির অনুরোধে চম্পককে আগে বেশ কয়েকবার ক্ষমা করেছেন মহারাজ।

মহারানি তলতাদেবীর শয্যাটা খালি। আর-একটি সোনার পালঙ্কে দুই রাজকুমার শুয়ে আছে পাশাপাশি। দু'জনেই গভীর ঘুমে মগ্ন।

মহাচূড়ামণি সেই পালঙ্কের পাশে এসে একটুক্ষণ সস্নেহে তাকিয়ে রইলেন দুই পুত্রের দিকে।

তারপর নিঃশব্দে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রথমে বড়কুমার দৃঢ়র কপালে একটি চুম্বন দিলেন। দৃঢ়র ঘুম ভাঙল না, সে পাশ ফিরে শুল।

মহাচূড়ামণি একটু সরে এসে চুম্বন করলেন ছোটকুমার তীক্ষ্ণর কপালে। তীক্ষ্ণ সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল।

এত রাত্রে পিতাকে সে কোনওদিন দ্যাখেনি। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

মহাচূড়ামণি তার দিকে চেয়ে হাসলেন। তার গালে হাত বুলিয়ে দিলেন।

তীক্ষ্ণ এবার বললে, "কী হয়েছে, বাবা, কী হয়েছে?"

মহাচূড়ামণি দু' দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "কিছু হয়নি। এমনি তোদের দু'জনকে একবার দেখতে এলাম।"

তীক্ষ্ণ উঠে বসে বলল, "মা কোথায়? মা কোথায়?"

মহাচূড়ামণি সে প্রশ্নের তক্ষুনি উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি তীক্ষ্ণকে কোলে নিয়ে সারা ঘর ঘুরতে লাগলেন।

তারপর তাঁর মনে পড়ল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনি তীক্ষ্ণকে আবার পালঙ্কের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললেন, "ঘুমোও কুমার। মা আসবেন, সকালেই ফিরে আসবেন।"

দু'জন প্রহরীকে ডেকে সেই কক্ষের সামনে সর্বক্ষণ পাহারা দিতে বললেন তিনি। তারপর মাথায় মুকুট পরে, কোমরে হিরণ্যক তলোয়ার ঝুলিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাজপ্রাসাদ থেকে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কে প্রথম

বিমানে ইংলিশ চ্যানেল

বিমানে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে আবার ফিরে আসেন মোটর এবং বিমানচালনায় অগ্রণী এক ব্রিটিশ—চার্লস স্টুয়ার্ট রোল্‌স, ১৯১০ সালের জুন মাসে। এঞ্জিনিয়ার হেনরি রয়েস-এর সহযোগিতায় তিনিই তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত রোল্‌স-রয়েস গাড়ি এবং বিমান-এঞ্জিন।

রোল্‌স-এর বয়স তখন ৩২ বছর। তাঁর বিমানটি ছিল রাইট-ভাইদের পরিকল্পিত বাইপ্লেনের (দু' জোড়া পাখা লাগানো বিমান) ব্রিটেনে তৈরি একটি সংস্করণ।

অনুকূল বাতাস এবং আবহাওয়ার আশায় ডোভারের কাছে কয়েকদিন অপেক্ষা করে ২ জুন বিকেলে রোল্‌স আকাশে উঠলেন, চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে ঢুকে ক্যালের কাছে সঁজৎ পর্যন্ত উড়ে গেলেন।

তিনি যে এই সফর করেছেন তা প্রমাণ করতে অ্যারো ক্লাব অব ফ্রান্স-এর নামে একটা চিঠি তিনি এখানে ডাকে ফেললেন এবং তারপর ফিরতি পথে আবার চ্যানেল পার হয়ে ডোভারে গিয়ে নির্বিঘ্নে অবতরণ করলেন।

যাতায়াতে তাঁর সময় লেগেছিল ৯০ মিনিটের কিছু বেশি। আর-একটি বিষয়েও প্রথম হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি— এরোপ্লেনে (একজোড়া পাখা লাগানো বিমান) প্রথম ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে পাড়ি। এর এক মাস পরে একটি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

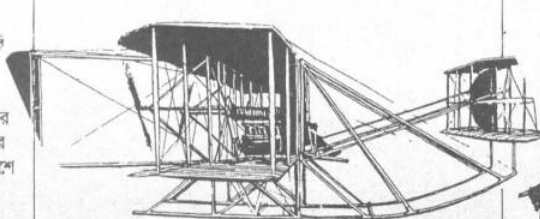

ম্যাড্রিডের এক লাইব্রেরিতে পাওয়া গেল পাঁচশো বছরের পুরনো পাণ্ডুলিপির খোঁজ। কার লেখা ? ডন ক্রিস্টোবাল্ডির। পাঁচশো বছরে, যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করে গেছেন, ঐতিহাসিক সেইসব ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে এক অজানা প্রাণীর কথা তিনি বলে গেছেন, যা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান। বলে গেছেন, বিংশ শতাব্দীতে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর আবির্ভাবের কথা, যাঁর নামের আদ্যক্ষর 'এস' ! তারপর ?

রহস্যময় এই কাহিনী 'ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী'। লেখক সত্যজিৎ রায়। পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় এই শঙ্কুকাহিনী ছাড়াও আরও পাচ্ছ সাতটি উপন্যাস, তিনটি বড় গল্প, প্রচুর কবিতা ও গল্প, ভ্রমণকাহিনী, খেলাধুলো, বিজ্ঞাননিবন্ধ, ধাঁধা ও অনেক মজা। এই প্রথম জেম্স বণ্ডের সুদীর্ঘ চিত্রকাহিনী, বড় একটি কমিক, জাম্বো ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল ও বিখ্যাত সাত খেলোয়াড়ের সাত পাতা জোড়া রঙিন ছবির অ্যালবাম।

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মতো
রঙিন পূজাবার্ষিকী

দাম : ৪৪·০০ টাকা

CLARION C - ABAM-1

রত্ন-রহস্য

রত্নের খোঁজে মানুষ পৃথিবীর দুর্গম পাহাড় থেকে শুরু করে অতল সমুদ্রের নীচেও অনুসন্ধান চালিয়েছে যুগে যুগে। রত্ন দুর্লভ ও দুর্মূল্য বলেই মানুষের এত ব্যাকুলতা। এক-একটি রত্নকে ঘিরে আবার রহস্যও কিছু কম নেই। কী করে পাওয়া যায় এক-একটি রত্ন, বিশেষ এক-একটি রত্নের খ্যাতিই বা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে, এ-ধরনের নানা বিষয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এই কৌতূহলই মানুষকে দিয়েছে অনুসন্ধানের প্রেরণা।

রানি ভিক্টোরিয়ার মুকুট, ১৮৭০

রানি এলিজাবেথের মুকুট, ১৯৩৭

রানি মেরির মুকুট, ১৯১১

কোহিনুরের সন্ধানে

মুকুটের মালটিজ ক্রসের মধ্যে কোহিনুর

সঙ্কর্ষণ রায়

দিনকয়েক আগে একদিন সকালে হেরম্ব দাস লেনে শম্ভুনাথ সেনের লেখাপড়ার ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলের ওপরে মানচিত্র বিছিয়ে তিনি তা পরীক্ষা করছেন। খুব মন দিয়ে কী যেন দেখছিলেন তিনি, তাঁর ঘরে আমি যে ঢুকে পড়েছি, তা তিনি টেরও পেলেন না।

"কী দেখছেন অমন মন দিয়ে?" আমি প্রশ্ন করলাম। "ম্যাপের মধ্যে মেপে মেপে কী খোঁজার চেষ্টা করছেন?"

আমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন শম্ভুনাথ। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওঃ, তুমি! বোসো, ঠাণ্ডা না গরম কী খাবে বলো।"

"সে পরে হবে," চেয়ার টেনে বসে আমি

চন্দ্রকান্তমণি (ডান দিকে মূল খনিজ পাথর)

হিরে

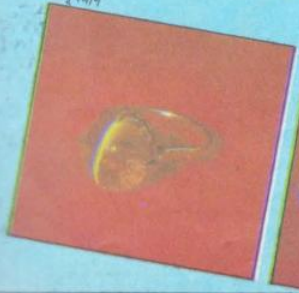

নীলকান্তমণি

সবুজ জেড পাথর

বৈদুর্যমণি

পান্না

ওপাল পাথর

এবার
কাকাবাবু ও সন্তু
বজ্র লামার দেশে
মারাংবু গাছের নাম শুনেছ ? কনফুসিয়াস জানতেন এর কথা । একশো বছর আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে এই গাছ । আর এর শেকড় খেয়েই নাকি তিনশো বছর বেঁচে আছেন বজ্র লামা । এই লামাদের ঘিরেই রহস্যজাল । কাকাবাবু, সন্তু ও ক্যাপটেন নরবুর ভয়ঙ্কর অভিযান । বিপদ ও চমকে ভরা । প্রাচীন লামার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর ফিরতে চাইল না সন্তু । কেন ? কী সেই সম্মোহন ?
উপন্যাসের নাম 'কাকাবাবু ও বজ্র লামা' । লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । মন কেড়ে-নেওয়া এই রহস্য-উপন্যাস ছাড়াও এবারকার পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় আরও পাচ্ছ ছ'টি উপন্যাস, শঙ্কু-কাহিনী, তিনটি বড় গল্প, প্রচুর কবিতা ও গল্প, ভ্রমণকাহিনী, খেলাধুলো, বিজ্ঞাননিবন্ধ, ধাঁধা ও অনেক মজা । এই প্রথম জেম্‌স বন্ডের সুদীর্ঘ চিত্রকাহিনী । বড় আর একটি কমিক । আরও আছে জাম্বো ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল ও বিখ্যাত সাত খেলোয়াড়ের সাত পাতা জোড়া রঙিন ছবির অ্যালবাম ।
তোমাদের মনের মতো
রঙিন পূজাবার্ষিকী
দাম : ৪৪·০০ টাকা
CLARION C · ABAM-2

বললাম, "আগে জবাব দিন আমার প্রশ্নের।"

"কোহিনুরের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। শুধু কোহিনুর নয়, পিট, গ্রেট মুঘল, হোপ, রিজেন্ট, অরলফ প্রভৃতি বিখ্যাত হিরে কোন খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল তার সন্ধান নিচ্ছি। ঐতিহাসিকরা বলেন, গোলকোণ্ডার খনি থেকে বেরিয়েছিল এইসব হিরে। কিন্তু কোথায় ছিল এই খনি?"

"আপনার ওই ম্যাপের মধ্যে তার হদিস আছে নাকি?"

"থাকতেও পারে। দেখতেই পাচ্ছ, এটা গতানুগতিক ম্যাপ নয়, এরিয়েল ফোটোগ্রাফ, অর্থাৎ বিমান থেকে তোলা ছবি। মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে খালি চোখে দেখতে না পাওয়া কোনও-কোনও জিনিস এরিয়েল ফোটোগ্রাফে প্রকাশ পায়..."

"আপনার এই এরিয়েল ফোটোগ্রাফে কিছু প্রকাশ পাচ্ছে নাকি?"

"তা ক্রমশ প্রকাশ্য।" বলে এরিয়েল ফোটোগ্রাফটা সরিয়ে রাখলেন শম্ভুনাথ।

শম্ভুনাথ সেন একজন বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী। ভারতীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রকমারি খনিজের সন্ধান নিয়েছিলেন। কয়লা, চুনাপাথর, বক্সাইট, নিকেল, তামা, গ্রাফাইট প্রভৃতি খনিজের খোঁজ নেওয়ার পর ১৯৫৯ সাল থেকে শুরু করেছেন হিরের সন্ধান। ১৯৭৮ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন।

শম্ভুনাথ ১৯৫৯ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে হিরে খুঁজতে শুরু করেছেন। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে গোলকোণ্ডার খনি অবস্থিত ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের এলাকার মধ্যে ছিল গোলকোণ্ডা রাজ্য, রাজ্যের নামেই বিদেশীরা খনিটিকে গোলকোণ্ডার খনি বলে জানতেন। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খনি থেকে খনন করে তোলা হিরে হায়দরাবাদ শহরের কাছে অবস্থিত গোলকোণ্ডার দুর্গে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে ছিল হিরের বাজার। ব্যবসায়ীদের সমাগম বেশি হত বলে অধিকাংশ হিরে তাদের মাধ্যমে বিদেশে চালান যেত। গোলকোণ্ডার হিরের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে ভারতকে 'হীরকময় দেশ' বলে বর্ণনা করেছিলেন বিদেশি পর্যটকরা।

তিনশো বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গোলকোণ্ডার খনি। তারপর আর-এক কণা হিরেও বের হয়নি সেখান থেকে এবং খনিটারও কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা শম্ভুনাথের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল। তিনশো বছর আগে পর্যন্ত যে খনি থেকে নিয়মিত হিরে খুঁজে বের করা হয়েছে, সেই খনিটি হঠাৎ লোপাট হয়ে গেল কী করে? তাঁর মনে হল, হয়তো খনি-অঞ্চলে প্রবল বন্যা বা ভূমিকম্প হয়েছিল, যার ফলে খনিতে যারা কাজ করত তাদের অধিকাংশই মারা পড়েছিল। তা ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে স্থানীয় ভূ-বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা, যার দরুন অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরেও খনিতে কাজ শুরু করা যায়নি। হয়তো খনিটাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, দক্ষ মজুর ও কারিগরের অভাবে খনিটাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাই করা হয়নি।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন শম্ভুনাথ। তিনি চান হারানো খনিটিকে পুনরুদ্ধার করতে, খুঁজে বের করতে কোহিনুরের উৎস। আর কোহিনুরের উৎস খুঁজে বের করতে পারলে সেখান থেকে আরও কোহিনুর পাওয়া যাবে।

হিরের খনির গোপনীয়তা

অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা ও পেনার নদীর অববাহিকা-অঞ্চলে সন্ধান চালিয়েছিলেন শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা। সন্ধান করতে-করতে তাঁদের মনে হয়েছিল যে, খনি যখন চালু ছিল তখন গোপন রাখা হত তার অবস্থান। খনিতে যারা কাজ করত তারা ছাড়া কেউই জানত না খনিটি কোথায় আছে। সুদূর প্রাচীনকালে যখন প্রথম খনির কাজ শুরু হয়, তখন থেকেই রক্ষা করা হয়েছে তার গোপনীয়তা।

প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটেও তাঁরা হিরের খনির কোনও হদিস পাননি। অথচ হিরের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অতীতের হীরক-বিশেষজ্ঞদের বিশেষ জ্ঞানের আভাস পাওয়া গেছে এইসব পুঁথিপত্রেরই মধ্যে। এই বিশেষজ্ঞরা হিরেকে শ্রেষ্ঠ বস্তুর শিরোপা দিয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, হিরের চেয়ে কঠিন বস্তু পৃথিবীতে নেই। তাই তার আর-এক নাম দিয়েছিলেন 'বজ্র মানিক'। তাঁরা এ-ও বুঝেছিলেন যে, হিরে না কাটলে তার ভেতরকার জলুস প্রকাশ পায় না। কিন্তু এমন কোনও জিনিস নেই যা হিরেকে কাটতে পারে, অতএব হিরেকে হিরে দিয়ে কাটার কৌশল আবিষ্কার করেন রত্নবিজ্ঞানীরা। তাঁরা হিরেকে তার ভেতরের উজ্জ্বলতা অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, (১) ব্রাহ্মণ—সাদা রঙের হিরে, (২) ক্ষত্রিয়—লাল রঙের হিরে, (৩) বৈশ্য—হলুদ রঙের হিরে এবং (৪) শুদ্র—কালো রঙের হিরে। তাঁরা স্বাদ, বিন্দু ও রেখাবর্জিত সাদা উজ্জ্বল হিরেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'কমলহিরা'।

রত্ন হিসেবে হিরেকে শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছিলেন বলেই রত্ন-বিশেষজ্ঞরা তার গুণাগুণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। কিন্তু খনির

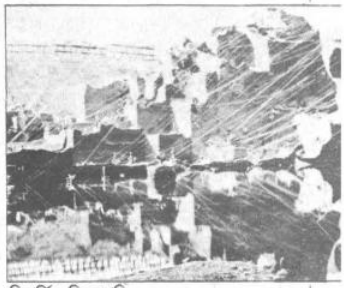

কিম্বার্লির হিরের খনি

অবস্থানের কথা প্রকাশ করেননি কোথাও। মহাভারতের যুগেই এই খনি থেকে 'স্যমন্তক মণি' নামক হিরে বের করা হয়েছিল। এই স্যমন্তক মণিই কোহিনুর। মুঘল আমল পর্যন্ত অনেক হিরের টুকরো এই খনি থেকে বের করা হলেও খনিটি কোথায় অবস্থিত তা কখনওই প্রকাশ করা হয়নি।

মুঘল আমলে এই খনিটি মুঘলদের অধিকারে এসেছিল কি না জানা নেই, তবে তার নাম দেওয়া হয়েছিল গোলকোণ্ডার খনি। নাম গোলকোণ্ডার খনি হলেও গোলকোণ্ডা দুর্গের ধারেকাছেও তা ছিল না। কোথায় তার অবস্থান তা গোপন রাখা হয়েছিল।

মুঘলদের রাজত্বকালে গোলকোণ্ডার খনি থেকে হিরের উৎপাদন বাড়ে, গ্রেট মুঘল, হোম, রিজেন্ট, অরলফ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত হিরে বের করা হয়। উৎপাদন বেড়ে যাওয়া মানে খনির ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি। কিন্তু খনিতে কাজ যতই বাড়ুক, খনির খবর গোপনই থেকে যায়। ইংরেজরা এ দেশে আসার আগেই খনি বন্ধ হয়ে যায়। খনিটি কোথায় ছিল অনেক চেষ্টা করেও ইংরেজরা

কিম্বার্লাইট পাথরে হিরে

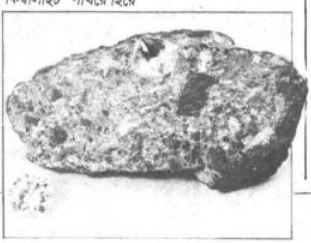

খুঁজে বের করতে পারেনি।

মাত্র একজনই দাবি করেছেন যে, গোলকোণ্ডার খনিটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। তিনি হলেন ফরাসি পর্যটক জাঁ ব্যাপতিস্ত তাভার্নিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে গোলকোণ্ডার হিরের খনির বর্ণনা আছে। তাভার্নিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন যে, গোলকোণ্ডার হিরের খনি কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের মধ্যে 'কোল্লুরে' অবস্থিত ছিল।

তাভার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনী পড়ে শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের কোল্লুরের খনি খুঁজে বের করার ঝোঁক চাপল। সন্ধান শুরু করলেন তাঁরা।

কোল্লুরের খনির সন্ধান

কোল্লুর নামে একটি গ্রামের সন্ধান পেলেন শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা। কিন্তু গ্রাম খুঁজে পেলেও গ্রামের মধ্যে বা কাছাকাছি কোনও খনির চিহ্ন খুঁজে পান না তাঁরা। স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও লাভ হয় না, কারণ এখানকার হীরকভাণ্ডার সম্বন্ধে তাদের কিছুই জানা নেই। এমনকী, তাদের পূর্বপুরুষদের ক্রিয়াকলাপের কিছুই নেই তাদের স্মৃতিতে। কোহিনুর, হোপ প্রভৃতি হিরের কথা তারা শোনেনি। এইসব হিরের উৎস যে তাদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও ছিল, তাও তাদের অজানা।

কোনও হদিস নেই, তবুও খুঁজে বের করার নেশায় মেতে ওঠেন শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা। তাঁরা মাটি পরীক্ষা করেন, পাথরের স্তরে খোঁড়াখুড়ি করেন, ঘোরাঘুরি করেন কোল্লুর গ্রামের চারপাশে।

কোল্লুর গ্রামের কয়েকটি গহ্বর দেখতে পেয়ে এই গহ্বরগুলি তাভার্নিয়ের বর্ণিত খনির অবশেষ কি না, তা তাঁরা পরীক্ষা করেন তন্ন-তন্ন করে। গহ্বরের মধ্যে বালি, নুড়ি ও পাললিক শিলার মধ্যে খোঁড়াখুড়ি করেন, কিন্তু কণামাত্র হিরেও খুঁজে পান না।

হিরে পাওয়া গেল না বলে কি ধরে নেওয়া উচিত যে কোল্লুরে হিরের খনি ছিল না? শম্ভুনাথের মত, খনির কোনও চিহ্ন এখন না থাকলেও এটা ভাবা ঠিক নয় যে, এখানে কখনও কোনও খনি ছিল না। হয়তো কোল্লুরের আশপাশে যে বালি ও নুড়ির স্তরগুলি দেখা যায়, সেগুলির মধ্য থেকেই আহরণ করা হয়েছিল ওইসব বিখ্যাত হীরকখণ্ড।

বালি ও নুড়ির স্তরের মধ্যে ছড়ানো হিরে শেষ হওয়ার পর হিরের ভাণ্ডার শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। কারণ বালি ও নুড়ির মধ্যে ছড়ানো হিরের উৎস হল হিরে-যুক্ত মূল আগ্নেয় শিলা কিম্বার্লাইট। এই মূল শিলার সন্ধান পাননি প্রাচীন ও মধ্য যুগের খনিবিদরা।

অতএব ওপর-ওপর খোঁজা ছেড়ে মূলের সন্ধান নিতে থাকেন শম্ভুনাথ। কোল্লুরের কাছাকাছি হিরে-যুক্ত কিম্বার্লাইট মাটির তলায় চাপা আছে বলে মনে করেন তিনি।

মূল শিলা

পাইপের আকারের আগ্নেয়শিলাই যে হিরের মূল উৎস, তা প্রথম জানা গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লিতে। কিম্বার্লির নামে ওই আগ্নেয়গিরিজাত শিলার নামকরণ হয়েছিল কিম্বার্লাইট (Kimberlite)।

কিম্বার্লির হিরের খনির ভিতরে

বিবিধ রতন

তারপর কিম্বার্লির কিম্বার্লাইট-এর মধ্যে গড়ে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকার মূল হিরের খনি। আফ্রিকার জেয়ার, লেসোথো, তানজানিয়া, সিয়েরা লিয়োন, অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া প্রভৃতি প্রধান হিরে উৎপাদক দেশে কিম্বার্লাইট থেকে হিরে বের করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের পান্নার হিরের খনিতেও মাঝগাঁওয়ার কিম্বার্লাইট হিরের মূল উৎস হয়ে উঠেছে।

মহা উৎসাহে শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা হিরের মূল উৎস কিম্বার্লাইট খুঁজতে শুরু করেন। যে কিম্বার্লাইট থেকে কোহিনুর, অরলফ প্রভৃতি বিখ্যাত হিরে, জলের স্রোতে বিশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসে কোল্লুরের (গোলকোণ্ডার) খনিকে সমৃদ্ধ করেছিল, সেই কিম্বার্লাইটকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তাঁরা।

কিন্তু এ-অঞ্চলের বেশির ভাগ পাথরই মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। মাটির তলায় কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে কিম্বার্লাইট, তা ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই। একটানা একই মাটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত হয়ে আছে, তার মধ্যে কোথায় কিম্বার্লাইট চাপা পড়ে আছে তা বোঝা যাবে কী করে?

চোখে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা দরকার। কিম্বার্লাইট জমাটবাঁধা ভারী আগ্নেয় শিলা। চারপাশের পাথরের তুলনায় তার ঘনত্ব বেশি। তার মধ্যে টাইটেনিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সমাবেশ ঘটেছে। অতএব ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাগনেটোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাটি চাপা কিম্বার্লাইট-এর অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন।

অতএব 'হীরক-প্রকল্প' নাম দিয়ে শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন কিম্বার্লাইট-এর খোঁজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কর্মসূচি তৈরি করলেন। সেই অনুযায়ী ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী এবং ভূ-রাসায়নিকও কাজে নামলেন। একটানা কয়েক মাস ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর কিম্বার্লাইট-এর খোঁজ পাওয়া গেল। একটা নয়, মাটির তলায় চাপা পড়া ছ'-ছ'টি কিম্বার্লাইট-এর হদিস মিলল। কিন্তু কোল্লুরে বা কোল্লুরের কাছাকাছি কোথাও নয়, ছ'টি কিম্বার্লাইটই পাওয়া গেল কোল্লুর থেকে প্রায় আড়াই শো কিলোমিটার দূরে ওয়াজ্‌রাকারুরে (বজ্রকারুর)।

কোল্লুরের কাছাকাছি কোনও কিম্বার্লাইট না পেয়ে শম্ভুনাথের মনে হল ওয়াজ্‌রাকারুরেরই কোনও একটি কিম্বার্লাইট ছিল কোহিনুর ও অন্যান্য বিখ্যাত হিরের উৎস। অর্থাৎ ওয়াজ্‌রাকারুরের ছ'টি কিম্বার্লাইট-এর একটি থেকেই কোহিনুর, গ্রেট মুঘল প্রভৃতি হিরে আহরিত হয়ে কোল্লুরে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছিল। কোহিনুর ইত্যাদি হিরের উৎস এই বিশেষ কিম্বার্লাইটটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা।

চেলিমা ও যমগমরাজপুল্লের পাথর

কোল্লুরের কাছাকাছি কিম্বার্লাইট পাওয়া না গেলেও, শম্ভুনাথের স্থির বিশ্বাস যে, তা আছে। চোখের সামনে হয়তো নেই। কিন্তু মাটির তলায় চাপা পড়া অবস্থায় অথবা অন্য

পাথর দিয়ে ঢাকা অবস্থায় থাকতে পারে। অতএব শম্ভুনাথ ঠিক করলেন যে, আরও ভাল করে খুঁজতে হবে।

ওয়াজ্‌রাকারুর এবং কোল্লুরের মাঝামাঝি রয়েছে চেলিমা গ্রাম। চেলিমাতে সিসা-দস্তা-তামার খনির অবশেষ আছে, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে-করতে শম্ভুনাথ পেয়ে গেলেন ভারী জাতের আগ্নেয় শিলা, যা ভূগর্ভের ম্যাগমা থেকে ঠেলে উঠেছে। তাকে আরও ভাল করে পরীক্ষা করলেন সি এইচ নরসিংহ রাও নামে তাঁর এক সহকর্মী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নরসিংহ রাও শনাক্ত করলেন কারবোনেটাইট জাতীয় পাথর। তার মধ্যে অতি উজ্জ্বল একটি হিরের বিন্দুও তিনি আবিষ্কার করলেন। খালি চোখে

খনি থেকে তুলে আনা না-কাটা হিরে (কালিনান)

তাকে দেখা যায়নি, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাকে শনাক্ত করেছিলেন নরসিংহ রাও। এর পর শম্ভুনাথের মনে কোনও সন্দেহ রইল না যে, চেলিমার এই পাথরের মধ্যে খনন করলে বড় আকারের হিরে পাওয়া যেতে পারে।

চেলিমার পূর্বে যমগমরাজপুল্লে অঞ্চল। সেখানে তামা ও সিসার জন্য খনন করতে গিয়ে কিম্বার্লাইট পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যেও হিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোল্লুরের খনির হিরের উৎস কি চেলিমা বা যমগমরাজপুল্লের কিম্বার্লাইট? কিন্তু কোল্লুর থেকে চেলিমা বা যমগমরাজপুল্লের দূরত্ব কম নয় (একশো থেকে একশো পঁচিশ কিলোমিটার)। চেলিমা বা যমগমরাজপুল্লের কিম্বার্লাইট থেকে জলের ক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে হিরে জলের স্রোতে এতদূর পর্যন্ত কি বয়ে আসতে পারে? না, পারে না, একজন পলি-বিজ্ঞানী বললেন শম্ভুনাথকে।

অতএব চেলিমা বা যমগমরাজপুল্লে নয়, কোল্লুরের কাছাকাছি কোথাও মাটির নীচে চাপা আছে সেই কিম্বার্লাইট, যা কোহিনুর ও অন্যান্য বিখ্যাত হিরের উৎস।

'হীরক রাজার দেশে' ছবি করার সময় ভূ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়

হীরক রাজার দেশে

কোহিনুরের উৎস কোথায়, কোন পাথরের মধ্যে, এ প্রশ্ন সত্যজিৎ রায়ের মনে জেগেছিল 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটি তৈরি করার সময়। এ-নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষার দফতরে এসেছিলেন। সেখানকার ল্যাবরেটরিতে দেখেছিলেন কিম্বার্লাইট এবং কোহিনুর ও অন্যান্য হিরের মডেল।

হীরক রাজার খনির সেট তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ, পাইপের আকারের কিম্বার্লাইট-এর মধ্যে। কোহিনুরের উৎস সম্বন্ধে ভূ-বিজ্ঞানীদের কল্পনাকেই রূপ দিয়েছিলেন তিনি।

সত্যজিৎ তাঁর ছবির মধ্যে ভূ-বিজ্ঞানীদের কল্পনাকে ফুটিয়ে তুললেও কোহিনুরের উৎস এখনও ভূ-বিজ্ঞানীদের কল্পনার মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। শম্ভুনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাভার্নিয়ে কি তা হলে মিথ্যে কথা লিখেছিলেন? কোল্লুরে কি সত্যিই হিরের খনি ছিল না?

মূর্তির চোখ

"না, মিথ্যে কথা লেখেননি তাভার্নিয়ে।" শম্ভুনাথকে বলেছিলেন হায়দরাবাদের সালারজং মিউজিয়মের প্রত্নতাত্ত্বিক মহম্মদ আমেদ। তিনি কোল্লুরের কাছে একটি প্রাচীন স্মারক-স্তম্ভ আবিষ্কার করেছিলেন, যা কোল্লুরের হিরের খনির স্মৃতি বহন করছে।

"নিঃসন্দেহে কোল্লুরের এই খনি থেকেই কোহিনুর প্রভৃতি বিখ্যাত হিরে পাওয়া গিয়েছিল।" মহম্মদ আমেদ বলেন, "তাভার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনী ছাড়া নিজাম সরকারের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেও তার উল্লেখ আছে। তা ছাড়া আর-একটা প্রমাণ আমি পেয়েছি..."

"কী প্রমাণ?" শম্ভুনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

"১৬০২ কি ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের রাজকুমার রাহাব এই কোল্লুরের খনি থেকে একটি বড় হিরে পেয়েছিলেন। হিরেটির নাম 'মূর্তির চোখ (Eye of the Idol)। রাহাবের কাছ থেকে যিনি এই হিরেটি পেয়েছিলেন, তিনি কোনও এক দেবতার মূর্তির চোখে তা বসিয়েছিলেন বলেই এর এই নামকরণ হয়েছিল। হিরেটি যে কোল্লুরের খনি থেকেই পাওয়া গিয়েছিল, রাহাব তা তাঁর ডায়েরির মধ্যে লিখে রেখেছিলেন।"

মহম্মদ আমেদের সঙ্গে আলাপের পর শম্ভুনাথ আবার নতুন করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, কোল্লুরেই ছিল কোহিনুরের উৎস। নতুন উৎসাহে আবার তিনি সমীক্ষার আয়োজন করছেন।

তাঁর বয়স সাতষট্টি পেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর হাবভাবে মনে হচ্ছে যেন নবযৌবনের দূত তিনি। প্রবল উদ্যমে তিনি 'সার্চ ফর ডায়ামন্ড্‌স ইন ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে হিরের জন্য সমীক্ষার কর্মসূচি তৈরি করেছেন।

এই কর্মসূচি অনুসরণ করে তাঁর ঘরে বসে পরীক্ষা করছেন এরিয়েল ফোটোগ্রাফ। প্রদীপ্ত মুখে তিনি বললেন, "আমার জীবনের ব্রত কোহিনুরের উৎস সন্ধান। আর-একটা কোহিনুর পাই বা না-পাই, কোহিনুরের উৎস আমি খুঁজে বের করবই।

পান্নার মূল স্ফটিক

রত্ন-কাহিনী

চঞ্চল পাল

পথে-ঘাটে পাহাড়ে-জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে লক্ষ-লক্ষ পাথরের টুকরো। ক'জনই বা ফিরে তাকায় তাদের দিকে। অথচ হিরে, পান্না, গোমেদ, চুনি, নীলা, পোখরাজ—এগুলোও তো পাথর। তবু তার জন্য মানুষের কী তৃষ্ণা! কী সেই বিশেষত্ব, যার জন্য পাথর হয়েও এরা জাতে উঠে যায়?

কারণ কিছু কম নেই। প্রথমত, উজ্জ্বলতায় আর রঙের বাহারে এদের জুড়ি মেলা ভার। দ্বিতীয়ত, এদের আরও নিখুঁত ও সুন্দর করে তোলার জন্য যে জ্যামিতিক আকৃতি দেওয়া হয়, তার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে সূক্ষ্ম শিল্পের সুষমা। তৃতীয়ত, এগুলো এত দুষ্প্রাপ্য যে, ইচ্ছেমতো টনের পর টন জোগাড় করা যায় না, এক টুকরো উদ্ধার করতেই বিপুল পরিশ্রম ও অর্থ খরচ হয়ে যায়। চতুর্থত, এগুলোর রং, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণ একইরকম থেকে যায়।

ইতিহাসের পথে

ইতিহাসের পথ ধরে পিছিয়ে গেলে সেই সুদূর ব্রোঞ্জ যুগেও দেখা মিলবে রত্নের। চেকোস্লোভাকিয়ার একটা হ্রদের তলা থেকে বেরিয়েছে এক গুহামানবীর কঙ্কালের ফসিল, যার পাশে রাখা ছিল বছরঙা পাথরের মালা। স্পেনের পিরেনিজ পর্বতের গুহাতেও দেখা গেছে একই দৃশ্য। প্রাচীন মিশরের রাজা-রানির অঙ্গে তো বটেই, প্রাসাদের নানারকম আসবাবপত্রেও ঝকমক করত বহুমূল্য পাথরের টুকরো। প্রথম খ্রিস্টাব্দের রোমের রাজা জুলিয়াস সিজারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিভিন্ন ধরনের এত দামি পাথর ছিল যে, তাই দিয়ে একটা জাদুঘর তৈরি করে ফেলা যায়। রানি ক্লিওপেট্রার তো একটা পান্নার খনিই ছিল একেবারে নিজস্ব। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি রত্নের নাম শুনলেই ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক রত্ন-ব্যবসায়ী তাঁকে নকল পাথর দিয়ে বারবার ঠকিয়েছে। তাঁর নিজস্ব সিন্দুক থেকে পাওয়া গেছে প্রায় ছ'শো আসল জহরত। নিত্যনতুন রত্নের নেশায় বিভোর হয়ে থাকতেন রানি প্রথম এলিজাবেথও। মধ্যযুগে খ্রিস্টান পাদ্রিদের রত্নধারণ নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া মধ্যযুগীয় প্রায় সব গির্জাতেই স্থাপত্যের অলঙ্করণ হিসেবে দামি পাথর খোদাই করা হত।

মণি-মাণিক্যের কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের কথা এসে পড়ে। কারণ, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রাচ্য থেকে আনা পাথরের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। আর, এই প্রাচ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রত্ন-খনি ছিল ভারতে। রাজা সত্রাজিৎ তাঁর মেয়ে সত্যভামার বিয়েতে জামাতা শ্রীকৃষ্ণকে যৌতুক দিয়েছিলেন 'স্যমন্তক মণি'। আজ রানি এলিজাবেথের মুকুটে যে বিখ্যাত 'কোহিনুর' নামের হিরের টুকরোটি জ্বলজ্বল করছে, তা নাকি সেই স্যমন্তক মণিটাই।

যতদূর জানা যায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোহিনুর সম্ভবত আবিষ্কৃত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন গোলকোন্ডা খনিতে। আজ কোহিনুরের ওজন ১০৮·৯ ক্যারাট, কিন্তু মূল পাথরটার ওজন ছিল এককালে ৮০০ ক্যারাট (১ ক্যারাট=২০০ মিলিগ্রাম)। অর্থাৎ,কত কারিগর যে যুগে-যুগে এর ওপর হাত চালিয়েছে তা কে জানে!

কোহিনুরের মতো আরও ডজনখানেক ঐতিহাসিক হিরে আছে, যার উৎপত্তি ভারতেই। যেমন, পিট, অরলোভ, দরিয়া-ই-নুর, স্যান্সি, শাহ, নাসসক, তাজ-ই-মা, ব্লু-হোপ, পিগট, নিজাম ইত্যাদি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কুলিনান হিরে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে তার বিশালতায়। ১৯০৫ সালে যখন এটা আবিষ্কৃত হয়, তখন তার ওজন ছিল ৩১০৬ ক্যারাট। ট্রান্সভাল গভর্নমেন্ট এটাকে কিনে নেয় পরের বছর। তখনকার দিনেই দাম দিয়েছিলেন দেড় লক্ষ পাউন্ড। বছর- দুয়েক বাদে এটাকে ভেঙে বিভিন্ন আকৃতির ন'টা বড় ও ছিয়ানব্বইটা ছোট টুকরো করে ফেলা হয়। সবচেয়ে বড়টার ওজন এখন ৫৩০·২ ক্যারাট।

কুলিনান ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাওয়া এক্সেল্‌সিয়র, জুবিলি, ইমপিরিয়াল, দ্য বিয়ারস্, রেডব্রুস, টাইগার-আই, জোহ্নার নামে হিরের টুকরোগুলো বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। তা ছাড়া বোর্নিও ও ভেনেজুয়েলা থেকে উদ্ধার করা দু'চারটে হিরেও ঐতিহাসিকদের নজর কেড়েছে।

শুধু হিরেই নয়, শত-শত বছরের পুরনো বেশ কিছু চুনি, নীলা, পান্না একই উজ্জ্বলতা নিয়ে আজও মানুষকে চমকে দেয়। খিরাজ-ই-আলম নামের চুনিটা অন্তত ৬০০ বছরের পুরনো। ইংরেজরা বলে 'তৈমুর রুবি'। কারণ, তৈমুরলঙ প্রথম এটাকে লুঠ করে পারস্যে নিয়ে যান। তারপর কোনওভাবে আবার ভারতে মুঘল বাদশাদের হাতে এসে পড়ে। তারপর নাদির শা'র সঙ্গে পারস্য ঘুরে কোনও একসময়ে ফিরে আসে লাহোরে। আজ পর্যন্ত যত চুনির টুকরো উদ্ধার করা গেছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় (৩৬১ ক্যারাট)।

আর-একটা বিখ্যাত চুনি ব্ল্যাক প্রিন্স কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয় জানা যায় না। তবে,এর প্রথম ঐতিহাসিক সূত্র মেলে ১৩৬৭ সালে। ক্যাস্তিলের রাজা দম পেড্রো যখন গ্রেনেডার রাজার সম্পত্তি লুঠ করেন, তখন লুঠের মালের মধ্যে চুনিটা। পাথরটার আকৃতি মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং বলা যায় এবড়োখেবড়ো—সবচেয়ে বড় দিকটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২ ইঞ্চি। এর মাঝখানে একটা ছিদ্র আছে। এরকম অসম আকৃতির পাথরকে অলঙ্কারে বসানো সম্ভব নয় বলে এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সুতো ঝুলিয়ে বোধ হয় গলায় পরা হত।

রানি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁর মুকুটের সামনের দিকের মাঝখানে বসানো ছিল একটা উজ্জ্বল নীলা। চারকোনা এই নীলাটি দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি ও প্রস্থে ১ ইঞ্চি। তারপর রাজা পঞ্চম জর্জ ওই মুকুটেই নীলার জায়গায় বসিয়েছিলেন একটা হিরে, আর নীলাটাকে বসাতে বলেছিলেন মুকুটের পিছন দিকে। ইতিহাস বলে যে, এটার প্রথম মালিক নাকি দ্বিতীয় চার্লস, যাঁর কাছ থেকে চুরি করে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় জেমস্ এডওয়ার্ড, ১৬৮৮ সালে। তাই নীলাটার নাম, 'দ্বিতীয় চার্লসের নীলা'।

তবে সবচেয়ে পুরনো নীলার নাম 'এডওয়ার্ড নীলা', কারণ ১৪০২ সালে এডওয়ার্ডের অভিষেকের সময় তাঁর হাতের আংটিতে এটাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল।

পান্নার কথা বলতে গেলে বিশ্ববিখ্যাত

ডেভনশায়ার পান্নার কথা না বললেই নয়। এই বিশাল ১৩৮৩·৯৫ ক্যারাটের পান্নাটা ১৮৩১ সালে দম পেড্রো ষষ্ঠ ডিউক অব ডেভনশায়ারকে উপহার দিয়েছিলেন। অথচ আজও পাথরটাকে কেটেছেঁটে পালিশ করে নিখুঁত করা হয়নি। কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একে গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। বহুবার ইংল্যান্ডে অলঙ্কার ও রত্নের প্রদর্শনীতে এই পান্নাকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সবসময়ই একদল সশস্ত্র প্রহরীর অতন্দ্র নজর ছিল তার ওপর।

স্ফটিক

একমাত্র ওপাল ছাড়া সব রত্ন-পাথরই তৈরি হয় স্ফটিক রূপে। বছরের পর বছর ধরে প্রচণ্ড চাপ এবং ধীরে-ধীরে গরম থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে পাথরগুলো স্ফটিকের রূপ নেয়। স্ফটিকের নানারকম জ্যামিতিক আকৃতিকে বিজ্ঞানীরা সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একটি বিশেষ ধরনের রত্ন-পাথর একটি বিশেষ শ্রেণীর স্ফটিকই তৈরি করে। প্রকৃতির এই অভ্যাসের নাম দেওয়া হয়েছে ক্রিস্টাল হ্যাবিট।

রঙের খেলা

রত্নের একটা প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তার ভেতরে রঙের খেলা। স্ফটিকের ভেতর রাসায়নিক অণুগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে, তার ভেতর দিয়ে সাদা আলোকরশ্মি যেতে গেলে কখনও ভেঙে গিয়ে বিভিন্ন রঙিন আলোকরশ্মিতে পরিণত হয়, কখনও প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে ওঠে, কখনও প্রতিসরণ হওয়ার জন্য আলোর মায়া তৈরি করে, কখনও-বা মনে হয় একটা ষড়ভুজ উজ্জ্বল নক্ষত্র রত্নের ভেতর লুকিয়ে আছে। এই মায়া আর কিছুই নয়, আলোরই ধর্ম—পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে যা নিতান্ত প্রাত্যহিক ঘটনাই। কিন্তু প্রকৃতিতে যে পাথর তৈরি হয়, তার ভেতর এইসব গুণ নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয় না। তার জন্য পাথরগুলোকে বিভিন্নভাবে কাটছাঁট করে ঘষেমেজে উপযুক্ত করে তোলা হয়।

রূপটান

এক-একরকম পাথরের গুণাবলী প্রকাশের জন্য এক-একরকম আকৃতি উপযুক্ত। উপুড়-করা বাটির মতো আকৃতিকে বলে 'ক্যাবোকন'। আবার, সারা পাথর জুড়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারে ছোট-ছোট সমতল ক্ষেত্র কাটা হয়। সেগুলোকে বলে 'ফেসেট্'। পাথরের বিভিন্ন দিকে ফেসেট কেটে সামগ্রিকভাবে যে আকৃতি দেওয়া হয় তার নাম এক-একরকম—টেবল-কাট, স্টেপ-কাট, রোজ-কাট, ব্রিলিয়ান্ট-কাট ইত্যাদি। রোজ-কাট আকৃতিতে থাকে ২৪টা ত্রিভুজাকৃতি ফেসেট। কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট কাট আকৃতিতে থাকে অন্তত ৫৮টা ফেসেট, যার মধ্যে ত্রিভুজও আছে আবার চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ ও ষড়ভুজও আছে। অথচ এতগুলি জ্যামিতিক আকৃতি, খেয়ালখুশিমতো কাটা নয়, প্রত্যেকটা ফেসেট নিখুঁত কোণ করে কাটা, যাতে সামগ্রিকভাবে পাথরটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তা না হলে পূর্ববর্ণিত আলোর মায়া প্রকাশই পাবে না। সুতরাং এই সূক্ষ্ম কাজ যে কত সময়, পরিশ্রম ও দক্ষতাসাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য। কখনও-কখনও একটা ফেসেট নিখুঁত করতেই কেটে যায় দিনের পর দিন।

রত্ন কাটার অস্ত্র হচ্ছে হিরের টুকরো,

মূল পাথর থেকে রত্ন কাটার বিভিন্ন স্তর

কারণ পৃথিবীতে হিরের চেয়ে শক্ত কোনও কঠিন পদার্থের অস্তিত্বই নেই। তা ছাড়া অন্তত ৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা না উঠলে হিরে বিন্দুমাত্র বিকৃত হবে না। তাই অন্য পাথর তো বটেই, হিরে কাটতে গেলেও হিরেই ব্যবহার করতে হবে। কাটার মূল সরঞ্জামকে বলে 'ডোপ'। এটা আসলে একটা হাতলের প্রান্তে একটা উপুড় করা ছোট্ট বাটি। এই বাটির ভেতর পাথরটাকে বসিয়ে যে অংশটা কাটতে হবে, সেই অংশটা একটু বাইরে বার করে রাখা থাকে। একটা লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মতো একটা ধাতব চাকতি প্রচণ্ড জোরে ঘুরতে থাকে (মিনিটে দুই থেকে ছ' হাজার বার), যার ওপরে আটকানো থাকে হিরের গুঁড়ো। এবারে ডোপটা চাকতির ওপর ছোঁয়ালে ঘর্ষণের সাহায্যে পাথরের বেরিয়ে থাকা অংশটা একটু-একটু করে কাটতে থাকে। কাটার পর পালিশ করা হয়। সে কাজও চলে ঘুরন্ত চাকতির সাহায্যে, তবে সেক্ষেত্রে হিরের গুঁড়ো আর থাকে না। ঠিকঠাক কাটা আর পালিশের পর যখন পাথরগুলোকে ফুটন্ত সালফিউরিক অ্যাসিডে ধোওয়া হয়, তখন ফুটে ওঠে দামি পাথরের আসল জৌলুস।

হিরে

ভুষো কালি ও পেন্সিলের সিসও (গ্রাফাইট) কার্বন, আবার হিরেও হচ্ছে কার্বন। তফাত শুধু বিভিন্ন কার্বন অণুর বিন্যাসে। হিরের স্ফটিকে সে-বিন্যাসের কাঠামো এমনই যে, বিভিন্ন অণুর ভেতর ভাঙন ধরানো খুব শক্ত। তাই পেন্সিলের সিস ভেঙে যায়, কিন্তু হিরেতে সহজে আঁচড় ফেলতে পারে না।

হিরের স্ফটিক সাধারণত খুব ছোট আকারে পাওয়া যায়, যার ওজন এক ক্যারাটের বেশি নয়। ঐতিহাসিক হিরেগুলোর মতো বড় আকৃতির হিরে খুবই দুর্লভ। একেবারে স্বচ্ছ হিরের স্ফটিক অথবা হালকা নীল আভাযুক্ত হিরে জোগাড় করা আরও শক্ত। এই ধরনের হিরেকে ব্রিলিয়ান্ট-কাট আকৃতিতে কেটে একটু নাড়াচাড়া করলেই আলোর সাতটা রং-ই ঝকমক করে ওঠে। বেশির ভাগ হিরেতে খুব সামান্য হলুদ বা বাদামি রঙের আভা দেখা যায়। তাই এ-ধরনের হিরে জহুরিদের কাছে খুব বেশি দাম পায় না। শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে, গোলাপি আর ঘন নীল হিরেও প্রকৃতিতে মেলে কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্মূল্য।

খনি থেকে কাঁচা হিরে তোলার পর মনে হয় তেলতেলে ফ্যাকাসে সাদা রঙের একটা ঢিল। তাই অন্য অপ্রয়োজনীয় পাথরের থেকে আলাদা করা খুবই কঠিন। প্রাচীনকালে জল দিয়ে বহুবার ধুয়ে প্রতিটি পাথর ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হত, যা খুবই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় হিরের সঙ্গে গ্রিজের ব্যবহার। এখন গ্রিজ-মাখানো ধাতব চাদরের ওপর কাঁচা হিরে ও পাথর ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর তার ওপর জলের ধারা প্রবাহিত হলে অন্য সব পাথর ধীরে-ধীরে ধুয়ে যায়, কিন্তু হিরেগুলো গ্রিজের সঙ্গে ঠিক আটকে থাকে।

চুনি-নীলা

মূল রাসায়নিক উপাদান হিসেবে বিচার করলে নীলা আর চুনি একই— অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। দুটোকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে কোরান্ডাম। কিন্তু চুনির লাল রং তৈরি হয় কোরানডামে সামান্য ক্রোমিক অক্সাইড মিশে থাকার জন্য, আর নীলার নীল রঙের জন্য দায়ী সামান্য টাইটানিয়াম অক্সাইড। এ

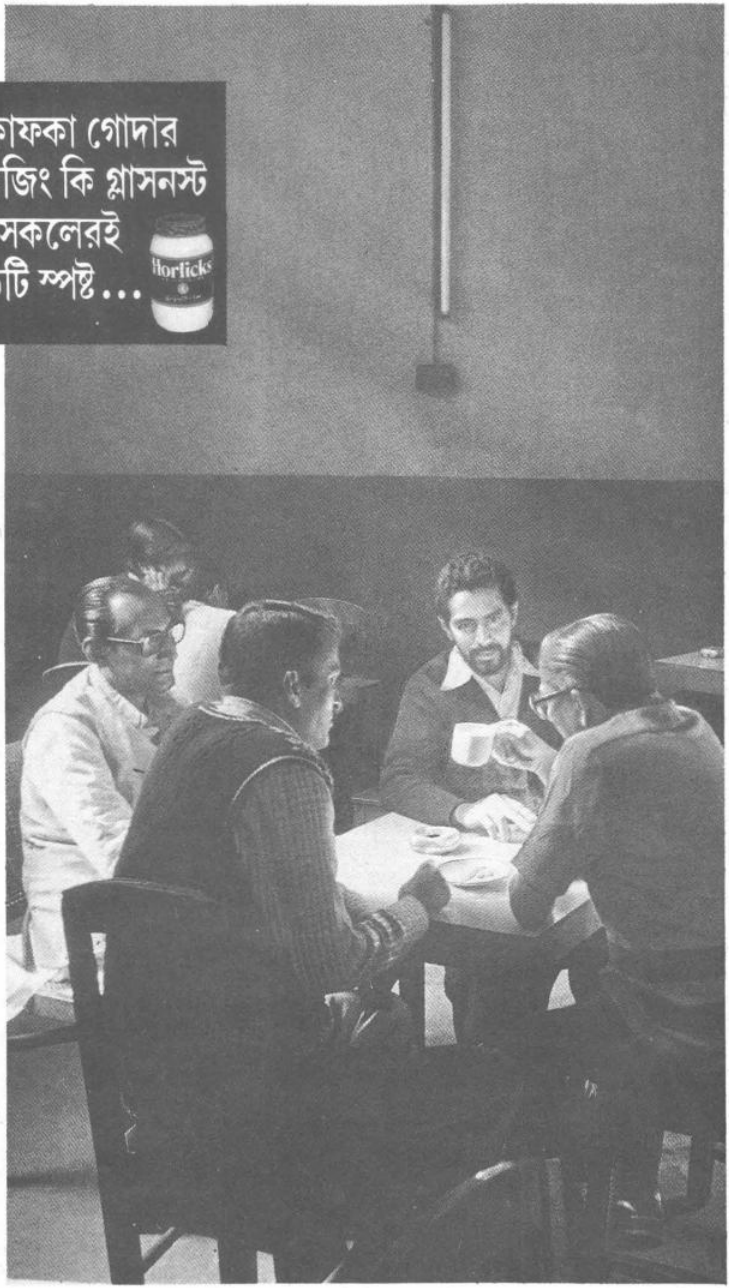

তক্কো জমে কাফকা গোদার
বেজিং কি গ্লাসনস্ট
এক ব্যাপারে সকলেরই
মতামতটি স্পষ্ট...

Horlicks

কলকাতার প্রাণ বলতে আড্ডা। কফি হাউসে, পাড়ার রকে, বৈঠকখানায়, লেকের ধারে সুযোগ পেলেই জমে ওঠে যুক্তি-তক্ক-গপ্পো। সিনেমা থেকে সাহিত্য, রাজনীতি থেকে রাজভোগ—কিছুতেই কলকাতার বাসিন্দাদের উৎসাহের সীমা নেই। কৌতূহলের শেষ নেই।

তবে এক ব্যাপারে কিন্তু সব্বাই একমত যে হরলিক্স-এর জুড়ি নেই। হরলিক্স কলকাতার ঘরে ঘরে সব্বাইকে জোগায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি আর উদ্যম। আর তাই কলকাতার প্রাণের স্পন্দন বলতেই সবার প্রিয় হরলিক্স।

কলকাতা
১৬৯০-১৯৯০

প্রাণের শহর কলকাতায়, পুষ্টি যোগায়, মনমাতায়, হরলিক্স

HTA 3794

ছাড়া বহুরকম ভেজাল থাকতে পারে আর তার ফলে কোরানডামের রং হয়ে ওঠে সবুজ, হলুদ, বেগুনি, গোলাপি ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে দামি ঘন লাল রঙের চুনি পাওয়া যায় বর্মাতে। তবে সিংহল থেকে আসা চুনিরও বাজারদর খুব বেশি। কিন্তু সবচেয়ে ভাল জাতের নীলা তৈরির দাবিদার কাশ্মির। সেখানে দুর্গম জানস্কর পর্বতের কোলে নীলার খনি বহুকাল ধরে মানুষকে আকর্ষণ করছে। অবশ্য তাইল্যান্ডের চান্তাবুন, অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাকি, আমেরিকার মনটানা ও সিংহলের রত্নপুরাতেও বেশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নীলা পাওয়া যায়।

ভাল চুনিকে একটা আগুনের দ্যুতির মতো মনে হয়—ঠিক যেন একটা গরম কয়লা সবে উনুন থেকে বার করা হয়েছে। কারণ, ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল আলো শুষে নিয়ে তাকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলোতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা আছে চুনির। এই ধর্মের জন্যই লেসার-রশ্মি আবিষ্কারে চুনির ভূমিকা রয়ে গেছে।

গোমেদ

অলঙ্কার বা জ্যোতিষের নিদান হিসেবে যে গোমেদ বাজারে চলে, তার রং সাধারণত নীল। হিরের বিকল্প হিসেবেও স্বচ্ছ গোমেদ অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই দুই রঙের গোমেদ প্রকৃতিতে আদৌ পাওয়া যায় না। মূল গোমেদ পাথরের রং লালচে-বাদামি অথবা হলুদাভ-সবুজ। রাসায়নিক নাম জারকোনিয়াম সিলিকেট। কিন্তু এর ভেতর প্রায়ই হাফনিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় ধাতু মিশে থাকে। তেজস্ক্রিয়তার জন্য যে আলফা-রশ্মি অবিরত বের হয় তার দৌলতে জারকোনিয়াম সিলিকেট স্ফটিকের ভিতর অণুর বিন্যাস নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই একে যদি আবার উত্তপ্ত করা হয়, তা হলে অণুগুলো নতুন বিন্যাসে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায়। খুব কম অক্সিজেনের সংস্পর্শে গরম করলে পাথরটা হয়ে ওঠে স্বচ্ছ। আর অত্যধিক বাতাসের সঙ্গে হয়ে ওঠে নীলচে। তা সত্ত্বেও পরিবর্তিত রং খুব বেশি স্থায়ী নাও হতে পারে। কখনও-কখনও সূর্যের আলোতে মেলে ধরলেই ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তাই গোমেদ গরম করার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে, হলুদ আলোতে কিংবা অতিবেগুনি রশ্মির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। যে পাথরগুলো রং বদলায় কম, সেগুলোকে রত্ন হিসেবে বাজারে ছাড়া হয়।

আজ পর্যন্ত বেশির ভাগ গোমেদই পাওয়া গেছে সিংহলের রত্নপুরায়, তবে তাইল্যান্ডেও সম্প্রতি কিছু-কিছু দেখা যাচ্ছে। গোমেদকে গরম করা ও কাটার সবচেয়ে বড় জায়গা ব্যাঙ্কক। সেখানকার স্বচ্ছ গোমেদ দেখলে হিরে বলে ভ্রম হয়। হিরের সঙ্গে একে চট করে আলাদা করার উপায় হচ্ছে কোনও বইয়ের ওপর গোমেদটাকে রাখা। যদি এক-একটা ছাপার অক্ষর দুটো করে মনে হয়, তা হলে পাথরটা নিশ্চয়ই গোমেদ, হিরে নয়। আলোর দ্বৈত প্রতিসরণের জন্য এই ঘটনা ঘটে।

বৈদূর্যমণি

কিছু পাথর আছে যেগুলোকে এদিক-ওদিক ঘোরালে বেড়ালের চোখের মতো চকচক করে ওঠে। এই ধর্মটির পারিভাষিক নাম Chatoyancy। কিন্তু এই ধরনের সব পাথরকেই বৈদূর্যমণি বলা যাবে না। যে পাথরের কাঠিন্য খুব বেশি, বহু বছর পরেও ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, সেই পাথরে যদি আলোর এই খেলা দেখা যায় তবে তা হবে বৈদূর্যমণি। এইরকম পাথর হচ্ছে ক্রাইসোবেরিল, রাসায়নিক নাম বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। আবার

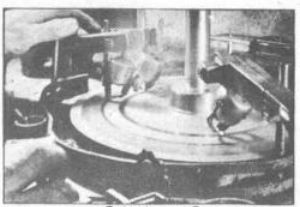

ঘুরন্ত চাকার ওপর হিরে কাটা ও পালিশ করা হচ্ছে

যে ক্রাইসোবেরিলে সামান্য লোহার অণুর ভেজাল আছে তাদের রং মধুর মতো হালকা সোনালি। এর পারিভাষিক নাম সাইমোফেন। উৎকৃষ্টতম বৈদূর্যমণি এগুলোই। ক্যাবোকন আকৃতিতে কাটলে একটা উজ্জ্বল নীল আলোর বিন্দু ফুটে উঠে বেড়ালের চোখের মণির মতো দেখায়। সবচেয়ে ভাল বৈদূর্যমণি বা ক্যাটস-আই পাওয়া যায় সিংহল ও ব্রাজিলে।

চন্দ্রকান্তমণি

ঘোলাটে সাদা বা ফ্যাকাসে গোলাপি পাথরের ওপর দুধের মতো সাদা একটা আলোর রেখা—এই হচ্ছে চন্দ্রকান্তমণি বা মুন-স্টোনের রূপ। আসলে, চন্দ্রকান্তমণির ভিতর একগুচ্ছ রাসায়নিক তন্তু বা ফাইবার একই সমতলে সমান্তরালভাবে লুকিয়ে থাকে। এই সমতলের সঙ্গে ঠিক লম্বভাবে ক্যাবোকন আকৃতি দিতে পারলে আলোর প্রতিসরণের জন্য সুতোর মতো দেখায়। তবে এই তন্তুগুচ্ছ খুব ঘন হলে সুতোর মায়া ফোটে না। চন্দ্রকান্তমণির রাসায়নিক পরিচয় হচ্ছে পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। তবে, পাথরটাতে যদি পটাশিয়ামের বদলে সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম থাকে, তা হলেও তারা সুন্দর রঙিন পাথর হয়ে ওঠে। শস্তা রত্ন হিসেবে এগুলোর প্রচলন আছে বটে, তবে তা চন্দ্রকান্তমণি নয়। চন্দ্রকান্তমণি সিংহল ও বর্মাতেই বেশি পাওয়া যায়, তবে মাদাগাস্কার দ্বীপে যে চন্দ্রকান্তমণি মেলে, তার রঙে একটু হলদে ভাব থাকার জন্য দাম অনেক কম।

পান্না

আসল পান্না হিরের চেয়েও দামি। অথচ পান্না যে ধরনের পাথর থেকে পাওয়া যায় তার নাম বেরিল, আর প্রকৃতিতে বেরিল মোটেই দুর্লভ নয়। এই পাথর আসলে বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেনের একটা জটিল যৌগ পদার্থ। কিন্তু ওর সঙ্গে ক্রোমিয়ামের সংযোগ খুবই বিরল। পান্নার উজ্জ্বল সবুজ রং তৈরি হয় এই ক্রোমিয়ামের দৌলতেই। কিন্তু বেরিলে লোহা বা ভ্যানাডিয়াম মিশেও সবুজ বেরিল তৈরি করতে পারে, আর সেই বেরিলের সঙ্গে পান্নার তফাত বুঝতে অনেক পাকা জহুরিও হিমশিম খেয়ে যান। পোলারিস্কোপ বা চেলসি ফিল্টার নামক যন্ত্রের ভেতর দিয়ে না দেখলে এই তফাত ধরা খুব মুশকিল। অথচ সবুজ বেরিল এতই শস্তা যে, রত্নের মর্যাদা পায় না।

পোখরাজ

প্রকৃত হলুদ পোখরাজের যা দাম, তার চেয়ে প্রায় দশগুণ শস্তায় পাওয়া যায় বাজারে। ওগুলো আসলে হলুদ কোরানডাম আর হলুদ কোয়ার্জ পাথর (সাইট্রিন)। একশো বছর আগেও যে-কোনও চকচকে হলুদ পাথরকেই ধরা হত পোখরাজ বলে, কিন্তু আসল পোখরাজ রত্ন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের জটিল ফ্লুয়োসিলিকেট। একমাত্র এই রত্নতেই দুর্লভ ফ্লোরিন গ্যাসের অণু আটকে আছে। পোখরাজের একটা গুণ হচ্ছে যে, এটার ওপর হাত বোলালেই একটা পিচ্ছিল অনুভূতি আসে, যা অন্য পাথরে হাজার পালিশ করলেও আসে না। তা ছাড়া, এর ভেতর কিছু বৈদ্যুতিক গুণও বেশি পরিমাণে আছে। যেমন, পোখরাজ একটু ঘষলেই ছোট কাগজের টুকরো আকর্ষণ করে নেবে। তা ছাড়া একে গরম করে আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা করলে এর ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হবে।

বিমান-সেবিকা হতে হলে

দেবাশিস দত্ত

এলেন চার্চ (Ellen Church) তখনও সানফ্রানসিসকো হাসপাতালের একজন সেবিকা। ১৯৩০ সালের একেবারে প্রথম দিকের কথা বলছি। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল নতুন এক চিন্তা। বিমানযাত্রীদের সেবার জন্য মহিলাদের কীভাবে কাজে লাগানো যায়? চিন্তা-ভাবনাও শুরু হল সেইসঙ্গে। বোয়িং এয়ার ট্রান্সপোর্ট কম্পানির কাছে এ-বিষয়ে প্রস্তাব রাখলেন এলেন চার্চ। কিন্তু কর্তৃপক্ষের আপত্তি এল। তাঁরা জানালেন, 'ওমেন ক্যান নট বি মেম্বার্স অব দ্য ফ্লাইট ক্রু।'

এলেন কিন্তু চেষ্টা ছাড়েননি। এয়ারলাইনসের কর্মকর্তাদের বললেন, বেশিরভাগ বাণিজ্যিক বিমানগুলিতে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। তাই তাঁরা যদি জানতে পারেন যে, মহিলারাও বিমান চালকদের সহকর্মী হিসেবে নিত্য যাতায়াত করছেন তা হলে আকাশযানে ভীতি তাঁদের কমবে। ফলে যাত্রী-সংখ্যা বাড়বে। চার্চের এই যুক্তি শেষ পর্যন্ত বোয়িং এয়ার ট্রান্সপোর্ট কম্পানি মেনে নিলেন।

ভারতের সমস্ত বিমানবন্দরই 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়া'-র পরিচালনাধীন। এই বিমানবন্দরগুলির মধ্যে তিনটি সংস্থার যাত্রিবাহী বিমান চলাচল করে। সেগুলি হল— (১) এয়ার ইণ্ডিয়া : আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগের জন্য। (২) ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস : জাতীয় স্তরে যোগাযোগের জন্য। (৩) বায়ুদূত : আঞ্চলিক স্তরে যোগাযোগের জন্য।

এই তিনটি সংস্থার প্রতিটিই তাদের প্রয়োজনীয় বিমান-সেবিকা নিয়োগ করে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথকভাবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়।

যাত্রিবাহী বিমানগুলিতে যাঁরা যাত্রী-সেবায় নিয়োজিত তাঁদের সাধারণভাবে বলা হয় 'কেবিন-ক্রু'। কেবিন-ক্রু পুরুষও হতে পারেন আবার মহিলাও হতে পারেন। পুরুষরা হলেন 'ফ্লাইট-পার্সার', আর মহিলারা 'এয়ার-হস্টেস' বা 'বিমান-সেবিকা'।

যোগ্যতা

শিক্ষা : যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও শাখায় স্নাতক হতে হবে। বা, সেকেণ্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট এবং সেইসঙ্গে কোনও স্বীকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে 'কেটারিং'-এ তিন বছরের ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সেকেণ্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট এবং সেইসঙ্গে কোনও স্বীকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে আরব, চিন, ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি, জাপান, মালয়, শ্যাম, রাশিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক বা একাধিক ভাষায় ডিপ্লোমা অথবা অন্তত ১৮ মাসের কোর্সের সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং সেইসঙ্গে সেই ভাষায় দক্ষতা থাকা চাই।

অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারার দক্ষতাকে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার ট্যুরিজম, সোশিওলজি, ফার্স্ট-এইড বা নার্সিং ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটধারীকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতা বিশেষভাবে নির্ভর করে কোন সংস্থা বিজ্ঞাপন করছে তার ওপর। আন্তর্জাতিক কোনও সংস্থা হলে বিদেশী ভাষায় দক্ষতার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আর জাতীয় স্তরে বা আঞ্চলিক স্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারার দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেন।

এলেন চার্চ

বয়স : বয়স কখনওই ১৯ বছরের কম নয় এবং ২৫ বছরের বেশি নয়।

উচ্চতা : উচ্চতা অবশ্যই ১৫৪·৫ সেন্টিমিটার হতে হবে এবং সেই অনুপাতে শারীরিক গঠনও দরকার। ফ্লাইট পার্সারদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৬৩ সেন্টিমিটার।

দৃষ্টিশক্তি : চশমা থাকলে চলবে না। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিই বাঞ্ছনীয়।

সৌন্দর্য : সুশ্রী হতে হবে। মধুর ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে ও বিনয়ী হতে হবে। গায়ের রং কখনওই বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে না। চলনে-বলনে এক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব হওয়া চাই।

বিবাহ-সংক্রান্ত : অবিবাহিত হতে হবে। উল্লেখ্য, চাকরিতে যোগ দেওয়ার তিন বছরের মধ্যে বিয়ে করা চলবে না। চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় এই শর্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে চাকরি ছেড়ে দেবার প্রশ্ন আসে।

পরীক্ষা

বিমান-সেবিকা বা ফ্লাইট-পার্সারের নিয়োগের জন্য পরীক্ষা হয় দু' দফায়। প্রথম দফায় হয় লিখিত পরীক্ষা। এই লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়ে দ্বিতীয়-দফার ইন্টারভিউ হয়। ইন্টারভিউ-এর পর ট্রেনিং। অবশ্যই এ সুযোগ শুধুমাত্র সফল প্রার্থীদের জন্য।

লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় কীভাবে? প্রশ্ন হয় 'অবজেকটিভ টাইপ', অর্থাৎ সঠিক উত্তরে শুধু দাগ দেওয়া। তবে সময়ের তুলনায় প্রশ্নের সংখ্যা বেশি। যদি ব্যাঙ্কের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে কোনও ধারণা থাকে, তা হলে বলতে হয়, অনেকটা সেই ধাঁচের। এই প্রশ্নে ইংরেজি আবশ্যিক।

লিখিত পরীক্ষার শুরুতেই প্রশ্ন সম্বলিত একটা বই প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে অবশ্য পৃথকভাবে উত্তরপত্রও দেওয়া হয়। প্রশ্নপত্রের সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্যে যেটি সঠিক বলে বিবেচিত হবে, সেটাই উত্তরপত্রে দাগ দিতে হবে।

এই লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীরাই কেবল ইন্টারভিউ-এর জন্য বিবেচিত হন। এই দ্বিতীয় দফায় সাফল্য লাভ করতে গেলে

বিমান-সেবিকার বড় গুণ নম্রতা ও বিনয়

যে বিষয়ে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হবে তা হল— (১) বিমান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা। (২) যে সংস্থা নিয়োগ করবে সেই সংস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান। (৩) হঠাৎ এই পেশায় আসার আগ্রহ কেন ? তার যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক উত্তর। (৪) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে সচেতনতা।

এ তো গেল পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। ইন্টারভিউ বোর্ড কিন্তু আরও বেশ কিছু বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দেন পরীক্ষার্থীর অজান্তেই। তার প্রতিটিতেই আলাদা আলাদা নম্বর রয়েছে। ইন্টারভিউতে সাফল্যের সিংহভাগই নির্ভর করে এই অজানা বিষয়গুলিতে পাওয়া মোট নম্বরের ওপর। অজানা বিষয়গুলি হল— ইন্টারভিউ বোর্ডকে প্রভাবিত করা, ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা, চালচলন, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণের স্পষ্টতা, ভাষার মাধুর্য, মেধা, মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা, স্বভাব, স্বাভাবিক প্রবণতা, আত্মবিশ্বাস, ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়।

কী প্রশ্ন করল, তার কী উত্তর দিলাম, তা ভুল দিলাম কি, ঠিক দিলাম, সেটা যত না গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে উত্তর দিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রেনিং

'এয়ার-হস্টেস ট্রেনিং'-ই কর্মজীবনের সূচনা বলা যেতে পারে। এই ট্রেনিং কোথায় হবে, কত দিন ধরে হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিয়োগকর্তার ওপর। এয়ার ইণ্ডিয়ার ক্ষেত্রে ট্রেনিং হয় বম্বের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে। এর মেয়াদ তিন থেকে ছ' মাস। এই সময় বেতন হিসেবে কিছু টাকাও দেওয়া হয়।

ট্রেনিং-এ কী কী শেখানো হয় ? প্রথমত, টেকনিক্যাল ট্রেনিং। বিমানে কোন যন্ত্রের কী কাজ, তার প্রয়োজনীয়তাই-বা কী ? সেইসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল করানো হয়। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্ট-এইড ট্রেনিং। তৃতীয়ত, যাত্রীদের আপ্যায়ন করার রীতি। চতুর্থত, হাইজ্যাকিং বা হঠাৎ কোনও যান্ত্রিক গোলযোগে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে।

কী কী কাজ করতে হয়

প্রথমত, যাত্রীদের পানীয় সরবরাহ করা, খাদ্য পরিবেশন করা ইত্যাদি থেকে শুরু করে তাঁদের হাজার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া।

দ্বিতীয়ত, হঠাৎ কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে তা থেকে সহজে অল্প সময়ে

যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি রাখতে হয় সদাসতর্ক দৃষ্টি

বর্তমানে এয়ার ইণ্ডিয়াতে বিমান-সেবিকার সংখ্যা হাজারেরও বেশি। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসও এই অঙ্কই দাবি করে। তবে বিদেশী এয়ারলাইনসগুলির খবর শুনলে অবাক হতে হয়। আমেরিকান এয়ারলাইনস-এ বর্তমানে পাঁচ হাজারেরও বেশি বিমান-সেবিকা রয়েছেন।

যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া।

তৃতীয়ত, প্রয়োজনে যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল, বিমান-সেবিকা হিসেবে চাকরিতে যোগ দিলেও তাঁদের বিমানের বাইরে বিমানবন্দরেও যাত্রী-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের-এর দায়িত্বে থাকতে হতে পারে। সাধারণত চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় চুক্তির শর্ত না মেনে বিয়ে করলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই গ্রাউণ্ডেড অবস্থায় রাখতে পারেন আবার বাতিলও করতে পারেন। বিমান-সেবিকা থেকে অবসর পেলে নিয়োগকর্তা যদি মনে করেন তা হলে গ্রাউণ্ডেড অবস্থায় নিয়োগ করতে পারেন। গ্রাউণ্ডেড থাকাকালীন ট্রাফিক কন্ট্রোল করা, যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সুবিধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানারকম কাজ করতে হয়। তা ছাড়া কোন বিমান কবে কখন ছাড়বে সে খবরও রাখতে হয়। যাঁরা গ্রাউণ্ডেড হিসেবে কাজ করেন তাঁরাই বিমান

ছাড়ার আগে বিমান-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব কিছু পরীক্ষা করে নেন।

বিশেষ সুবিধে

অন্যান্য চাকরির মতোই এখানেও তফসিল জাতি ও উপজাতিরা বিশেষ সুবিধে ভোগ করেন। যে-যে ক্ষেত্রে এই সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি হল— প্রথমত, বয়স সংক্রান্ত। এ-ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ১৯ থেকে ৩০ বছর। দ্বিতীয়ত, উচ্চতা সংক্রান্ত। এ-ক্ষেত্রে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, নিয়োগ সংক্রান্ত। শূন্য পদের ১৫ শতাংশ ও ৭½ শতাংশ যথাক্রমে তফসিল জাতি ও তফসিল উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। চতুর্থত, প্রমোশন – সংক্রান্ত। এ-ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষিত থাকে।

বেতন ও ভাতা

বিমান-সেবিকার চাকরি শুধুই যে রোমাঞ্চকর, তা নয়। বেতন ও ভাতা মিলিয়ে মাসিক রোজগারের অঙ্কটাও বেশ লোভনীয়। শুরুতে একজন বিমান-সেবিকার মাসিক বেতন ২,৫০০ টাকা থেকে ৪,০০০ টাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় বিমানে কাজ করার পর অতিরিক্ত সময়ের জন্য টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এইসব মিলিয়ে একজন বিমান-সেবিকার মাসিক আয় সাত থেকে ন' হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

প্রমোশন

এই চাকরিতে প্রথমে বিমান-সেবিকা বা এয়ার-হস্টেস হিসেবে যোগ দিতে হয়। তারপর ধীরে-ধীরে চিফ এয়ার-হস্টেস পর্যন্ত হতে পারেন। প্রমোশনের ধাপগুলো এইরকম— এয়ার-হস্টেস থেকে সিনিয়ার এয়ার-হস্টেস, এর পর চেক এয়ার-হস্টেস, ডেপুটি চিফ এয়ার-হস্টেস এবং শেষে চিফ এয়ার-হস্টেস।

চাকরির মেয়াদ

বিমান-সেবিকা হিসেবে চাকরির মেয়াদ ৩৫ বছর। তবে অনেক ক্ষেত্রে এই সময়সীমা বাড়িয়ে ৪৫ বছর করা হয়েছে। তা অবশ্য শর্তসাপেক্ষে। ৩৫ বছরের পর প্রতি বছরই 'মেডিক্যাল চেক-আপ' হয়। তাতে যোগ্য বিবেচিত হলেই চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়। এইভাবেই ৪৫ বছর পর্যন্ত টানা যেতে পারে। তার বেশি একদম নয়। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আবার বিমান-সেবিকা থেকে অবসর গ্রহণের পর গ্রাউণ্ডেড হিসেবে কাজ করার সুযোগ থাকে। এই অবস্থায় অবসর গ্রহণের বয়স ৫৮ বছর।

হিসেব-নিকেশ করে বলা যায় বর্তমানে এয়ার ইণ্ডিয়াতে বিমান-সেবিকার সংখ্যা হাজারেরও বেশি। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস-ও অবশ্য এই অঙ্কই দাবি করে। তবে বিদেশী এয়ারলাইনসগুলির খবর শুনলে অবাক হতে হয়। আমেরিকান এয়ারলাইনস-এ বর্তমানে পাঁচ হাজারেরও বেশি বিমান-সেবিকা রয়েছেন। সেখানে প্রতি পঞ্চাশজন যাত্রীর জন্য একজন বিমান-সেবিকা আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাপান এয়ারলাইনস, বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ প্রভৃতি বিদেশী যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে, সেগুলিতে ভারতীয়দের বিমান-সেবিকার কাজে সুযোগ যে নেই তা কিন্তু নয়। তবে, সংখ্যায় অল্প হলেও, তাঁরা বম্বে-দিল্লি থেকেই প্রয়োজন মিটিয়ে নেন। কলকাতার মেয়েরা তাই অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগ হারান।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

যেদিন ভাঙল চার মিনিটের বাধা

এই শতাব্দীর শুরু থেকে অসংখ্য দৌড়বীর চেষ্টা করেছেন আপাত অসম্ভব এক লক্ষ্যে পৌঁছতে। লক্ষ্যটা হল চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দৌড়নো। ১৯৪৫ সালে সুইডেনের গান্ডার এই সীমার খুব কাছাকাছি পৌঁছলেন। তিনি এক মাইল দৌড়লেন ৪ : ০১·৪ মিনিটে। আট বছর ধরে এই রেকর্ড অম্লান রইল। তারপর আসরে নামলেন রজার ব্যানিস্টার নামে এক ইংরেজ তরুণ। ডাক্তারির ছাত্র ছিলেন তিনি। ক্রীড়া জগতের যাঁরা হর্তাকর্তা সেই কোচ, এবং ম্যানেজারদের এড়িয়ে একাই শুরু করলেন অনুশীলন। আর নিজের ডাক্তারি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে সীমাটা তিনি কমিয়ে আনলেন ৪ : ০৩·৬ মিনিটে। সেটা ১৯৫৩ সাল।

ব্যানিস্টার এবার তাঁর দেহে হৃৎস্পন্দনের হার কমানোয় সচেষ্ট হলেন। এই হার কমিয়ে তিনি নিয়ে এলেন ৫০-এ। (পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের গড়পড়তা হার ৭২)। এর ফলে প্রতিটি স্পন্দনে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি অক্সিজেন সরবরাহ করতে লাগল। এইভাবে দেহে অক্সিজেন সরবরাহের মাত্রা বাড়িয়ে দৌড়নোর সময় ক্লান্তির মাত্রা কমিয়ে আনলেন তিনি।

চার মিনিটের কম সময়ে 'স্বপ্নের দৌড়' কী পরিবেশে হওয়া উচিত, কোচ এবং শারীরবিজ্ঞানীরা তার নিয়ম বা শর্ত স্থির করেছিলেন অনেক আগেই। সেই অনুযায়ী, এই দৌড়ের আদর্শ স্থান হল স্ক্যানডিনেভিয়া, তাপমাত্রা যেখানে ৬৮° ফারেনহাইট। দৌড়ের সময় কোনও বায়ুপ্রবাহ থাকবে না। শুকনো মাটি দিয়ে তৈরি করতে হবে ট্র্যাক এবং সেটা রীতিমত শক্ত হওয়া চাই। এ ছাড়া প্রচুর দর্শক উপস্থিত থাকবে দৌড়বীরদের উৎসাহ জোগাতে। আর প্রথম এক-চতুর্থাংশ মাইল পর্যন্ত দৌড়ের গতিবেগ হবে সবচেয়ে মন্থর। আর শেষ চতুর্থাংশে এই বেগ হবে দ্রুততম।

ব্যানিস্টার ওইসব নিয়মের ধারেকাছেও গেলেন না। ১৯৫৪ সালের ৬ মে ব্রিটিশ অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের দুই সতীর্থ রেশার এবং চ্যাটাওয়েকে নিয়ে চার মিনিটের বেড়া ভাঙার জন্য তিনি তৈরি হলেন। অক্সফোর্ডে সেদিন কনকনে ঠাণ্ডা। হাওয়া বইছে প্রায় ঝড়ের গতিতে। বিকেলের এক পশলা বৃষ্টিতে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ট্র্যাকও স্যাঁতস্যাঁত করছে। সেদিন মাঠে দর্শক ছিল হাজার দেড়েকেরও কম।

ব্যানিস্টার ও তাঁর দুই সঙ্গী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও তিনজন দৌড়বাজ সূচনারেখায় লাইন করে দাঁড়ালেন। শুরু হল দৌড়। ব্যানিস্টার এক-চতুর্থাংশ মাইল পেরোলেন ৫৭·৫ সেকেন্ডে। আধ মাইলের চিহ্ন স্পর্শ করলেন ১ : ৫৮·২ মিনিটে। ততক্ষণে রেশার ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়েছেন। চ্যাটাওয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন তার আগেই। কিন্তু কথামতো ব্যানিস্টারকে উদ্দীপ্ত করতে দু'জনেই ফের দৌড়তে শুরু করলেন এবং বন্ধুকে ছাড়িয়ে এগিয়েও গেলেন কিছুটা।

রজার ব্যানিস্টার

সমাপ্তিরেখা যখন মাত্র তিনশো গজ দূরে ব্যানিস্টার তাঁর গতি বাড়াতে লাগলেন। লম্বা লম্বা পা পড়ছে। মাথাটা হেলে পড়েছে পিছন দিকে। শেষ সীমারেখার ফিতে স্পর্শ করলেন তিনি। করেই পড়ে গেলেন অচেতন হয়ে।

এবার মাইকে বেজে উঠল ঘোষকের কণ্ঠ : "এক মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বেড়া গুঁড়িয়ে গেছে। ভেঙেছেন এক ইংরেজ সন্তান। তিনি সময় নিয়েছেন তিন মিনিট ঊনষাট দশমিক চার সেকেন্ড। এটা বিশ্বরেকর্ড।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যানিস্টার চেতনা ফিরে পেলেন। কিন্তু তখনও তাঁর নাড়ির স্পন্দন ১৫৫। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লেগে গেল প্রায় তিন ঘণ্টা। সেই সন্ধেতেই ব্যানিস্টারকে লন্ডন টেলিভিশনে দেখানো হল।

রজার ব্যানিস্টার তাঁর 'ফার্স্ট ফোর মিনিট্স' বইয়ে সেই চরম মুহূর্তটির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন : "দৌড় যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে সেই সময় একটা মুহূর্তে অনুভব করলাম যুগপৎ আনন্দ এবং যন্ত্রণা, তারপর আমার মন ছুটতে লাগল শরীরের আগে আগে এবং টেনে নিয়ে চলল পা দুটোকে। তখন আর কোনও যন্ত্রণা নেই। আছে শুধু গতি ও লক্ষ্যের এক আশ্চর্য সম্মিলন। মনে হল, সারা বিশ্ব থমকে দাঁড়িয়ে গেছে,অথবা এর কোনও অস্তিত্বই নেই। তখন একমাত্র বাস্তব হল পায়ের নীচে আর মাত্র ২০০ গজের ব্যবধান এবং সমাপ্তিরেখার ওই ফিতেটাই।"

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে, ব্যানিস্টার যখন খ্যাতির শীর্ষে, সেই সময় নিজেকে চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিয়োজিত করার জন্য দৌড় ছেড়ে দেন তিনি। আর আজ সার রজার ব্যানিস্টার ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিউরোলজিস্ট।

কুইজ

প্রশ্ন

(১) কোন টেস্ট ক্রিকেটের মাঠ 'গাব্বা' নামে খ্যাত ? **সন্তু ও অন্তু সেনগুপ্ত**, বহরমপুর ।
(২) গ্রিনল্যান্ডের রাজধানীর নাম কী ? **রবি মল্লিক**, জুলিয়েন ডে স্কুল ।
(৩) ভারতের কোন বন্দরকে বলা হয় 'আরব সাগরের রানি' ? **অরূপা আইচ**, মধ্যমগ্রাম ।
(৪) 'আই সি এস' কোন সাহিত্যিকের স্মৃতিকথা ? **কৌশিক দাস**, এ ভি বি স্কুল, দুর্গাপুর ।

(৫) শেক্সপিয়রের কোন নাটকের নায়িকার নাম মিরান্দা ? **সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী**, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা ।
(৬) বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং-এর বর্তমান চ্যাম্পিয়ান কে ? **জয়ন্ত চক্রবর্তী**, দুর্গাপুর-১ ।
(৭) লক্ষ্মণের দুই ছেলের নাম কী ? **গৌতম মাইতি**, দুর্গাপুর-৬ ।
(৮) সাহিত্যে সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী কে ? **রথীন্দ্রনাথ দে**, কোন্নগর ।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ইন্দোনেশিয়া ।
(২) মহম্মদ আলি জিন্না ।
(৩) সাড়ে আট ফুট ।
(৪) ভিভিয়ান রিচার্ডস ।
(৫) বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে ।
(৬) এড্রইন অলড্রিন ।
(৭) গোষ্ঠ পাল ।
(৮) অ্যারেন্টা স্যানচেজ ।
(৯) ডি· সার্ভেন্টেস ।
(১০) অশোককুমার ।
(১১) জুডি ফস্টার ।

মহম্মদ আলি জিন্না

কুলদীপ নায়ার

(১২) ওয়াল্টার হাড্‌সন ।
(১৩) রাজস্থানে ।
(১৪) জম্মু-কাশ্মীরে ।
(১৫) উষ্ণ বায়ু ।
(১৬) সিসা ও অ্যান্টিমনি ।
(১৭) অপর্ণা সেন ।
(১৮) কুলদীপ নায়ার ।
(১৯) জোহানেসবার্গ ।
(২০) জ্যাকি জয়নার কার্সি ।
(২১) রেঁমি জর্জ ।
(২২) হর্ষবর্ধন ।
(২৩) চিনে ।

(৯) 'লাইফ ডিভাইন' কার লেখা ? **পার্থ মুখোপাধ্যায়**, বাগনান ।
(১০) 'ইরানি কাপ' কোন খেলার পুরস্কার ? **সুবীর ঘোষ**, কান্দি ।
(১১) বিশ্বের বৃহত্তম কারাগার কোনটি ? **সোমনাথ মুখার্জি**, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ।
(১২) পেলের জার্সির নম্বর কত ছিল ? **দেবাশিস দাস**, বিশ্বভারতী ।
(১৩) মাইক টাইসন নিজের বক্সিং-গ্লাভস কাকে উপহার পাঠিয়েছেন ? **দুলাল দাস**, রেলওয়ে হাই স্কুল, মরিয়ানি ।
(১৪) এবারের সন্তোষ ট্রোফি আমাদের জাতীয় ফুটবলের কততম প্রতিযোগিতা ছিল ? **অরিজিৎ সেনগুপ্ত**, মেদিনীপুর ।
(১৫) কয়নি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ? **জয়ন্ত চক্রবর্তী**, দুর্গাপুর ।
(১৬)'তরল সোনা'কোন জিনিসকে বলা হয় ? **সুমিতা হালদার**, বাঁকুড়া ।
(১৭) দেশলাই কে আবিষ্কার করেন ? **সন্দীপন ভৌমিক**, মুর্শিদাবাদ ।
(১৮) মেঘালয়ের রাজধানীর নাম কী ? **রীতা দে**, চেতলা ।
(১৯) 'লোহিত কিনারে' সিরিয়ালের পরিচালিকার নাম কী ? **তপন গুহ**, কলকাতা-১৪ ।
(২০) 'ভারতের গ্যারিবল্ডি' কাকে বলা হত ? **স্বরূপশোভন মুখোপাধ্যায়**, হিন্দু স্কুল ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

প্রশ্ন

বিষয় : পরমাণু পদার্থ

(১) লোহাকে মরচের হাত থেকে রক্ষা করতে অর্থাৎ 'গ্যালভানাইজ' করতে কিসের প্রলেপ দেওয়া হয় ?

(২) কোন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি ?

(৩) ফুল্‌স-গোল্ড কী ?

(৪) পৃথিবীর মৌলগুলির মধ্যে কোনটির ঘনত্ব সর্বাধিক ?

(৫) নিওন আলোর রং নীল হয় কেন ?

(৬) এমন দু টি মৌলের নাম করো, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যারা তরল ।

(৭) কোন দুটি মৌলিক পদার্থ উত্তাপে গলে গেলে আয়তনে সঙ্কুচিত হয় ?

(৮) কোবাল্ট ক্লোরাইডে সম্পৃক্ত কাগজ বাতাসের আর্দ্রতা পরীক্ষার কাজে লাগানো যায় । এই কাগজ বাতাসের সংস্পর্শে নীল হয়ে গেলে সেটা কিসের লক্ষণ ?

(৯) রান্নার বাসনপত্র তৈরির পক্ষে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উপযোগী কেন ?

(১০) মানবদেহের অন্ত্রের ভিতরকার এক্স-রে ছবি তোলার আগে বেরিয়াম খাওয়ানো হয় কেন ?

(১১) হাইড্রোজেন বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর সৃষ্ট ধোঁয়া ও মেঘের মধ্যে ঘটনাক্রমে নতুন একটি মৌলের সন্ধান পাওয়া যায় । সেটির নামকরণ করা হয় এক বিজ্ঞানীর নামে । মৌলটি কী ?

(১২) পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান মৌল কোনটি ?

(১৩) রঙিন টিভিতে নীল ও সবুজ রং সৃষ্টি হয়ে থাকে দুটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে । এই ব্যাপারটা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৪ সালে । মৌল দুটি কী ?

(১৪) রুথেনিয়াম মৌলের নামকরণ কীভাবে হয়েছিল ?

(১৫) মানুষের তৈরি কোন মৌল সবচেয়ে বিপজ্জনক ?

(১৬) কোন দুটি মৌলের আইসোটোপ (একস্থানিক) সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ?

(১৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকোর কাছে সান্তা ক্লারা উপত্যকাকে বলা হয় সিলিকন-উপত্যকা । কেন ?

(১৮) কোন মৌলের সঙ্গে বিজ্ঞান-কল্পনার সুপারম্যান-এর নাম জড়িয়ে আছে ?

(১৯) নদীর নামে একটি মৌল আছে । কী তার নাম ?

(২০) ১৯৮৯-এর জুনে 'অগ্নি' নামে যে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়, একটি নকল বোমা বসানো ছিল তার মাথায় । বোমাটি কিসের তৈরি ?

(২১) ছবি (ক)

ছবি (খ)

ছবি (গ)

(২১)ক· হিরেকে পুড়িয়ে ইনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, হিরেও কার্বনের একটি রূপ । কে ইনি ?

খ· এই বিজ্ঞানী ক্যালসিয়ামের আবিষ্কারক । এঁর নাম কী ?

গ· শততম মৌলের নামকরণ করেন এই পদার্থ বিজ্ঞানী, তাঁর নিজের নামেই । বলতে পারো কে এই বিজ্ঞানী ?

উত্তর : (১) জিঙ্ক বা দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয় ।

(২) টাংস্টেন । গলনাঙ্ক ৩৪১০° সেন্টিগ্রেড ।

(৩) আয়রন পাইরাইটিস্ ।

(৪) অস্‌মিয়াম্ ।

(৫) আরগন ।

(৬) ব্রোমিন ও পারদ ।

(৭) বেরিয়াম ও গ্যালিয়াম ।

(৮) শুষ্ক ও ভাল আবহাওয়া ।

(৯) অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাঁধলে খাদ্যবস্তুর ভিটামিন ক্ষয় সবচেয়ে কম হয় ।

(১০) ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রশ্মি বেরিয়ামকে ভেদ করতে পারে না । ফলে অন্ত্রে কোনও ক্ষত থাকলে তার ছবি উঠে যায় ।

(১১) আইনস্টাইনিয়াম ।

(১২) ক্যালিফোর্নিয়াম । পরমাণু শক্তিসংস্থা প্রতি মাইক্রোগ্রাম এক হাজার ডলারে এটি বিক্রি করে থাকে । অর্থাৎ এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের দাম হাজার ডলার ।

(১৩) ইউরোপিয়াম ও ইট্রিয়াম ।

(১৪) রুথেনিয়াম এসেছে লাতিন শব্দ 'রুথেনিয়া' থেকে, যার অর্থ রাশিয়া । রাশিয়ার উরাল পর্বতমালায় পাওয়া আকর থেকে রুশ বিজ্ঞানীরাই প্রথম এই মৌলটি আবিষ্কার করেন ।

(১৫) প্লুটোনিয়াম ।

(১৬) জেনন এবং সিসিয়াম । প্রত্যেকের আইসোটোপ-সংখ্যা ৩৬ ।

(১৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা বহু মাইক্রোইলেকট্রনিক কারখানা এই উপত্যকায় অবস্থিত । মাইক্রোচিপের মূল উপাদান হল সিলিকন । তাই এর নাম সিলিকন-উপত্যকা ।

(১৮) ক্রিপটন । এই মৌলেরই কাল্পনিক আকর ক্রিপটোনাইটের পাথর বা পাহাড় সুপারম্যানের পক্ষে মারাত্মক । বলা বাহুল্য, এরকম কোনও পাথর বা পাহাড় পৃথিবীতে নেই ।

(১৯) রেনিয়াম । রাইন নদীর নামেই এই নামকরণ ।

(২০) টাংস্টেন ধাতু ।

(২১) (ক) আঁতোয়ান ল্যাভয়েসিয়ের ।

(খ) সার হাম্‌ফ্রে ডেভি ।

(গ) এনরিকো ফেরমি । মৌলের নাম ফেরমিয়াম ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিন্নির খই লাল বাতাসা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবল চুড়ির আওয়াজ পাচ্ছে। কাছে কোথাও ইন্দু লুকিয়ে আছে। কঠের বাক্স থেকে টর্চ বের করে ক্রীতদাসের মতো বাচ্চু বলল, এবারে কী খরব বিন্নির খই ! কোথায় গেলি ?

"হাতির পিঠে টর্চের ফোকাস ফেল।" অদৃশ্য লোক থেকে কেউ কথা বলছে।

টর্চের ফোকাস ফেলতেই বাচ্চুর চক্ষুস্থির। হাতির উপরে দেবী। বনদেবী। হাতে শঙ্খ, ত্রিশূল। লাল বেনারসি পরা ইন্দুর দু'চোখ বিস্ফারিত। মাথায় সোনার মুকুট। স্থির অবিচল। এমনকী, চোখও। দেবী যেন বাতাসে ভেসে আছেন। টর্চের ফোকাসে দেবী বাদে সব অদৃশ্য। এমনকী, ইন্দু যে হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। ইন্দু হাতির পিঠ থেকে নেমে বলল, "কী বুঝলি ?"

বাচ্চু বলল, "জানি না। যা !" শেষে বলল, "তোর মাথায় এত দুষ্টু বুদ্ধি !" ইন্দুর আর কোনও কথা শোনার সময় নেই। সে বলল, "শিগগির হাত লাগা। আমি সাদা শাড়ি পালটে আসছি।"

সকালে উঠেই মাতির মা প্রাসাদের বারান্দা ধরে ছুটে যাচ্ছে। "ঘরে ইন্দু দিদিমণি নেই।"

নেই, নেই।

সারা প্রাসাদে শোরগোল।

কাছারিবাড়িতে খবর এসে গেল, ইন্দু হাওয়া। এত কড়া নজরবন্দী কী করে আলগা হয়ে যায়—ভুতুড়ে ব্যাপার—মাতির মা কপালে করাঘাত করছে, সে সারারাত জেগেই থাকত—সে ঘুমোত না, ইন্দু-দিদিমণি নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। ইন্দু-দিদিমণির মধ্যে সেই দুষ্ট আত্মার ছলনাও ছিল না, আরোগ্যলাভ করছিল—এখন সেই নেই।

বাবুমশাই বৈঠকখানায় এসে হাঁকলেন, "কে আছিস ? শিগগির খবর দে সুকুমারকে। নরেনকে। সবাইকে খবর পাঠা।" ইন্দু সুপারির বাগানে পালিয়েছে কি না, কিংবা ইন্দু যদি সত্যি সেই দুষ্ট আত্মার ছলনায় পড়ে দিকভ্রান্ত হয়—কত কিছুই হতে পারে—বাবাঠাকুরকে তিনি কী জবাব দেবেন—ইস, কী যে হবে—সারা গাঁয়ে হইরই পড়ে গেছে। আর এ-সময় বাচ্চুর বাবা মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'বাচ্চুকে পাচ্ছি না।"

নদীর পাড় ধরে সে ডেকে এসেছে, যদি হলুদের জমিতে লুকিয়ে থাকে—গেল কোথায় ! এ ক'দিন তিনি বাচ্চুকে খুবই গম্ভীর দেখেছেন। কেমন অন্যমনস্ক, কখনও চুপচাপ বসে থাকত নদীর পাড়ে—হায় হায় সে গেল কোথায় ! আর পবন এসে খবর দিল, সর্বনাশ। লক্ষ্মীও নেই ! ছেলে এত বড় অরাজকতা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মানুষ সব লোপাট হয়ে যাচ্ছে, আর কিনা এই দুঃসময়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে ইন্দু-দিদিমণি হাওয়া। নিখোঁজ।

গাঁয়ে-গাঁয়ে খবর রটে গেল। সুকুমারকে পাঠানো হল, সে ঘোড়ায় চড়ে পাঁচ-সাত ক্রোশ টহল দিয়ে ফিরে এসেছে, কোথাও কেউ বলতে পারেনি, হাতির গলার ঘন্টার শব্দ তারা কেউ শুনেছে ! তাজ্জব ব্যাপার, গেল কোথায় ! না কি বাবাঠাকুরের কোনও কৃপা ! তাঁরই ইচ্ছে এমন হবে—তিনি তো সব আচার-নিয়ম বলে দিয়ে গেছিলেন। পদ্মাবতী অলস রমণী—নিজের সন্তানের প্রতিও তাঁর নজর নেই—বাবুমশাই খেপে গিয়ে বললেন, "সবাইকে বের করে দাও বাড়ি থেকে। আমার বাড়ির এত বড় কলঙ্ক সইব না। সুকুমারকে ডাকো।"

সারাদিন ধরে একে ডাক, ওকে ডাক। ডাকাডাকিই চলছে। সব আমলারা হাজির হচ্ছে, পাইক-বরকন্দাজ হাজির। মাতির মা সকাল থেকেই কপালে করাঘাত করে চলছে, চোখের পলকে হাওয়া। সে ভোররাতেও দেখেছে ইন্দু-দিদিমণি বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন। দুপুররাতেও দেখেছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বালা থাকে। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দিনমান বসে থাকা তার, তার চোখের উপর থেকে হাওয়া, এক পলকের মধ্যে, এই আছে এই নেই। কিছুতেই স্বীকার করছে না অঘোরে সে ঘুমোত। বাবুমশাই অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দুষ্ট আত্মার বিচরণ নিজের চোখে দেখেছেন। ফুলমণির দুষ্ট আত্মার কাজ—ইন্দু হাওয়া হয়ে যেতেই পারে—কিন্তু বাচ্চু আবার কোন দুষ্ট আত্মার প্রকোপে পড়ে গেল ! লক্ষ্মী তো মানুষ না যে তার উপর দুষ্ট আত্মার ভর করবে। পাগলা হাতির আবার দুষ্ট আত্মা থাকবে কেন ? এতসব ভাবতে-ভাবতে মনে হল প্রাসাদে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দরকার। বাবাঠাকুরকে খবর দেওয়া দরকার। তিনিই বলতে পারবেন, আসলে কী হয়েছে। তাঁর দিব্যদৃষ্টির কাছে ফাঁকি

দিতে পারে এমন কেউ আছে তিনি ভাবতেই পারেন না। বিচার-বিবেচনা করতে সময় লাগে। রক্ষিত-জ্যাঠামশাই বললেন, "আজ্ঞে হুজুর, এত খোঁজাখুঁজি না করে সুকুমারকে পাঠিয়ে দিন।"

বাচ্চুর বাবা বললেন, "আমার তো মনে হয় তিনি রওনা হয়ে গেছেন। আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন!"

বাবুমশাই বৈঠকখানার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে। ভারী সুদর্শন, ভারী মোটা গোঁফ, হাঁড়ির মতো ভারী মুখ। কোঁচানো ধুতি, ফতুয়া গায়। মাথার কাছে ভজন তালপাতার পাখায় সর্বক্ষণ হাওয়া করছে। ইন্দুর জন্য মমতা তার না যতটা, বাবাঠাকুরকে মুখ দেখাবেন কী করে, দুশ্চিন্তা তার চেয়ে বেশি। আর এ-সময় কী শুনছেন! "তিনি তো রওনা হয়ে গেছেন!"

"তুমি কী করে বুঝলে রওনা হয়ে গেছেন।" রক্ষিত জ্যাঠাকে কড়া প্রশ্ন।

"হুজুর, আপনার এত বড় বিপদে তাঁর আসন টলে উঠবে না বলুন! তিনি তো সর্বজ্ঞ। স্থির থাকবেন কী করে! ভক্তের বিপদে গুরুর আসন টলে উঠবে না!"

না, তিনদিন হয়ে গেল, তার আসনও টলেনি—তিনি নির্বিকার। তাঁর টিকিরও পাত্তা পাওয়া গেল না।

থানা-পুলিশ কোথাও খবর দিতে বাকি নেই। ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। পদ্মাবতীর নাওয়া-খাওয়া নেই। এমন সুন্দর মেয়েটার পেছনে এত লাগলে তারই বা দোষ কী। সে তো পালাবেই। বাবুর কেরামতিতে সংসার ছারেখারে যাচ্ছে কে দ্যাখে! বাচ্চুই বা কেমন, তুই জানিস ইন্দুর মতি স্থির নেই, তোর তো মতি স্থির ছিল।

সবাই ধরে নিয়েছে হাতিটাকে নিয়ে ওরা পালিয়েছে। আর এও তো বিস্ময়ের, হাতি গেলে ঘণ্টা বাজবে, সেই ঘণ্টার শব্দে তল্লাটের কে না টের পায়, বাবুদের হাতি যায়। আর চরের কাশবন থেকে গলার ঘণ্টার খবর নিয়ে এল রামসোন্দর। বলল, সে নদীর চরায় হাতির পায়ের ছাপ দেখেছে। কাশের জঙ্গলে হাতির ঘণ্টা পড়ে

আছে। লোকজন ছুটছে, পায়ের ছাপ কোনদিকে গেছে, গেছে উত্তরের দিকে। ওরা কি নদী পার হয়ে তবে চলে গেল! সেটা কোথায়, কতদূর! সুকুমার রওনা হয়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে, বনজঙ্গল টিলা পার হয়ে দু'দিনের পথ, সে চলে গেছে খবর দিতে, কী হবে? বাবাঠাকুর এখন কী বিধান দেন সেই দেখার।

সুকুমার জানে, রাস্তা দুর্গম। পাহাড় টিলা তৃণভূমি পার হয়ে সর্বজ্ঞের সাম্রাজ্য। পাহাড়ের মাথায় সর্বজ্ঞর দেবী মহামায়ার থান। সেখানে যেতে হলেও হাতে জান নিয়ে যেতে হয়।

তবে তাকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়নি।

বন দুর্গাপুর থেকেই খবর নিয়ে এল। গ্রামবাসীরা সুকুমারকে চেনে। বাবুর মহালে সুকুমার আদায়পত্রে একসময় আসত। তাকে দেখে সবাই নিরস্ত করেছে যেতে। যাবেন না। দেবীর কোপে পড়ে গেছেন সর্বজ্ঞ। অন্ধকার রাতে রক্তে বিভূষিত কুণ্ডল করনে দেবী চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেলেন। এই আছেন, এই নেই। তিনি কখনও জ্যোতির্ময়ী, কখনও গভীর অন্ধকারে অদৃশ্য! গভীর রাতে কুকুরের আর্তনাদে কে একজন বের হয়ে দেখেছিল, মাঠের উপর দিয়ে দেবী ভেসে চলে যাচ্ছেন। ঝলমল করছে দেবীর পোশাক। এক হাতে শঙ্খ। অন্য হাতে ত্রিশূল। আরও খবর,সর্বজ্ঞর তপোবন পুড়ে ছারখার। আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে, টিন-কাঠের বাড়ি, শণের চাল, কিংবা পাতার কুটির আগুনে জ্বলে উঠলে, চোখে ভেসে উঠেছে, দেবী দিগন্তে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছেন। মনসা পাহাড়ের ওপারে শেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আরও খবর বাড়ির পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা পাওয়া যাচ্ছে না। একনলা বন্দুকটি হাওয়া। টোটার বাক্স নেই।

সুকুমার ফিরে এসে খবর দেবার আগে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের খোঁজ পড়েছিল। ওটা থাকে প্রাসাদের অস্ত্রাগারে।

আর কী কী গেল!

লাঠি গেল। তরবারি গেল, প্রায় সব ফাঁকা করে দিয়েছে ইন্দু।

সবই যে অলৌকিক ঘটনার মতো। কখন করল, কীভাবে করল! বাবুমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। বাচ্চুর খোঁজে তার বাবা দেশেও লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি ইন্দুকে নিয়ে সেখানে পালিয়ে যায়। বাচ্চু নিখোঁজ, এটা লিখতে বাচ্চুর বাবার বুক কেঁপেছে।

চিঠিতে জানিয়েছেন: বাবুমশাইয়ের মাথা ঠিক নেই। ইন্দু গেছে। অস্ত্রাগারটিও সাফ করে নিয়ে গেছে। এখন আর-এক আতঙ্ক। জমিদারের প্রাসাদ সুরক্ষিত রাখার এমন এলাহি বন্দোবস্ত ইন্দু ছারেখারে দিয়ে গেছে। দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। রাতের বেলা হাজাররকমের সন্ত্রাস। নদীতে সারি-সারি নাও ভেসে গেলে ভয়, এই বুঝি লেগে গেল, রাতের বেলা কারা যায় নৌকায়! কার নৌকা, কিসের নৌকা। ডাকাতির ভয়ও কম না। হুজুরবাহাদুরের সময় খুবই খারাপ যাচ্ছে।

বাবুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবরও দেওয়া হল সঙ্গে।

বাচ্চুর জ্যাঠামশাই ছুটে এসেছেন। তিনি সব শুনে বললেন, "ইন্দু যখন সঙ্গে আছে ভয় নেই। খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার উপর দুষ্ট আত্মা ভর করেছে বলছ! দুষ্ট আত্মা ভর করেছে তোমাদের উপর। বাচ্চুর বাবাকে এক ধমক,"তুমি কেন আগে আমাকে আসতে লিখলে না! ইস, এমন সুন্দর মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে। হাতি নিয়ে পালিয়ে গেছে বেশ করেছে।"

সুকুমার প্রায় আধমরা হয়ে ফিরে এল। কোনওরকমে ঘোড়ার পিঠে ঝুলছিল। এসেই ঘোড়ার পিঠ থেকে বাবুমশাইয়ের পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ল। সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। বাবুমশাইকে কী যে খবর দেবে! সর্বজ্ঞর লাশ শিমুল গাছের ডালে ঝুলছে। পচে গেছে। দুর্গন্ধ। কাকে ঠুকরে খাচ্ছে লাশ। পচা দুর্গন্ধে মহামায়ার মন্দিরের কাছেই যাওয়া গেল না।

এত বড় লাশ ছুঁড়ে দিয়েছে মগডালে কে, কেউ বলতে পারছে না। অতিকায় সব পাথর পাহাড়ের ঢালুতে পড়ে আছে। পথ বন্ধ। শুধু চারপাশে ধ্বংসলীলা। পোড়া মাঠের ধোঁয়া দূর থেকেও সুকুমার দেখতে পেয়েছে।

এমনও গুজব, আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দেবী মহামায়ার কোপ। তিনি নিজেই ঘরে ঘরে আগুনের মশাল ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। দক্ষযজ্ঞ আর কাকে বলে! কোন অপরাধে দেবী নিজেই আবির্ভূতা হয়ে সব যে শেষ করে দিলেন—কেউ তার কারণ বুঝতে পারছে না।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ-কেউ ত্রাসে পড়ে বোবা হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না। রুদ্রাক্ষের মালা-তাবিজ পরা গেরুয়া পোশাক দেখলেই দেবী আকাশ থেকে নেমে আসছিলেন। ভেসে যাচ্ছিলেন। দৌড়েছে। যে যার প্রাণ নিয়ে দৌড়েছে। কৌপিন ফেলে লুঙ্গি পরে দৌড়েছে। বাবাঠাকুরের সব চেলা নিমেষে হাওয়া। লুঙ্গি নয়, কোট পরে ঝোপ-জঙ্গলে অদৃশ্য। মাঝে-মাঝে দেবীকে বিশাল অজগরের মাথায় ভেসে যেতে দেখা গেছে। অজগর না বাঘ, না চলন্ত মাটির ঢিবি, কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

মাঝে-মাঝে দেবী নাকি কথাও বলছিলেন, "লাল বাতাসা কী বুঝছিস এবার। ভয় পাচ্ছিস না তো!"

অন্ধকার থেকে কে বলছে, "বিন্নির খই, ওদিকটায়। ওই পালাচ্ছে। আরে পাথরের আড়ালে! দেখতে পাচ্ছিস না!" আবার বলছে, "ইস, তোর শেষে এই লীলা! বেনারসি পরে তোকে সত্যি দেবী মনে হচ্ছে।"

দেবী তদ্‌গত চিত্তে নাকি বলেছেন, "মহামায়ায় কোপ থেকে কে রক্ষা পায় দেখি!"

তারপর দেবী নাকি ভেসে চলে গেলেন—দূরে, আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেলেন। কখন তিনি যে নক্ষত্র হয়ে ফুটে থাকলেন আকাশে!

পাশে জ্যাঠামশাই বসে সব শুনে বললেন, "সত্যি তিনি দেবী।" বাচ্চুর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেবীই তাকে রক্ষা করবেন বিশু।" বিশু, অর্থাৎ, বাচ্চুর বাবা বিশ্বনাথ উঠে কাছারি বাড়ির দিকে চলে গেলেন। বাবুমশাই হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন,"আমার এমন প্রতিমাটিকে নদীর জলে বিসর্জন দিলাম যজ্ঞেশ্বরবাবু। আমার প্রতিমাটি যে চোখ খুলে দিল, কত বড় অলীকের পিছনে আমরা ছুটছি।"

আর এ-সময়ই বাচ্চুর বাবা কাছারিবাড়ি থেকে ছুটতে-ছুটতে আসছেন। কাঠের বাক্সে চিঠি। ইন্দুর চিঠি। ইন্দু লিখেছে,'খুড়ামশাই বাচ্চুর জন্য ভাববেন না। ওকে আমি নিয়ে গেছি। নদী কোথায় যায় খুঁজতে বের হয়েছি।'

জ্যাঠামশাই বুঝলেন, নদী কোথায় যায় বলতে ইন্দু জীবনের রহস্যময়তায় কথাই বুঝিয়েছে।

জ্যাঠামশাইয়ের মনে হল, ইন্দু শুধু বুদ্ধিমতী নয়, বিচক্ষণও। জীবনের সেই গভীর অর্থটি নাড়া দিলে, দেবদেবী, ঈশ্বর বিশ্বাস, মহামায়ার মন্দির, বাবাঠাকুর সবই যে কালের যাত্রার রূপক মাত্র। তিনি এটা বোঝেন বলেই সান্ত্বনা দিলেন বাবুমশাইকে—"যে যার মতো বাঁচে, বড় হয়। আমরা নিমিত্ত মাত্র, বাবুমশাই। আপনি চোখের জল ফেলবেন না। এতে ইন্দুর অমঙ্গল হবে। ওরা যেখানেই থাকুক, ভাল থাকুক।" (সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

একটি মাইনসুইপারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তৈরি হয়েছে সামুদ্রিক প্রত্নতাত্ত্বিক টম কিনসায়েডের রত্নসন্ধানী জাহাজ টরটুগা। টারজান, জেন এবং জেনের বাবা প্রোফেসর পোর্টারকে নিয়ে টরটুগা মোম্বাসা থেকে জলমগ্ন ধনরত্নের সন্ধানে রওনা হয়েছে।

চাকা-চরিত

সমীর মুখোপাধ্যায়

চাকা-কে আমি চিনতাম না মোটেই। এই যে এতদিন পাড়ুয়ায় অমলদের বাড়ি যাচ্ছি কিন্তু কোনওদিন ওদের মুখে চাকার নাম শুনিনি। সেদিন রবিবারে এক শালিখ-চরা দুপুরে ওদের বাড়ি গেছি, অমল টিউবওয়েলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল, ও আমাকে বারান্দার একটা দিক নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে বললে, "চাকাকে দেখুন। স্যাম্পল একখানি। আমাদের কলোনিতে ও একাই ফেমাস করে ছেড়েছে। বিখ্যাত লোক। মহাশয় ব্যক্তি। কোতোয়ালি থেকে প্রায়ই থানার বড়বাবু ওর ভালমন্দ সংবাদ নিতে আসেন।"

অমলের কথায় ঘাড়টা ফেরালাম, দেখলাম ওদের ঢাকা-বারান্দার অদূরে একটা মাদুরের ওপর অমলের মা মানে মাসিমা আর চাকা দুজনে খুব মন দিয়ে লুডো খেলছে।

ঘরে ঢুকে অমল বলল, "কেমন দেখলেন?" এ আর দেখাদেখি কী! অতি সাধারণ চেহারা। গাঁয়ের ভিখিরি, ভবঘুরে, পরের এঁটোকাঁটা খেয়ে যারা মানুষ, তাদের একজনের মতোই দেখতে। খালি গা, খালি পা, শুধু একটা প্যান্ট পরনে আর প্যান্টের পেছন

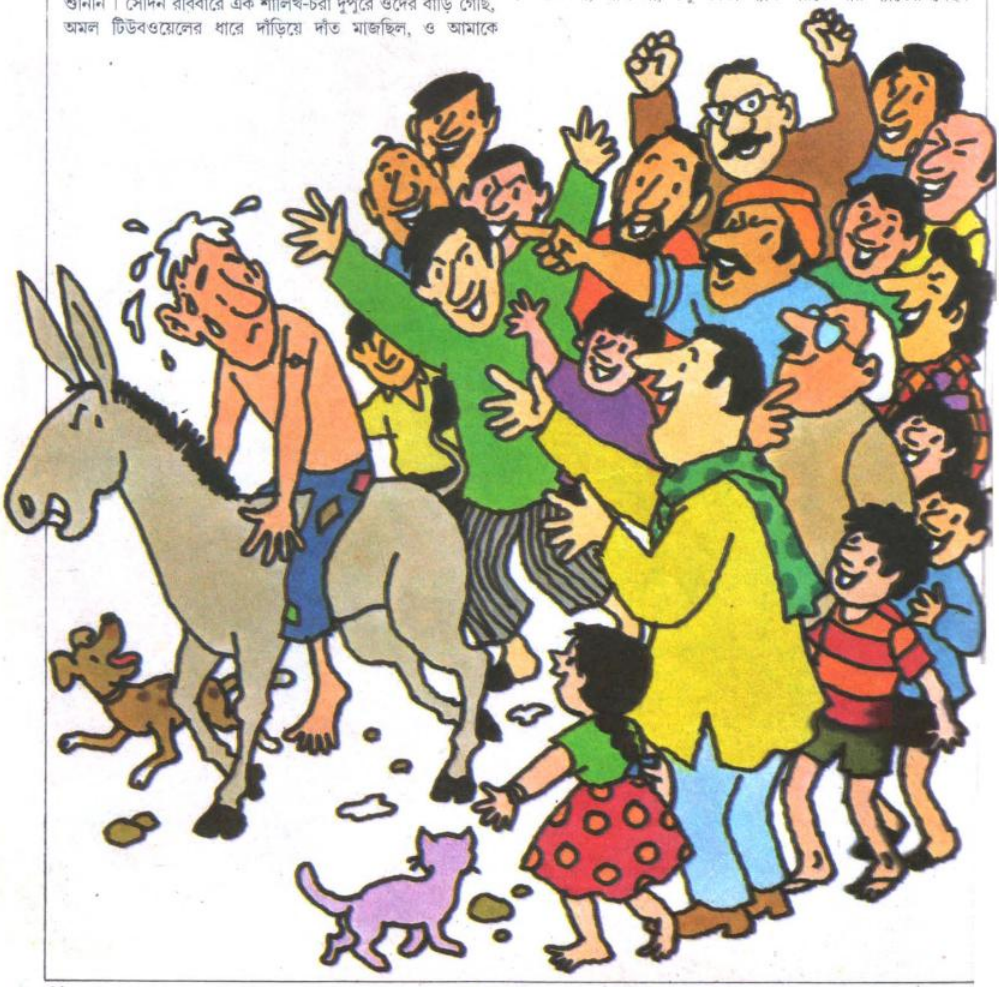

দিকটায় তো শত তালি ! আমি বুঝতেই পারছি না, অমল অমন করে ওর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কেন ?

বললাম, "বিখ্যাত কেন ? মহাশয় ব্যক্তিই বা কেন ?"

অমল বলল, "এসব অঞ্চলে থানার বড়বাবুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কী জিনিস আপনি না দেখলে তা ভাবতে পারবেন না। সেই বড়বাবু প্রায় নিত্য আসেন চাকার খোঁজখবর নিতে। ও অবশ্য প্রায়ই থানায় যায় বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। বিখ্যাত না হলে এটা কি সম্ভব ?"

তা বটে। আমার বাড়িতে তো থানাদার আসে না। নিশ্চয়ই এর একটা গূঢ় কারণ আছে, যা আমি জানি না। বললাম, "ও করেটা কী ?"

"চুরি।"

"অ্যাঁ ! লোকটা চুরি করে ?"

"এতেই অবাক হচ্ছেন, শুধু চুরি করে না, চুরি করে সংসার চালায়।"

এবার আমার আঁতকে ওঠার পালা। বললাম, "বিয়ে করেছে নাকি !"

অমল খুব নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, "এ আপনাদের ভারী অন্যায়। চুরি করে বলে বিয়ে করতে পারবে না, বিয়ে করেছে বলে চুরি করতে পারবে না— এ কেমন কথা ! ওকে জিজ্ঞেস করবেন, ও স্পষ্ট বলবে, হ্যাঁ চুরি করি। তারপর সমাজ ব্যবস্থার অসাম্যের ওপর বেশ দু-চার লাইন গড়গড় করে বলেও যাবে। কমলাকান্তও কোট করতে পারে, ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।"

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তা চোর জেনেও মাসিমা যে ওকে নিয়ে লুডো খেলতে বসেছেন !"

"কী করবে মা ? ওকে কেউ-কিছু করতে পারে না। দেখুন, তাকিয়ে দেখুন, কাঁঠালগাছে পাঁচটা কেঁদো-কেঁদো কাঁঠাল। আপনি এই বিশ্বাস নিয়ে আজ বাড়ি যান যে, কাল নিশ্চয়ই একটা কাঁঠাল আমাদের খোয়া যাবেই। বাজারে বসে ওই আবার আমাদের বিক্রি করবে চড়া দামে, আর সব জেনে আমাদের তা কিনতেও হবে।"

"অথচ তোমরা কেউ কিছু ওকে বলবে না ?"

"না। শুধু আমরা কেন ? গোটা পাণ্ডুয়ায় প্রত্যেক ঘরে অবাধ গতিবিধি। ওর যে কত ধর্মবাপ, মা, মাসি, পিসি, বোন, ভাই, দাদা, কাকা, মামা—তা গুনে শেষ করা যাবে না। টুপুন একপাশে খেলছে, বউদি কুটনো কুটছে বঁটি পেতে। ও তাড়াতাড়ি বউদির কাছে চলে যাবে, বলবে, 'সড়েন, সড়েন ঠাইরেন। আপনি পাকশালে যায়েন। শ্যামলদা অ্যাক্ষুনি গাড়ি ধরব। টাইমের ভাত—একটু এদিক-ওদিক করবার জো নাই।' বলেই কুটনো কুটতে বসে যাবে। এরপর আপনি ওকে না বলে কি পারবেন, 'ওরে চাকা, আজ এ-বেলাটা তুই এখানেই খাস ?' বলুন, পারবেন ? এরকম প্রত্যেক ঘরে-ঘরে। কিছুদিন ও এখানে ছিল না, ধান্দা গুছোতে নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও গিয়েছিল, বাড়িতে আসতে জিজ্ঞেস করলাম,'কী রে, এবার রোজগারপাতি কেমন ?' ও বলল, 'চাঁদিপুর গেসলাম, বুঝলা ?'

"'চাঁদিপুর ? সেটা আবার কোথায় ?'

"'আরে চাঁদিপুর। ইয়া দিয়া যাইতে হয়। জাগাটা—খাড়াও, কইত্যাসি, কত দিকেই তো যাই, কত রাস্তাঘাট, খানাখন্দ আমারে ডাকে, অত কী তোগোর মতো মনে থাকে ? তা ছাড়া, বোঝোই তো—তখন অন্যদিকে মন !'

"'অন্য দিকে মন ? অন্য দিকে মন কেন হবে ? গেছিস একটা দরকারি কাজে বা বেড়াতে, তোর সেদিকেই মন থাকবে। অন্যদিকে মন ? না, না, এ ভাল কথা না।'

"একটু ইতস্তত করে চাকা বলল, 'আসল কথা কী জানো ? মানে নজরটা রাখতে হয় পায়ের দিকে, এবার বুঝলা ?'

"'পায়ের দিকে ? তা পায়ের দিকেই বা নজর রাখবি কেন ? কী সব বলছিস, সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে।'

"'যাবেই তো।' চটেমটে চাকা বলল, 'খুব বেশি করে লেখাপড়া কোরো না! মাথা গুলাইয়া যায়, ওই জন্যই লেখাপড়ার লাইনে যাই নাই, যাউগ্গা মানষের পা-ই তো সব। এক-একটা পা এক-একরকম। বাচ্চাদের পা একরকম, মা লক্ষ্মীদের পা একরকম, জোয়ান-মদ্দদের পাগুলান কি বুড়াবুড়ির মতো অইব ? নানারকমের পা আছে না ?'

"'থাকলই বা। তা পা নিয়ে আমি কী করব ?'

"'আহা তুমি করবা ক্যান ? আমি করুম্। খুইল্যা বলত্যাসি।'

"'সেবার যে ট্রেনে উঠছিলাম সেবার উঠছিলাম ক্ষুর-বাটি লইয়া।'

"'তোর সবই অদ্ভুত। ক্ষুর-বাটি নিয়ে কেউ ট্রেনে ওঠে ? লোকে তো বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে ওঠে। তোর সবই....'

"'সেবার ক্ষুর-বাটি লইয়া মা দুয়ারে স্মরণ কইরা ট্রেনে তো উঠলাম। তা মইন্দ রোজগার অইল না। প্রথম খেপেই ধর গিয়া যাইতে যাইতে দশটা মাথা আর কুড়িটা দাড়ি নাবাইলাম। প্রথম খেপেই ট্রেনের ভাড়াটা কেমুন উইঠ্যা আইল। দ্বিতীয় খেপে মানে ফিরতি খেপে ওই একই কাণ্ড ! পেত্যেকবার তো এক কাম করলে চলে না। এবার তাই পায়ের দিকে নজর। সকলেই জুতো বেঞ্চির তলে রাখে। সারা দুপুর গা ম্যাজম্যাজ কইরা গেল। বিকাল, সন্ধ্যাও তাই। কাজের মানুষ কাজ না পাইলে গা ম্যাজম্যাজ করবেই। রাত যখন বারোটা,সবাই ভোঁস-ভোঁস কইরা ঘুমাইত্যাসে,তখন হইল গিয়া আমার কামের সময়। ঘুমে সবাই কাতর, কার আর নজর আছে বেঞ্চির তলে রাখা জুতোর দিকে ? সেই সুযোগে আমি জুতো সরাই, থলি বোঝাই করি, এক কামরা থিকা অপর কামরায় যাই, আবার জুতো সরাই, আবার থলি বোঝাই করি, তারপর ঝুপ কইরা কোনও অজানা স্টেশনে নাইব্যা পড়ি। ফিরতি ট্রেনে সোজা কলকাতায়— একেবারে নিজের দ্যাশ, পুরনো বলো, নতুন বলো, এসব জুতোর নানা দোকান ওখানে আছে, পাইকার আছে। এবার যা রোজগারপাতি তাতে তিন হপ্তার রেশন তোলনের আর ভাবনা নাই, বুঝলা ? এরপর যখন বাইরে যামু তোমার লগে একজোড়া আনুম।'

"'বেরো, দূর হ।' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ও চুরি করে জুতো এনে আমাকে পরাবে, আস্পর্দ্ধা কম নয় ?' ও পুরাতন ভৃত্যের কেষ্টার মতো হেসে বলে, 'এইজন্যই এ-লাইনের গুরু বলছেন, চাকা ভাইটি, কক্ষুনো যাইচ্যা লুকের ভাল করবা না।'"

খানিক পর বউদি চা দিয়ে গেল আমাদের। চায়ে চুমুক দিতেই অমল বেশ চানকে উঠল। বলল, "গোরুহাটার ওপর মনার মিষ্টির দোকান তো আপনি জানেন ?"

"বারে, জানব না কেন ? কতদিন ওখানে বসে শিঙাড়া ধ্বংস করেছি, চা খেয়েছি।"

"শুনুন, ব্যাপারটা খুলে বলি। এই সকাল আন্দাজ সাড়ে ছ'টা হবে, মনা ঝুলকালো বড় কড়াইতে তাড়ু মারছে, ওর এখন একটুও ফুরসত নেই, এক্ষুনি কচুরির খদ্দেররা ঝাঁক বেঁধে আসবে, আর-একটা কড়াইতে তেল টগবগ করে ফুটছে, ও চেল্লাচ্ছে, 'এই ভজা, চুবড়িটা, ওরে তাড়াতাড়ি কর, ওই সঙ্গে তরকারির বালতিটা বুঝলি ?' এমন সময় দু'হাতে সাপটে-ধরা টালির বাণ্ডিল নিয়ে চাকা মনার দোকানের সামনে এসে বলল, 'মনা রে, ও আমার মনা ?'

"'যা, যা, ভাগ অখন।' মনা খেঁকিয়ে উঠল,'আমার অখন মরণের সময় নাই। অ্যাক্ষুনি খদ্দের আইস্যা যাইব। কচুরি চাইব। এখন ভাগ।'

"'আরে মনা, তুই কি আমারে কুত্তা পাইছস ? তাড়া দিচ্ছস এমন

কইরা য্যান আমি এক পিস আওয়ারা ?'

"মনা কড়াতে তাড়ু মারতে মারতে বলল, 'দ্যাখ চাকা। এই বিহানবেলায় দিক করস না। অখন বহুত ঝামেলা। পরে অসিস, টুটাফুটা যা থাকব তরে দিমু। এখন যা।'

"'বেশ, চইলাই যাই। খানকতক টালি আনছিলাম। যদি নিতি, তুই বন্ধু লোক, কম দামে দিতাম। শস্তায় দিতাম। তা তর তো দেখি নিবার মর্জি নাই। যাই রহমচাচার লগে।'

"'টালি ?' মনার সংবিৎ ফিরল শস্তার গন্ধ পেয়ে বলল,'তাই ক। আমি ভাবলাম না জানি কী। কই দেখা। কত কে ?'

"পর-পর আটখানি টালি চাকা নাবিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই বন্ধু লোক, তর লগে আর কী দর করুম। এক-একখান দুই টাকা। জানিস তো, এ টালি এক-একখান চার টাকা।'—দাম চাকা ঠিকই বলেছে। টালিগুলোও মন্দ না। পাছে হাতছাড়া হয় তাই মনা বলল, 'থো। এই সকালে বউনি হয় নাই। পরে টাকা লইয়া যাস।' ওর কথা শুনে চাকা কোনও জবাব দিল না। টালিগুলো গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। মনা বলল, 'আরে, চল্লি কুথা ? ওগুলান তো লমু বললাম।' চাকা বলল, 'অ্যাক্ষুনি দাম দিতে অইব। আমার হাতের জন্য অ্যাক্ষুনি টাকা লাগব। কাল রাতে দত্তদের পাঁচিল থিকে পইড়্যা গিয়া···' কথাটা আর শেষ না করে চাকা বলল, 'হাসপাতালে গিসলাম। হাসপাতাল তো দেইখ্যা-শুইন্যা ওষুধ লিখ্যা দিল, বলল, এখানে নাই। বাইর থিকে কিন্যা লও, বুঝলি, টাকা অখন খুব দরকার।'

"'হ, বোঝলাম। চালের বাতা থেকে খুব কালচে-মার্কা আটটা দু' টাকার নোট খুব মন খারাপ করে মনা বার করে এনে চাকার হাতে দিল। মনটা ওর খচখচ করে উঠল। সকালে এখনও বউনি হয়নি, এর মধ্যেই ফালতু কড়কড়ে ষোলোটা টাকা বাইরা গেল। না, এ রকমটি হলে তো ব্যবসা গুটাইতে অইব।' চাকা আর দাঁড়াল না। মনার দিকে ফিক করে একটু হেসে ওষুধের দোকানের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল। দুপুরবেলা ভাইকে টাটে বসিয়ে মনা ঘরে এসে ভাত খেতে বসেছে। মনটা হঠাৎ কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। তাই তো, বরাবরই ঘরটা আন্ধার আন্ধার লাগে। আজ কেন এত ফর্সা ফর্সা লাগে ! ব্যাপারটা কী ? ভাতের থালার ওপর পর্যন্ত আলোটা গোল হয়ে পড়েছে। হঠাৎ মনার কী হল, ও ওপরের দিকে তাকাতেই ওর মাথাটা বোঁ করে দু'পাক ঘুরে গেল। মাথার ওপর ছাদের দিকে বেশ অনেকটা জায়গার টালি একেবারে বেবাক ফাঁক। রাত্তিরবেলা অন্তত একশো তারা দেখা যাবে। চড়াত করে রক্ত মাথায় উঠে গেল। এ নিয্যস চাকার কাজ ! তাই হাইস্যা-হাইস্যা চার টাকার জিনিসে দুই টাকার লালচ দেখানো! মনা দড়াম করে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে 'আজ তোর একদিন কী আমার একদিন,' বলে পাঁইপাঁই করে জি টি রোড ধরে ছুটতে লাগল। মনার এই উন্মত্ত ছুট দেখে রাস্তায়-ঘোরা গোরুগুলো ভড়কে গিয়ে ছুটতে লাগল। উঃ, সে একটা দৃশ্য লালুদা, হেসে কূল পাবেন না। মনা যত ছোটে গোরুগুলো তত দৌড়য়, গোরুগুলো যত দৌড়য় মনা তত ছোটে, রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমে গেছে, সবাই কাজকর্ম ছেড়ে মজা দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ আবার উৎসাহও দিল, 'মনা, ওই গোরুটারে টিট কর সোনা, কে জানত মনার এত গুণ, তরে বিশ্বরান প্রতিযোগিতায় ভারতের হইয়া এবার লড়তে অইব, বাংলার মান রাখ মনা, দেইখ্যা-শুইন্যা মনে হইতেছে তুই পারবি। বাংলার মান রাখতে পারব।'

"মনার মনের মধ্যে তখন শুধু একটি কথাই গুন-ছুঁচের মতো তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করছে, 'বদমাশটা আমার টালি আমারে বেইচ্যা আমারে ছিবড়া কইরা দিতে চায়, দাঁড়া ধরি একবার, তারপর অর একদিন কি আমার একদিন !' কিন্তু চাকাকে মনা ছুটে কোথায় পাবে ? একটু পরেই মনা সেটা বুঝল। ও শান্ত হয়ে গেল হঠাৎই। দোকানের টাটে গিয়ে বসল। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় মনা দ্যাখে কী—চাকা তারই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। হাতের তাড়ুটা ঝপাং করে উত্তেজনার মাথায় ফেলে দিয়ে সোজা গিয়ে মনা চাকার ঘাড় ধরল, বললে, 'এবার ? এবার কী হয়। দে, দে আমার পয়সা ফেরত, দে আমার টালি ফেরত।' চাকা হাসতে হাসতে বলল, 'এই মনা, কী করস ? পোলাপানরা হাসত্যাসে। ঘাড়ে লাগে। হাতটা সরা।'

"'সরাচ্ছি।' বলে মনা ঘাড়ে আরও চাপ দেয়, আর মুখে বলে, 'দে, শিগগির, না হলে তরে লরির তলায় ফেলুম। আমারে তুই তো ভালমতোই জানস। যা বলছি কর।' ঘাড়ে খুব লাগলেও চাকার মুখে তখনও হাসি এবং একটুও অস্বস্তি নেই, ও বললে, 'তুই যা করবার তা করিস। আমারও তো একটা কথা আছে, সেটা তো শুনবি !' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকারও একটা বক্তব্য আছে বইকী। ওর যদি কিছু বলার থাকে তো ওকে বলতে দিতে হবে—।' চাকার চারপাশে জমে যাওয়া পাবলিক চাকাকে উৎসাহ দিল। চাকা বললে, 'কাল রাতে দত্তদের পাঁচিল থিকে পইড়্যা হাতটা মুচড়াইয়া গেল গিয়া, তাই···'

"পাবলিক থেকে একজন ফিক-ফিক করে হেসে বললে, 'অত রাতে দত্তদের পাঁচিলে তুই উঠেছিলি কেন ?'

"'অন্যায় প্রশ্ন। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দত্তদের পাঁচিল বলে ক্যান আমার নিজের ভিটার চারপাশে যদি পাঁচিল থাকত তবে তাতে যদি উঠতাম তখন তো কেউ কিছু বলত না। আমি এ-প্রশ্নের জবাব দিমু না। জবাব না দিবার রাইট আছে আমার।' বলে একটু থেমে চাকা বলল, 'হাসপাতাল থিকে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁইন্ধ্যা দিল, কিন্তু বলল, ট্যাবলেট কিনতে অইব বাহির থিকে। এখন টাকাটা আমি পাই কোথা ?' রাগে গজরাতে গজরাতে মনা বলল, 'তাই বইল্যা তুই আমার টালি চুরি কইরা আমারেই বেচবি !' সে-কথার যে-জবাব চাকা দিল, জবাবের ইতিহাসে এরকমটি এর আগে কখনও শোনা যায়নি, এ-কথা হলফ করেই বলা যায়। সবাইকে চমৎকৃত করে নিজের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চাকা বলল, 'খুব তো বড়-বড় কথা বলছিস, আমার টালি চুরি কইরা শ্যাষে আমারেই বেচবি ?''তো কী করুম তুই বল ? তোর কাছে চাইলে তুই দিতি ? বল না—তোর কাছে ষোলোটা টাকা চাইলে তুই দিতি ? তুই যা কঞ্জুষ তুই একটা টাকাও দিতি ? লোক চিনা আছে।' চাকার জবাবটা শুনলেন ?"

বললাম, "ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। তুমি চালিয়ে যাও।"

"এ আর এমন কী !" অমল ফের আরম্ভ করলে, "বেবির বিয়ে হয়েছে সমুদ্রগড়ে। জামাই-এর কাছে যাচ্ছি, পথে বাস মিলবেই, এমনিই একটু হাঁটছি জি টি রোড ধরে, এমন সময় অবতার সিং-এর লরির মাথা থেকে 'অমলদা' বলে যে চিৎকার করে ডাকল সে আর কেউ নয়, সে আমাদের চাকা।

"'কোথায় চললা ?'

"'সমুদ্রগড়।'

"'ক্যান ? মায়ের থানে।'

"'না। আমার বোন বেবিকে তো তুই জানিস। ওদের কাছে একটা কাজ আছে।'

"'ঠিক আছে। তুমি যাইও বেবিদিদির বাড়ি। আমি যাইয়া ঢুকুম কালীবাড়িতে।'

"'ওখানে গিয়ে কী করবি ?' আমি সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম,'খবরদার। ওখানে গিয়ে যদি কালীর জিনিস সরাও তো

সব্বনাশ হয়ে যাবে। ও কালী খুব জাগ্রত।'

"'ধুর।তোমার খালি জিনিস সরানো আর জিনিস সরানো। ওসব করুম ক্যান? আমি শুধু মা-রে জানাইব, মা গো, জননী গো, অজন্তা-দিদিমণির অপমানটা আমি হজম করতে পারতেছি না। দিদিমণি যদি আমার কান দুইটা মুইল্যা দিত তাইলেও আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু এ তো অন্য কথা মা। দিদিমণি আমার প্রেস্টিজ লইয়া টান দিসে। অরে মা তুমি একটা শাস্তি দাও। প্রাণে মাইরো না, কানাখোঁড়া কইরা দিও না, কিন্তু কঠিন কুনো শাস্তি দাও।'

"বললাম, 'কেন রে, অজন্তা-দিদিমণিকে জ্বালাতে গেলি কেন? তুই কি অজন্তা-দিদিমণির প্রাইমারিতে ভর্তি হতে গিয়েছিলি?' রেগে গরম হয়ে গেল চাকা। গম্ভীর হয়ে গলায় পারসোনালিটি এনে বললে, 'ইয়ার্কি করবা, না আমার কথা শুনবা?' বলে একটু চুপ করল, তারপর বলল, 'কে যেন আমার খবর আইন্যা দিল, দিদিমণির প্রায়মরিতে মানে প্রাইমারিতে ফ্রিতে চাউমিন দিতেসে। তো পেরায় চাউমিন চাউমিন শুনি। খাই নাই কুনো দিনি। খাইতে খুব ইচ্ছা হইল। তো সটান গেলাম ইস্কুলে। আমার তো চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ, দাড়ি-গোঁফ নাই, বয়েস যাই হোক, বয়েসটা বোঝা যায় না, বালক যেমন বলা যায় না তেমনি খুব একটা লোক-লোকও দেখায় না। একটু ঝুঁকি থাইক্যা যায়। তবু গিয়া ছেলেগুলানকে হাত করলাম। যে ছেলেটা তখনও পর্যন্ত আসে নাই, তার রোল নম্বরটা একচল্লিশ। আমি ঠিক করলাম, একচল্লিশের ডাক আইলে আমি ইয়েস দিমু, ওদের মতো আর হাতে-হাতে অরা যেমন চাউমিনের প্যাকেট পাইব, তেমনি আমারও মিলব একটা। ওমা! কাণ্ড! চল্লিশের রোল কলের পর একচল্লিশ সাইজ্যা যেই আমি হাঁক দিসি ওমনি দরজার কিনার থেকে খুব বদমাশ একটা পোলাপান হাঁক পাড়ল, 'এই যে আমি দিদিমণি, আমি একচল্লিশ, আইস্যা গেছি গিয়া, মায়ের অসুখ, মা-রে ওষুধ খাওয়াইয়া আসতে দেরি হইল।' দিদিমণি ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, বললেন, 'তবে যে দুটো আওয়াজ শোনলাম। তুমি তো রতন। তোমারে চিনি। আর-একটা—সেটা কেডা হাঁক দিল।' বলে দিদিমণি তন্নতন্ন করে চক্ষু ঘুরাইয়া শ্যাষে আমারে ধরল, বলল, 'চাকা তুই! তুই এখানে কী কইরা ঢুকলি?' আমি আর কী বলি, ধরা পড়ে গেছি, খুব খানিকটা হাসি মুখে আইন্যা আদুরে গলায় বললাম, 'এমনি দিদিমণি, এমনি, ইচ্ছা হইল, তাই এমনি আইস্যা···' দিদিমণি কথা শেষ করতে দিলেন না, আমার বয়েসের মান দিলেন না, একগাদা পোলাপানের মাঝখানে চিৎকার করে বললেন, 'বেরোও। বেরিয়ে যা, চোর কোথাকার। বড়দের দিকে হাত বাড়াস, কিচ্ছু বলি না। শ্যাষে ছোটদের খাদ্যে হাত! অ্যাঁ, এ-ও সইতে অইব। বেরো নইলে আমি অ্যাক্কুনি পুলিশ ডাকুম।' আর দাঁড়ায়। বাপ রে,গলা কী, গলা শুনলা আমি তো আমি,থানার বড়বাবু পর্যন্ত কাঁইপ্পা যাইব, উঃ, গলা বটে একখান! বলো তুমি অমুদা, এরকম কইরা অপমান করা কী ওঁর মতো মানষের উচিত হইছে! উনি তো কাছে ডাইক্যা বলতেই পারতেন, চাকা ভাইটি, চাউমিন খাইবার ইচ্ছা হইসে তো লইয়া যা আমার প্যাকেটখান, বাচ্চাদের প্যাকেট বাচ্চাদের খাইতে দিতে হয়—এটা মনে রাখিস, তারপর যদি নিজের প্যাকেটখান আমারে দিতেন, তাইলে দিদিমণি কোথায় উঠতেন তুমি একবার ভাবো অমুদা! উনি কী সশরীরে স্বর্গে যাইতেন না? উনি কী জীবন্ত দেবী হইতেন না? না, তার বদলে, ছিঃ ছিঃ, অ্যাও তোমারে বইল্যা দিতেছি আমি কেসটা ছাড়ুম না। এ যে প্রেস্টিজ লইয়া টানাটানি! চাকা সব পারে, পারে না প্রেস্টিজ লইয়া ছিনিমিনি খ্যালতে।'

"বাপরে বাপ," আমি চায়ের কাপের শেষ তলানিটুকু গলায় ঢেলে হাসলাম, বললাম, "সত্যিই স্যামপেল একখানি।"

"আরও শুনুন।" অমল বলল, "এখন তো আসল গল্পটাই বলিনি। শুনুন। এই নিন বালিশটা। হাতটা হেলান দিয়ে রাখুন। একটু আরাম পাবেন। শুনুন, পাণ্ডুয়ার মেলা তো আপনি জানেন। কী সাঙ্ঘাতিক জমজমাট মেলা। ওই দিকেই যাচ্ছি, পথে একটা মন্দির। হঠাৎ কানে গেল মন্দিরের ভেতর থেকে একসঙ্গে বিকট সব চিৎকার উঠছে। এক-একটা এমন আচমকা আওয়াজ যে, তা শুনে রাস্তার কুকুরগুলো চৌ-চৌ করে ছুটছে। উঁকি মেরে দেখি নাটমন্দিরের নীচে খোলা জায়গায় একদঙ্গল ছেলে ঢিলে পোশাক পরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ে বিকট-বিকট চিৎকার করছে, এমন চিৎকার যে পিলে চমকে যায়। বুঝলাম ক্যারাটে প্র্যাকটিস হচ্ছে। হঠাৎই চোখে পড়ে গেল। চোখে পড়াই স্বাভাবিক। সকলের গায়ে জামা, কেবল একজনের খালি গা, কাজেই নজরে পড়বেই, তাকিয়ে দেখতেই দেখি চাকা ওদের মতোই হাত-পা ছুঁড়ছে। ওদের মতোই আওয়াজ ছাড়ছে। কী জানি, এখানে ও এল কেন? এবার আবার কোন ধান্দা? ওকে ইশারা করলাম। ও ক্যারাটে-মাস্টারকে বলে বাইরে এল আমার কাছে। আমি কিছু বলার আগেই ও থমথমে মুখে বলল, 'একটা শিক্ষা দিব পেধানেরে। দিন এমন যাইব না। বদমাশটা আমার চরিত্র হনন করসে। আমাগোরও দিন আইব। বডিটা একটু তৈরি কইরা লই। ক্যারাটে-মাস্টার হাতটা কাটারি কইরা পর-পর

দশখান টালি এক কোপে ফাটাইয়া দিল। এই রকম একখানি হাত করতে অইব। তারপর দিন আইলে পেধানেরে দেইখ্যা লমু। দেইখ্যা লমু কার হাতে কত পাঞ্চ।'

'"এবার একেবারে পেধানের মুখোমুখি ? বাপ রে ! ব্যাপারটা কী হয়েছিল ?'

"আগের চেয়ে মুখ থমথমে আর গম্ভীর করে চাকা বলল, 'পেধান পঞ্চজনের পরামর্শ শুইন্যা আমার মাথা কামাইয়া ঘোল ঢাইল্যা, গলায় জুতার মালা ঝুলাইয়া দিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইল। তার আগে ঢোল সহরত কইরা লোক জড়ো করাইসে। আমার পিছুপিছু অরা তালি বাজাইতে বাজাইতে চলল। এরপরও কী অমুদা তুমি আমারে বাঁইচ্যা থাকতে বলো ?' চাকার চক্ষু ছলছল করে উঠল। এদিকে আমার তো দেখি হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল। অতিকষ্টে হাসি দমন করে বললাম, 'তা তোর অপরাধ ?'

"'অপরাধ ধরলে অপরাধ, নইলে অপরাধ না। আমি হক্কলের গোরু কি চিনা রাখসি নাকি ? আমি কী কইরা জানব যেটারে পাউণ্ডুলে দিছি দুই টাকা কামাই করবার লগে, সেটা পেধানের গোরু ? সব গোরুই তো একই রকম দ্যাখতে। আর এই কাম আমি এই পেরথম করছি নাকি এ তল্লাটে ? কুনোদিন কিছু হয় নাই, ফস কইরা কী হইতে কী হইয়া গেল।'

"'এ ছাড়া আর কোন অপরাধ ?'

"'আছে, থাকবে না ক্যান ? পেধান টং হইয়া আছিল, গোদের উপর বিষফোঁড়া—সবাই অ্যাত-অ্যাত আমার নামে মিছা কথা লাগাইয়া পেধানের কান ভারী করল, সবাই বলল, পেধান চাকার একটা বিধান করুন। তা না অইলে আপনের মান থাকে না। অ্যাত যে কাণ্ড হইসে তলে-তলে এর বিন্দুবিসর্গ আমি জানতাম না। আমি শিবুরাই গেছি, একটা বড় কাম ছিল, তো এখানে আসতেই আমার শাগরেদ প্যাঁচা আমারে জানায়, যা তুই পেধানের কাছে। পেধান তরে খুঁজছে। প্যাঁচা তখনও যদি বলত, যে গোরুটা তুই পাউণ্ডুলে দিছ হেইটা পেধানের গোরু, তাইলে কি আমি সাধ কইরা পেধানের কাছে যাই ? প্যাঁচার কথা শুইন্যা আমি পেধানের কাছে গেলাম, বললাম, 'ছার, আপনে আমারে খুঁজছেন ? আমি ছিলাম না এখানে।' পেধান হাইস্যা বলল, 'তা জানি। তুমি ছিলা শিবুরাই। এইমাত্র আমার কাছে খবর আসছে ওখানে অনন্তবাবুদের পুকুরের সব মাছ ফাঁক হইয়া গেছে গিয়া। আসো, এখানে আসো। আসো না ?' পেধান আমারে ডাকল। আমি ভয়ে-ভয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে একটু আউগ্গাইয়া গ্যালাম। পেধান মিষ্টি কইরা হাইস্যা বলল, 'আসো, কাছে আসো।' আমি আর-একটু আউগ্গাইয়া গ্যালাম। পেধান আসো-আসো করে, আমিও একটু-একটু আউগ্গাইয়া যাই। এই কইরা-কইরা যখন পেধানের এক্কেরে নাগালের মধ্যে গেছি, পেধান হঠাৎ আমারে মাটিতে চিত কইরা ফ্যালাইল। বলল, 'আমার গোরু পাউণ্ডুলে পাঠাইছ, এবার তরে মানষের পাউণ্ডুলে অর্থাৎ জেলে পাঠামু, তবে না আমার নাম অবলাকান্ত হালদার !'

"'তারপর ?'

"'তার পর আর কী। আমার ষোলোকলা পূর্ণ অইল। গোটা পাণ্ডুয়ার তামাম লুক মজা দ্যাখতে এক্কেরে ভাইঙ্গা পড়ল। জিনিসটা তো খুবই উপভোগ্য, বিশেষ অন্যের বেলা যদি হয়। পয়সা লাগে না, টাকা লাগে না, এমন মজা মানুষ ক'টা পায় ? আমার ন্যাড়া মাথায় যখন মনা নিজে গিয়া ঘোল ঢালল তখন পাবলিক 'হরি হরি' বইল্যা উঠল। তারপর তো অরা গাধায় চাপাইয়া দিল। কী একখান্ দৃশ্য। আমার মাথায় ঘোল, আমি চাপছি গাধার পিঠে, গলায় জুতার মালা—আমার পিছু-পিছু জনা পঞ্চাশ লুক তালি বাজাইতে-বাজাইতে চলছে বড় রাস্তার উপর দিয়া ! তবু এও বলছি অমুদা, দিন একভাবে যাইব না। দিন বদল অইবই। পেধান আর ভদ্দরলুকেরা জুইট্যা আমার চরিত্র হনন করছে। চরিত্রে কলঙ্ক দিসে। মজা ট্যার পাওয়াইব।' আমি হেসে বললাম, 'ও কিছু না। জীবনে এরকম অনেক কিছু হয়। আরে, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। চাঁদ কি কলঙ্ককে ডরায় ?'

"'এই, এতক্ষণে একটা হক কথা কইলা। আমি চাঁদ, কলঙ্ক আমার কী করবা ? ঠিক, খুব ঠিক। তবু আমি অদের ছাড়ুম না। অদের কথা মনে জাগলেই লহু গরম হইয়া ওঠে। শ্যাষম্যাস কোথাকার জল যে কোথায় গড়াইব···'

"ইতিমধ্যে কঁদিন কলকাতায় থাকতে হয়েছিল—এসেই টুপুনের মুখে শুনলাম চাকা সাধু হয়ে গেছে। ও চুরি ছেড়ে দিয়েছে। টুপুন বাচ্চা ছেলে—ও কী করে জানল ? আমি বাড়িতেই শুনলাম, কথাটা একেবারেই ঠিক। চোর ছিল চোর ছিল—সে একরকম। হঠাৎ সাধু হয়ে আবার নতুন কী ফ্যাসাদ করে কে জানে ! চুরি ছেড়ে হাতে চাকু নিয়ে মস্তানি লাইনে যদি চলে যেত সে একরকম—কিন্তু এ যে একেবারে সাধু, সম্পূর্ণ ভিন্ন লাইন ! না, কেসটা স্টাডি করতে হচ্ছে। বেশিদিন দেরি করতে হল না। এইরকমই এক দুপুরে হঠাৎ ছাঁচতলা থেকে চাঁছাছোলা গলায় হুঙ্কার উঠল—'বাবা, বুড়াশিবের সেবা লাগে, মহাদেব !' এর যে কী অর্থ জানি না, পায়ে পাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি অনেকটা ঠিক গাজুনে সন্ন্যাসীর মতো, মাথায় জটা, সারা গায়ে ভস্ম-ছাই, হাতে চিমটে, হাতে-গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে রক্তাম্বর আর মুখে মিটি-মিটি খুবই পরিচিত হাসি। চেনা, খুবই চেনা মনে হচ্ছে হাসিটা কিন্তু ভস্ম, রক্তাম্বর, চিমটে, জটা, চেহারাটাকে যেন অচেনা করে দিয়েছে। আমার অবস্থা দেখে সাধক বলে উঠল, 'কী গো অমুদা, চাকা'রে চিনলা না ? ব্যোম-ব্যোমশঙ্কর, চাকা আর সে চাকা নাই। এক্কেরে সাধু, চুরি লাইন, বড় বুরা লাইন। আপন গড় কইত্যাছি।'

"চমৎকৃত হয়ে বললাম, 'চাকা, তুই ! এ যে ভাবাই যায় না। তা তোর চলছে কীসে ?'

"'পাঁচজনার আশীব্বাদে।'

"'সে তো আগেও তাই ছিল।'

"চাকা আমার ঠাট্টায় আমল দিল না। প্রকৃত সাধকের মতোই উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'আমি সন্ন্যাসী, সাধন-ভজন লইয়া থাকি। ভিক্ মাইগ্যা খাই। অহো, কী সুখ এ লাইনে ! কত সুখ ! তুমিও আইলে পারো অমুদা। ওসব বিষয়-আশয় ছাইড়্যা দাও। একবার প্রাণ ভইরা ডাকো, হরি হরি, হরি হরি। এ-লাইনটা আমার মনে খুব ধরসে। সবাই খাতির করে, ঘরে-ঘরে ভক্তি। চালটা, আটাটা, কলা-মুলাটা, কী পাওয়া যায় না ? পেটের একটা গতি হইছে অ্যাত দিনে, আর কী চাই ? কখনও হরি, কখনও শম্ভু, কখনও মা-কালী—এই লইয়াই আছি।'

"আমি কিছু না বলে জেব থেকে দুটো টাকা বার করে ওর হাতে দিতে গেলাম। চাকা 'উঁহু, উঁহু' করে উঠল, বলল, 'সাধন-ভজনের কী মহিমা ! এই দ্যাখো, ভাল কইরা দ্যাখো—আমার হাতের তালুটা, আঙুলগুলান্ ঠুকরাইয়া গেছে না ! হরি, হরি, হরি—আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেছি গিয়া, আর আমারে পায় কে ! আমি পেধানেরে, থানার বড়বাবুরে আমার শিষ্য করুম। অমুদা, তোমার নোট তুমি লও। শুধু মুঠা দুই চাউল দাও, বাস !'

"এর দিন-দশেক পর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এক দঙ্গল সাধু এসে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে চড়াও হল। ওদের মধ্যে একজন হিন্দিতে বাংলা মিশিয়ে বলল, 'শুনলাম বাবুজি আপনার সঙ্গে চক্র

শয়তানের খুব দোস্তি আছে। তার পাত্তা মিলছে না বাবুজি। উ ভেগেছে। উর সাথ-সাথ হামাদের লোটা-চিমটা, বাসন-কোশন, বাবা মহারাজের বারোটা কিমতি আংটি, গায়ে দিবার কিমতি শাল—সব ভাগলবা। উ সাধু নহি আছে বাবুজি, সিরেফ ডাকু। হামাদের গিদধড় বানিয়ে দিয়েছে। আখুন এর একটা বিহিত করুন।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এই সব করেছে ? তা চক্রজি বলে তো কাউকে চিনি না। চাকাকে চিনি। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার দোস্তি ঠিক নয়, ও খুব আমার জানপহচান আদমি।'

"'হাঁ, ওহি, যাঁহা চক্র তাঁহা চাকা। উ চাকা সন্ন্যাসী হইতে আসল। তো গুরুজি, হামাদের বাবা মহারাজ উহাকে মন্ত্র দিল। ক'দিন খুব সাধন-ভজন করল। বিভূতি ভি দরশন করল। প্রমথ হইয়ে খুব নাচন-কোদন করল। হামাদের ভি টেক্কা দিল। খুব বড়া সাধু হইল। তারপর তো এহি বেপার। তো বোলেন, কী করি ?'

"বুঝুন লালুদা, আমার অবস্থাটা একবার বোঝার চেষ্টা করুন। কুলুকুল করে হাসি উঠে আসছে ঠোঁটে, অথচ ওদের দুরবস্থায় হাসতেও পারছি না। কী আর বলি, তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ওদের বললাম, 'তোমরা থানার বড়বাবুকে গিয়ে ধরো। দ্যাখো যদি বিহিত হয়। ওর হদিস জানতে গেলে তো আমাকেও চোর হতে হয়। সে আমি পারব না। আমি চোর হতে কিছুতেই পারব না।'

"কুড়ি-পঁচিশ দিন পর ঘরে শুয়ে বই পড়ছি, চাকা এসে নিঃশব্দে হাজির। ওকে দেখে অবাক হয়ে বললাম, 'কী রে ! তুই যে বড় ? তোর তো এখন জেলে থাকার কথা ?'

"ও বলল, 'জেল ? আমারে জেল দিবা কেডা ? যে আমারে জেলে পাঠাইব সে এখনও মায়ের পেটে, বুঝলা ? অরা আমার নামে বড়বাবুকে বলল। বড়বাবু তো আমার পাত্তা জানে। বড়বাবু ঠিক গিয়া কুলতলির বস্তি থিকে চুলের মুঠি ধইরা আমারে পাকড়াইল। আমি তখন বড়বাবুরে বললাম, 'ছাহেব, আমি চোর বটে। তবে আমার চেয়েও বড় চোর আছে। তারে ছাইড়্যা গরিব আমি, আমারে টানাটানি করবেন ? আপনি যদি এ-যাত্রা আমারে রক্ষা করেন তাইলে আপনার যাতে প্রমোশন হয় আমি দেখুম।'

"'কাণ্ড !' বড়বাবু রাইগ্যা আমার পিঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিয়া বললেন, 'আরে, আরে, আরে ! আমারে তুমি প্রমোশন দিবা ? রও, তোমারে কড়িকাঠে ঝোলাইয়া কম্বল-ধোলাই দিমু।'

"'আমি কম্বল ধোলাই-এর নাম শুইনাও ঘাবড়াই নাই। ওনারে বিনয় কইরা বললাম, 'ছাহেব, আরে রাখেন আপনের কম্বল-ধোলাই। আপনি হেরোইন-টেরোইন সব উলটাপালটা জিনিসের খবর রাখেন ? ওদের লগে পাইবেন।'—কথাটা বলতেই বড়বাবুর চক্ষু দুটি গোল গোল হইয়া গেল। বড়বাবু বললেন,'সত্যি রে চাকা, যা বলছিস তা সত্যি ! তুই জানস্ ?'

"'জানি মানে ? খুব জানি। চলেন আমার সঙ্গে, আমি দেখাইয়া দিমু। আসল কথা কী জানেন ছাহেব, এইসব কইর‍্যা যারা দ্যাশের যুবসমাজের সব্বোনাশ করত্যাসে চাকা বাঁইচ্যা থাকতে তাদের ছাড়ন নাই। এই আপনারে সাফ কথা বইল্যা দিলাম।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম,'আপনি আমারে ছাইড়্যা দিবেন তো !'বড়বাবু তৎক্ষণাৎ রাজি।

"'অরা আমারে জেলে পুরতা গিছিল, এখন উলটে আমিই ওগো জেলে পুরলাম, কেমন কিনা ! চাকা এমনিতে খুব ভাল অমুদা, কিন্তু দ্যাশের যুবসমাজের তলে-তলে যে ক্ষতি করবা চাকা তার যুম।' চাকার মুখে চাকার এই বৃত্তান্ত শুনে আমি বললাম,'ভ্যালা রে চাকা, তুই বাঁইচ্যা থাক চিরকাল।'"

ছবি : দেবাশিস দেব

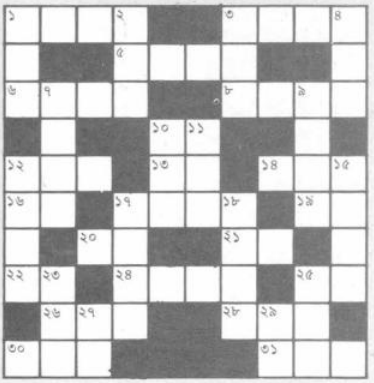

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যে-যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়বার্তা নিয়ে এক সৈনিক দীর্ঘপথ দৌড়েছিলেন। (৩) বৃষ্টির সুরেলা শব্দ। (৫) রবার্ট ব্রুস যার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। (৬) হল্যান্ডের অধিবাসী। (৮) নিষ্কর। (১০) পাখি। (১২) রক্তনীল। (১৩) স্কুল-কলেজের ছুটিকে আর কী বলে ? (১৪) বিধি, ব্যবস্থা। (১৬) আরম্ভ। (১৭) আয়না। (১৯) জল। (২০) এর মানেও জল। (২১) '——র অপর নাম জাহ্নবী।' (২২) নির্যাস। (২৪) যে-মাসে হিন্দু ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ। (২৫) চিঠিপত্রের শেষে টানা হয়। (২৬) অনুসন্ধান। (২৮) ইঙ্গিত। (৩০) দক্ষিণবঙ্গের এক নদী। (৩১) দেবতাকে কিছু দেবার সংকল্প।

উপর-নীচ : (১) দীর্ঘপুচ্ছ বিদেশী টিয়া। (২) ইসলামি উপাসনা। (৩) অশ্বশালা। (৪) মস্তিষ্ক। (৭) হালকা ও ভারী। (৯) যেখান থেকে রাজ্য শাসন করা হয়। (১০) সকালে চাই টাটকা, তাজা। (১১) হলুদ রঙের মৌলিক পদার্থবিশেষ। (১২) অগুনতি। (১৫) রাজা। (১৭) ভাগ্যবান, সুলক্ষণযুক্ত। (১৮) উপযুক্ত। (২৩) সব সময়। (২৫) আগে নাম ছিল পারস্য। (২৭) পিণ্ড। (২৯) বাতি, চেরাগ।

গত সংখ্যার সমাধান

দা	মো	দ	র	■	উ	ট	কো	■	আ
ন	■	র	ত্ন	দী	প	■	ক	দ	ম
ব	র	দা	■	প	ল	ট	ন	■	দ
■	■	লা	■	শ	■	■	দ	র্দু	র
আ	জা	ন	■	লা	ল	সা	■	■	বা
কা	■	■	আ	কা	ট	■	দ	স্তু	র
শ	শ	ক	■	■	ব	■	ল	■	■
কু	■	শে	র	শা	হ	■	মা	স্তু	ল
সু	মে	রু	■	প	র	মা	দ	■	টা
ম	■	কা	জ	লা	■	নী	ল	গি	রি

রঞ্জন

লুই পাস্তুর-এর বাবা কাজ করতেন একটি চামড়া তৈরির কারখানায়। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বাড়ি এসে যখন তিনি ছোট্ট লুইকে আদর করতেন তখন তাঁর একটি কথাই মনে হত—ছেলেকে যেন তাঁর মতো কষ্ট করে বেঁচে থাকতে না হয়। তাই তিনি লুইকে প্রায়ই বলতেন, "ভাল করে লেখাপড়া করিস। স্কুল-কলেজে পড়াতে পারলে রোজগারও হবে, সম্মানও বাড়বে। তা না হলে বাবার মতো সারাজীবন একজন সাধারণ লোক হয়েই কাটাতে হবে।" লুইয়ের মা-ও চেষ্টা করতেন যাতে সংসারের খরচ কমিয়ে লুই-এর লেখাপড়ার জন্য টাকা জমানো যায়।

এইসব কথার গুরুত্ব বোঝার বয়স লুইয়ের তখনও হয়নি। তাই লেখাপড়ায় তার খুব একটা মন বসত না। সারাদিন ছুটোছুটি আর খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কেবলমাত্র দুটি ব্যাপারে ধৈর্য ধরে চুপচাপ বসে থাকতে পারতেন। লুই একটি হল মাছ ধরা আর অন্যটি ছবি আঁকা। স্কুলে যেতে একেবারেই আগ্রহ ছিল না। অনেকদিন স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে লুই গোপনে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসতেন। গাছের ওপর আগে থেকেই লুকনো থাকত বঁড়শি আর ছিপ। যেদিন স্কুলে না গেলেই নয়, সেদিন ক্লাসে বসে ছবি আঁকতেন।

একদিন ক্লাসে বসে ছবি আঁকতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন লুই। কিন্তু যে শিক্ষক তাঁকে ধরলেন, তিনি ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীল। লুইয়ের ছবি দেখে বকুনি দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়, লুইয়ের বাবাকে ডেকে বললেন, "লুইকে কোনও আর্ট-স্কুলে ভর্তি করে দিন। ওর আঁকার হাত যা দেখেছি, তাতে ও বড় হলে খুব ভাল শিল্পী হতে পারবে।"

এ-কথা শুনে লুইয়ের বাবা বেশ খুশি হলেও লুইকে ছবি আঁকা শেখানোর ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখালেন না। লুইয়ের বয়স তখন তেরো। সত্যিই যদি তখন লুই আর্ট-স্কুলে ভর্তি হতেন, তা হলে হয়তো আমরা লুই পাস্তুরকে বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে পেতাম। কারণ ভবিষ্যতে লুই পাস্তুর এমন সব বিজ্ঞান-বিষয়ক ছবি এঁকেছেন, যা দেখে তাঁর সহজাত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এর বছর-দুয়েক পরে হঠাৎ লুইয়ের আগ্রহ পড়াশোনার দিকে মোড় নেয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর বাবা-মা তাঁকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম

জলাতঙ্ক রোগমুক্ত প্রথম শিশুটি, তার মা ও পাস্তুরকে নিয়ে সেই বিখ্যাত কার্টুন

করছেন। পড়তে-পড়তে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কৌতূহল বেড়েই চলল। বিশেষত বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত বেড়ে গেল যে, কোনও বিজ্ঞানের বই পেলে তিনি সম্পূর্ণ শেষ না করে ছাড়তেন না।

যে ছেলে ছেলেবেলায় স্কুলেই যেতে চাইতেন না, তিনিই ক্লাসে প্রথম হতে লাগলেন। শিক্ষকদের তিনি এমন সব প্রশ্ন করতেন যার উত্তর দিতে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হত। শিক্ষকরা সবাই বলাবলি করতেন যে, এ ছেলে খুবই চিন্তাশীল।

লুইও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা আরও বাড়িয়ে দিলেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তিনি চতুর্দশ স্থান অধিকার করলেন। কিন্তু এতে তাঁর মন ভরল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যাতে আরও ভাল ফল করা যায় তার জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। কিন্তু সংসারের অবস্থা তো সচ্ছল নয়। তাই সামান্য একটি চাকরি না নিয়ে পারলেন না। কিন্তু এর ফলে তাঁর পড়াশোনায় বিন্দুমাত্র ক্ষতি হল না। কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বই-খাতা টেনে নিতেন। গভীর রাত পর্যন্ত চলত তাঁর লেখাপড়া। অবশেষে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ আর পরিশ্রমের ফল ফলল হাতেনাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি অধিকার করলেন চতুর্থ স্থান।

এর পর তিনি ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলেন 'লেকচারার' পদের জন্য। কিন্তু আবেদনপত্র দেখে ও ইন্টারভিউ করে নির্বাচকরা এর চেয়ে উঁচু পদে বসাবার জন্য তাঁকে মনোনীত করলেন। পদটি হল রসায়নবিজ্ঞানের 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর'। আর্থিক অনটনও বেশ কিছুটা কমল। এবার আর কোনও পিছুটান রইল না। গবেষণার কাজে ডুবে গেলেন।

১৮২২ সালে তাঁর জন্ম আর ১৮৫৪ সালে তিনি পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'ডিন অব সায়েন্স'। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩২ বছর। তাঁর বেশিরভাগ স্মরণীয় আবিষ্কারই ঘটেছে এর পর।

ভিনিগার, তালের রস ইত্যাদি কয়েকটি তরল কয়েকদিন ফেলে রাখলে দেখা যায় গাঁজলা উঠছে আর তরলের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে। তখন মনে করা হত এটি স্বতস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয়। আর-একটা ধারণা বিজ্ঞানীদের কাছেও বদ্ধমূল হয়েছিল। তা হল, জীব ছাড়াই জীবের জন্ম সম্ভব। ১৮৫৭ সালে পাস্তুর প্রমাণ করলেন, স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক পরিবর্তন কখনও সম্ভব নয়, আর জীব ছাড়া জীবের জন্ম অসম্ভব। এটি প্রমাণ করতে গিয়ে পাস্তুর আবিষ্কার করলেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুর অস্তিত্ব (মাইক্রো অরগানিজম), যা আগে কখনও ভাবাই যেত না। এই জীবাণুগুলোর জন্যই ভিনিগার বা তালের রসে গাঁজলা ওঠে। শুধু

তাই নয়, এই জীবাণুগুলির সাহায্যেই সংক্রামক ব্যাধি একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তাও তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। জীবাণুর ধারণাই তখন একেবারে নতুন, তাই অন্য বিজ্ঞানীরাও পাস্তুরের তত্ত্বকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন।

উপযুক্ত প্রমাণের সুযোগ এসে গেল ১৮৬৫ সালে। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে তখন প্রচুর গুটিপোকার চাষ হত। প্রত্যেক চাষির খামারে বড়-বড় তাকওলা আলমারি থাকত, আর সেই তাকগুলিতে ছড়িয়ে রাখা হত কপির পাতা, যা খেয়ে গুটিপোকাগুলি বেঁচে থাকত। হঠাৎ সেই গুটিপোকায় লাগল মড়ক। খামারের পর খামার উজাড় হয়ে যেতে লাগল। চাষিদের মাথায় হাত পড়ে গেল। ফ্রান্সের রেশম-শিল্প দারুণভাবে মার খেতে শুরু করল। স্পেন আর ইতালি থেকে স্বাস্থ্যবান গুটিপোকা আমদানি হল, কিন্তু খামারে বহু যত্ন সত্ত্বেও তারা এক-এক করে মরে যেতে লাগল। সাধারণ লোক বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, এ নিশ্চয়ই অপদেবতার কাণ্ড।

লুই পাস্তুরের মনেও সন্দেহ জেগেছিল যে, এই মড়ক কোনও অদৃশ্য শক্তির কাজ। কিন্তু সে-শক্তি অপদেবতা নয়, আপাত-অদৃশ্য জীবাণু। তাই তিনি ছুটে গেলেন সেখানে। নির্জীব গুটিপোকাগুলিকে মাইক্রোস্কোপ-এর নীচে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, সজীব গুটিপোকার সঙ্গে নির্জীব গুটিপোকার তফাত একটি বিষয়ে। নির্জীব গুটিপোকার গায়ে খুব ছোট-ছোট সাদা রঙের কী যেন রয়েছে, যা সজীব গুটিপোকার গায়ে নেই। তিনি বুঝলেন, এই সাদা পদার্থগুলি আসলে এক-একটি জীবাণু, যা গুটিপোকার শরীরের ভেতর গিয়ে তাকে অসুস্থ করে দেয়। একটি অসুস্থ গুটিপোকা যখন কপির পাতার ওপর হামাগুড়ি দেয় তখন জীবাণুগুলি পাতায় লেগে যায়। সুস্থ গুটিপোকা যখন সেই পাতাগুলি খেতে শুরু করে তখন তাদের শরীরে জীবাণুগুলি ঢুকে যায়।

বহু পরিশ্রমের পর তিনি সুস্থ গুটিপোকাগুলিকে আলাদা করে রাখলেন আর অসুস্থ গুটিপোকা এবং কপির পাতাগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। যে খামারে গিয়ে পাস্তুর এইভাবে আলাদা করে দিতে লাগলেন, সেই খামারে আর রোগের উপদ্রব রইল না। এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে ফ্রান্স থেকে মড়ক নির্মূল করা হল। দেশবাসী ধন্য ধন্য করে উঠল।

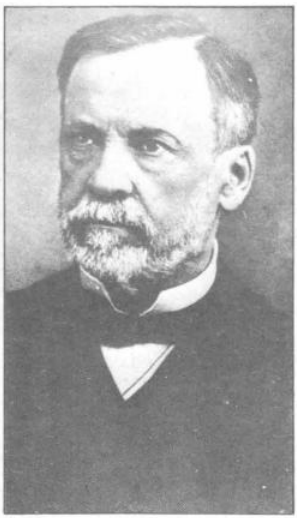

লুই পাস্তুর

লুই পাস্তুর

অরবিন্দ পাল

এডওয়ার্ড জেনার মানুষের শরীরে গো-বসন্তের পুঁজ ঢুকিয়ে জল-বসন্তের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু কেন ও কীভাবে এই প্রতিষেধক কাজ করে তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। কারণ, জীবাণুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। পাস্তুরের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জীববিজ্ঞানে একটি নতুন তত্ত্বের জন্ম হল।

পাস্তুর মনে করতেন যে, এই তত্ত্ব শুধু বসন্ত রোগের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য রোগের ক্ষেত্রেও কাজে লাগতে পারে। 'ভাইরাস' যথাযথভাবে শনাক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবে সূক্ষ্ম জীবাণুকে শক্তিহীন করে দেওয়ার (অ্যাটেনুয়েশন) নানা উপায় তিনি বার করার চেষ্টা করছিলেন, যাতে জেনার-এর মতো শক্তিহীন জীবাণুকে শরীরে ঢুকিয়ে দিলে শক্তিমান জীবাণুরাও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। প্রথমেই তিনি মানুষের ওপর পরীক্ষা করতেন না। ইঁদুর, খরগোশ, কুকুর ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিতেন।

তখনও জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। পাগলা কুকুর কামড়ালে মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মারা যেত। এই অসহনীয় দৃশ্য শুধু দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। পাস্তুরের রোখ চেপে গেল, এর প্রতিকারের জন্য তিনি কিছু একটা করবেনই। পাগলা কুকুরের কামড়ে মৃত খরগোশের মেরুদণ্ডে তিনি খুঁজে পেলেন একরকম জীবাণু। সেই মেরুদণ্ডকে শুকনো এবং অল্প গরম বাতাসের ভেতর কয়েকদিন ফেলে রাখলে জীবাণুগুলি মরত না, কিন্তু নির্জীব হয়ে পড়ত। এই নির্জীব জীবাণুগুলিকে তিনি সুস্থ ইঁদুর, খরগোশ আর কুকুরের শরীরে ঢুকিয়ে দেখলেন যে, হাজার পাগলা কুকুর কামড়ালেও সেই ইঁদুর, খরগোশ আর সুস্থ কুকুরগুলির জলাতঙ্ক হচ্ছে না।

গবেষণাটি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সারা দেশে হইচই পড়ে গেল। পাগলা কুকুরে কামড়ানো ছোট্ট একটি সাত বছরের শিশুকে নিয়ে তার মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন পাস্তুরের কাছে। পাস্তুরও আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি জানতেন পাগলা কুকুর কামড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখা দেয় না, কারণ জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু আহত ব্যক্তির মেরুদণ্ডে পৌঁছতে কয়েকদিন সময় নেয়। তাই পাস্তুর শিশুটির শরীরে শক্তিহীন জীবাণুর দ্রবণ ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তটি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। ১৮৮৯ সালের ২০ জুলাই লন্ডনের 'পান্চ' পত্রিকায় এই নিয়ে একটি কার্টুন আঁকা হল, যাকে বলা যায় পাস্তুরের প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ছোট শিশুটি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল কি না তা বোধ হয় আর বলে দিতে হবে না। এর পর থেকে ১৮৯৫ সালে পাস্তুরের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর বাড়ির সামনে লম্বা লাইন লেগেই থাকত। পাস্তুর এদের প্রত্যেকের চিকিৎসা করতেন তাঁর আবিষ্কৃত প্রতিষেধক দিয়ে। ক্রমশ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ডিগ্রি তো দূরের কথা, প্রাথমিক পাঠও তিনি কখনও নেননি। ১৮৭৩ সালে 'ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অব মেডিসিন' পাস্তুরকে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে। এই প্রথম এই সম্মান অর্জন করলেন এমন একজন, যিনি ডিগ্রিধারী চিকিৎসক নন।

মিল্ক বিকিস-এর স্নেহ পেলে ভবিষ্যৎ হয় ঝলমলে

ব্রিটানিয়া মিল্ক বিকিস
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী

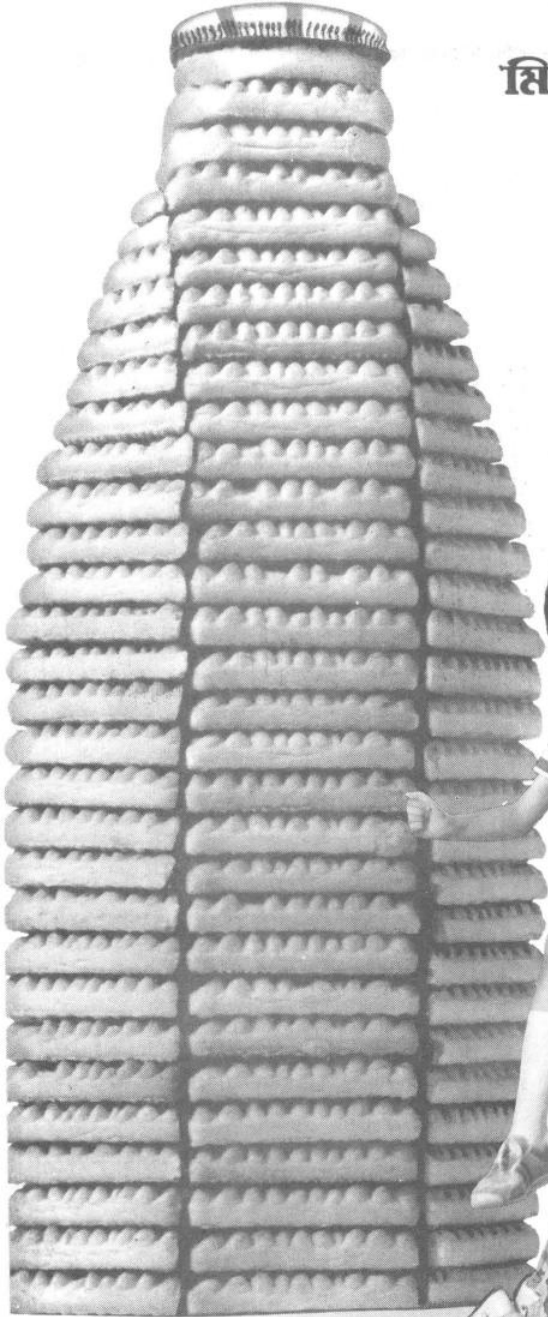

ব্রিটানিয়া

বিশ্বকাপ ফুটবল : ইতালিতে এশিয়ার কোন দু'টি দেশ খেলবে

তরুণ রায়

বিশ্বকাপ ফুটবলে এশিয়ার দেশগুলি শক্তিশালী ইউরোপিয়ান ও লাতিন আমেরিকান দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনওদিনই খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। ১৯৬৬ সালে অবশ্য, উত্তর কোরিয়া ইংল্যান্ডে দারুণ ফুটবল খেলেছিল। আগেরবারের মেক্সিকো বিশ্বকাপে এশিয়া থেকে ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পায় ইরাক এবং দক্ষিণ কোরিয়া। কোরীয় দলটি প্রাণবন্ত ফুটবল খেলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দলকে গ্রুপ লিগে তারা বেশ শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলেছিল। দক্ষিণ কোরিয়া খেলেছিল দুর্দান্ত ফুটবল। কিন্তু গ্রুপ লিগের তিনটি খেলাতেই ইরাক পরাজিত হয়।

আগামী বছর ইতালিতে এশিয়ার কোন দুটি দেশ বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবে ? এখন পর্যন্ত যা অবস্থা, তাতে দক্ষিণ কোরিয়া গ্রুপ লিগে সবচেয়ে ভাল খেলেছে এবং অঘটন যদি পরবর্তী সময়ে না ঘটে তবে দ্বিতীয়বারের জন্য তারা মূলপর্বে খেলছেই। ভাল অবস্থায় রয়েছে সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ইউনাইটেড আরব এমিরেটস)। চিন, ইরান, উত্তর কোরিয়াও মূলপর্বে যাওয়ার দাবিদার হয়ে উঠতে পারে। তবে দুটি মাত্র দেশ ফাইনাল রাউন্ডে খেলবে। তাই আঞ্চলিক মূল পর্বের প্রতিযোগিতা যে তীব্র ও ক্ষুরধার হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গারি দক্ষিণ কোরিয়াকে ৯-০ গোলে হারিয়েছিল, কিন্তু এখন সেদিন নেই। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ফুটবলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের সাহায্যে তারা এশিয়ার সেরা দলে পরিণত হয়েছে। এবারে গ্রুপ লিগে দুর্দান্ত খেলেছে দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপের ছ'টি ম্যাচের মধ্যে প্রত্যেকটি জয় তো বটেই—সবাধিক গোল দেওয়ার কৃতিত্বও তাদের। ছ'টি ম্যাচে পঁচিশটি গোল—আর কোনও গ্রুপে কোনও দল করতে পারেনি। মালয়েশিয়াকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা হলেও প্রথম লিগের খেলায় মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় তারা প্রথম গোল খায়, দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি। দ্বিতীয় লিগেও দক্ষিণ কোরিয়া তিন গোল দেয় মালয়েশিয়াকে।

এক নম্বর গ্রুপের সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফল গতবারের মূলপর্বে যাওয়া ইরাক দলের বিদায়। কাতারের কাছে প্রথম ম্যাচ এক গোলে হারে ইরাক। ফিরতি লেগে ২-২ গোলে ড্র হয় ম্যাচ। প্রবল চাপ সৃষ্টি করেও ইরাক কাতারের কাছ থেকে দু' পয়েন্ট আদায় করে নিতে পারেনি। এর ফলে ছ'টি ম্যাচে ন' পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপের শীর্ষে চলে যায় কাতার। এক পয়েন্ট কম থাকায় ছিটকে যায় ইরাক। এই সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় এবারের বিশ্বকাপে ইরাক দলের ফাইনাল রাউন্ডে খেলার স্বপ্ন।

গত বিশ্বকাপে মারাদোনার আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়া

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে উজ্জীবিত ফুটবল খেলছে সৌদি আরবও। কিছুদিন আগে ষোলো বছরের কমবয়সীদের বিশ্বকাপ জেতার ফলে জাতীয় দলেও যেন তার প্রভাব পড়েছে।

এই গ্রুপে ছিল আর-একটি দেশ সিরিয়া। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানি এবং বুলগারিয়া থেকে কোচ এনে দলকে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা টিকতে পারবে না এরকম ধারণাই করা হয়েছিল। এই ধারণা যে ভুল তা প্রমাণ করতে প্রথম লেগের খেলায় তারা চার গোল দিল সৌদিকে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ধারণাটা যে ভুল নয়, তাও প্রমাণিত হল যখন তারা ওই খেলাতেই পাঁচ গোল হজম করল ! দামাস্কাসে দ্বিতীয় লেগের খেলা ০-০ গোলে অমীমাংসিত রইল। অপর দল উত্তর ইয়েমেন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে না পারায় সৌদি আরবই শেষ পর্যন্ত গ্রুপ শীর্ষে গেল।

তিন নম্বর গ্রুপে ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপের মূলপর্বে যাওয়া কুয়েতকে ছিটকে দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

অপর দুটি গ্রুপ থেকে চিন বা ইরান এবং উত্তর কোরিয়া এশিয়ান গ্রুপ ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কোন দু'টি দেশ শেষ পর্যন্ত ইতালিতে যাবে।

যে দুটি দলই যাক, তারা বিশ্বকাপের মূল পর্বে ভাল খেলবে, এশিয়ার সম্মান বাড়াবে, এটাই আমরা চাইব।

মাঝমাঠের লড়াই

গৌতম সরকার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

সত্তর দশকের ভাগ্যবান যে কয়েকজন ফুটবলার প্রদীপদার সঙ্গে খেলেছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ১৯৬৭ সাল থেকে আমি প্রথম ডিভিশনে খেললেও, সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলাম সত্তর দশকে। তাই সুধীর, পিন্টু, সুভাষ ও স্বপনের মতো আমিও সত্তরের ফুটবলার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছি।

তবে এই দশকওয়ারি হিসেবটা, পরিচিতিটা আমার বিশেষ পছন্দ নয়। সত্যিকারের ভাল লেখক, শিল্পী, কবি কি কোনও দশকের হন? তা হলে খেলোয়াড়রাই বা হবেন কেন? ভাল ফুটবলার সব সময়ই ভাল, মন্দ ফুটবলার সব সময়ই মন্দ—এরকম বিচারই হওয়া উচিত। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামত।

প্রদীপদার সঙ্গে খেলার কথা বলছিলাম। প্রদীপদা সেই সময় খেলা ছাড়ার মুখে। মাঝেমধ্যে মাঠে নামেন। কিন্তু পি· কে·-র তুলনা পি· কে· নিজেই। খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জি সম্পর্কে কোনও আলোচনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু বলব, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ একজন ফরোয়ার্ডের পাশে নিজে খেলেছি। এটাই আমার গর্ব। সত্যিকারের গর্ব।

আর-একটা ব্যাপারও আছে। প্রথম ডিভিশনে খেলতে এসেই আমার এই সৌভাগ্য হল। খেলাটা রেলের সঙ্গে রাজস্থানের। আমি দ্বিতীয়ার্ধে নামার সুযোগ পেলাম। এবং আমার এমনই 'সৌভাগ্য' যে, প্রদীপদাকে প্রথম বলটা বাড়িয়েই ধমক খেলাম।

আসলে হয়েছিল কী, প্রদীপদার সঙ্গে প্রথম খেলার টেনশনেই হোক, বা হঠাৎ নেমেই হোক, প্রথম পাস বাড়াতে গিয়ে ভুল করে ফেললাম। স্কোয়ার পাস বাড়ালাম প্রদীপদাকে, পেয়ে গেল রাজস্থানের খেলোয়াড়। প্রচণ্ড খেপে গেলেন প্রদীপদা। এগিয়ে এসে ধমকে বললেন, "ঠিকমতো পাস বাড়াতে শেখোনি?" আমার ঘাবড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছি নিজেকে। কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে রইলাম। ঠিক করলাম, এর পর থেকে আর একটিও ভুল পাস বাড়াব না, দরকার হলে পাস দেব না, যদি বুঝি প্রদীপদার পায়ে বল ঠেলতে পারছি না, তবে বল নিজের পায়েই রাখব।

সারা খেলায় প্রদীপদাকে আর ভুল পাস দিইনি। প্রদীপদা নিজে দু'টি গোল করলেন। একটি গোল তো অনবদ্য। এখনও চোখের সামনে ভাসছে। প্রদীপদার ভলি ছিল দারুণ। পরের দিন কোনও একটা খবরের কাগজে হেডিং হল, 'সেই পি কে-র দু' গোল'। সেই পি· কে-র সঙ্গে খেললাম আমি।

খেলার শেষে ভয়ে ভয়ে ছিলাম, প্রদীপদা হয়তো এখনও রেগে আছেন। তাই প্রদীপদার কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু প্রদীপদা নিজেই এগিয়ে এলেন, পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, "ভালই খেলেছ।" বুঝলাম প্রদীপদা খুশি হয়েছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমার ভুল পাস বাড়ানোটা ভুলে গিয়েছেন। দোষ করেও ভাল খেলে যে সেই ভুলটা সংশোধন করতে পেরেছি এই আনন্দেই সেদিন বাড়ি ফিরলাম। যাক, প্রদীপদার সঙ্গে খেলার স্মৃতিটা মধুরই রইল।

১৯৬৭ সালে ইস্টার্ন রেল লিগ ছাড়াও বরদলই ট্রোফিতে অংশ নিয়েছিল। আমি আশা করিনি সুযোগ পাব, কেননা প্রদীপদা আর কাজলদা বাদে আর সব নামকরা খেলোয়াড়ই সেই দলে ছিলেন। কাজে ব্যস্ত থাকায় ওঁরা দু'জন যাননি। আশ্চর্যের কথা, সব বড় খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম।

দমদম থেকে রওনা হওয়ার দিন, এয়ারপোর্টে এলেন প্রদীপদা, দলকে বিদায় জানাতে। সবার সঙ্গে কথা বলার পর এলেন আমার কাছে। আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর পর বললেন, "তুমি সবচেয়ে ইয়ং। সুযোগ যখন পেলে তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো।" কথাটা শুনে মনে খুব জোর পেলাম। প্রদীপদা যখন বলছেন নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করব।

বাঘাদা পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, কাজলদা, প্রদীপদা পিঠ চাপড়ে দিলেন—এইসব ঘটনা একটু বিস্তারিতভাবে বলায় অনেকের মনে হতে পারে, আমি বোধ হয় সেন্টিমেন্ট বা আবেগের কথাই বলতে চাইছি। আসলে কিন্তু তা নয়। আমি যখন অখ্যাত, অজ্ঞাত সেই সময় কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি যদি সামান্যও উৎসাহ দেন, তা যে মানসিকভাবে কতখানি সাহায্য করতে পারে, যারা তা পেয়েছে তারাই এর মর্ম বুঝবে। এ শুধু খেলায় নয়, সব ব্যাপারেই। অবশ্য যে খেলতে পারে না, তাকে পিঠ চাপড়ালে কি কিছু হবে? হবে না। কিন্তু যে খেলতে চায়, জানে, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে? তার ক্ষেত্রে সেটা টনিকের কাজ করবে। আমি এই টনিকটা পেয়েছিলাম প্রয়োজনের সময়েই, তাই বুঝতে পারি এর দরকার কতখানি।

বরদলইতে আমি কয়েকটা ম্যাচ খেলেছিলাম। একটা গোলও করেছিলাম। ফিরে এসে শিল্ডে অবশ্য তেমন সুযোগ পাইনি, ড্রেস করেই কাটিয়ে দিলাম।

তবু আমি ১৯৬৮ সালে ইস্টার্ন রেল ছাড়লাম না। অনেক পরিচিতজন বললেন, আমি ঠিক করলাম না। এক বছর রেলে কাটিয়েছি ঠিক আছে, কিন্তু '৬৮তে আমার উচিত অন্য কোনও ছোট দলে সই করা। কেননা সেখানে খেলার সুযোগ অনেক বেশি পাওয়া যাবে। তাঁদের জিজ্ঞাসা ইস্টার্ন রেলে আমি ক'টা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি?

তাঁদের যুক্তি যে ভুল, তা আমি বলব না। তবে আমি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখেছিলাম। ভাবলাম, আমি তো খেলতে আসিনি রেলে, শিখতে এসেছি। আগে শেখা, তারপর খেলা। তাতেও যা সুযোগ পেয়েছি, তাই বা কম কিসে? আমার প্রাথমিক শেখা এখনও অনেক বাকি আছে। খেলা জানলে অনেক ম্যাচ খেলব, কিন্তু একই সঙ্গে বাঘাদা, নিখিল নন্দী, সুশীল ভট্টাচার্য, কাজলদা, প্রদীপদার সান্নিধ্য কি পাব অন্য কোথাও? আর রেলের জিমনাশিয়াম সে-সময় কলকাতায় সেরা, সেখানে শারীরিক অনুশীলন করতে পারছি বাঘাদার

১৯৬৮ সালের জুনিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বাংলা দল : (দাঁড়িয়ে, বাঁ দিক থেকে) এস. সাহা, জি. গুহঠাকুরতা, ডি. কয়াল, আর. দে, পি. কে. দাস (ম্যানেজার), সুশীল ভট্টাচার্য (কোচ), এ. সিংহ, এন. দে, বি. বাসুনিয়া, এ. গাঙ্গুলি, এস. মৈত্র, আর. রাউথ ; (বসে, বাঁ দিক থেকে) এন. দাস, গৌতম সরকার, সমরেশ চৌধুরী, সুভাষ ভৌমিক, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ বসু, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার, সুধীর কর্মকার ও কালুদা

তত্ত্বাবধানে। এই সুযোগ ছাড়লে নিজেরই ক্ষতি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, রেলেই থাকব, বাবা মা-ও আমাকে সমর্থন করলেন।

সে-বছর, '৬৮ সালে ক্লাব-ফুটবলে সেরকম ম্যাচ কিছু খেলতে পারিনি। কিন্তু ডাক পেলাম জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলে, বাংলার ট্রায়াল ক্যাম্পে। প্রকৃতপক্ষে সেটা '৬৭ সালের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ। আলিপুর মাঠে ট্রায়াল ক্যাম্পে পেলাম এমন কিছু ফুটবলারকে, যারা পরবর্তীকালে শুধু বাংলার নয়, ভারতীয় ফুটবলেরই নক্ষত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুধীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরী, স্বপন সেনগুপ্ত, সুভাষ ভৌমিক, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার প্রমুখ।

ট্রায়াল ক্যাম্পেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল সুধীর কর্মকারের। ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারার সুধীর কথা বলে কম, তখনই ও বেশ নাম করেছে, জুনিয়ার হিসেবেই। ট্রায়ালের পর আমি আর ও আলাদা বসে গল্প করতাম। ও বলত কী করে ভাল খেলা যায় সেই কথা।

ট্রায়াল থেকে নির্বাচিত হয়ে আমরা প্রাথমিক রাউন্ডের খেলা খেলতে গেলাম য়োরহাটে। অতি সহজেই ৫, ৬ গোল দিয়ে গ্রুপ লিগে জিতে আমরা ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছলাম জব্বলপুরে। সেখানে প্রবল বাধার সামনে পড়লাম। না, মাঠে নয়, মাঠের বাইরে। সে এক তুমুল বাধা। সে ঘটনার কথা বলি।

যেহেতু আমরা দারুণ খেলে এসেছি প্রিলিমিনারি রাউন্ডে, অন্য রাজ্যের ফুটবলাররা আমাদের ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। বিশেষত দিল্লির ছেলেরা। একদিন আমরা একটা ম্যাচ দেখতে গেছি, অন্য দুটো দলের মধ্যে। দেখতে এসেছিল দিল্লির ছেলেরাও। সুকু (সুকল্যাণ), ভৌমিকের (সুভাষ) যেহেতু চেহারা একটু ভাল ছিল, দিল্লির ছেলেরা হঠাৎই আমাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ, টিটকিরি করতে শুরু করল, "তিন লেড়কা কা বাপ হ্যায়" এই সব বলে। আমরা কিছু উত্তর না দিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম।' যদিও ওদের অধিকাংশেরই চেহারা 'পাঁচ লেড়কা কা বাপ'-এর মতো!

কিন্তু ঘটনা এখানেই থেমে থাকল না। খেলা শেষ হতেই ভৌমিক কী একটা কারণে এগিয়ে গেছিল। হঠাৎ দেখি, দিল্লির ছেলেরা অহেতুক ওকে ঘিরে ধরে মারতে শুরু করেছে। ভৌমিক প্রচণ্ড সাহসী ছেলে। ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। রক্ত গরম হয়ে উঠল আমাদেরও। ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি, সুকু, সুধীর এবং সবাই। ওদের কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল, সামান্য আহত হয়েছিল আমাদের কয়েকজন।

আমরা অবশ্য বিবেকের কাছে পরিষ্কার ছিলাম। জানতাম, কোনও অন্যায় করিনি। অকারণে মার দিলে, আমরা ছেড়ে দেব কেন? এ-ধরনের অন্যায়কে মেনে নেওয়া মানে অন্যায়কে আরও প্রশ্রয় দেওয়া। তা কখনও হতে দেওয়া যায় না।

অবশ্য বিবেক-টিবেক যাই বলি না কেন, ভয়ও পেলাম খুব। কারণ আমাদের ম্যানেজার ছিলেন গ্রিয়ার ক্লাবের হারুদা। তিনি ভীষণ কড়া লোক, ফুটবলারদের ভালবাসেন বটে, কিন্তু শৃঙ্খলার ব্যাপারে দারুণ কঠোর। আমাদের যদি বড় শাস্তি দিয়ে দেন?

তাড়াতাড়ি আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। ভৌমিক আমাদের সবাইকে ডেকে বলল, "হারুদা কিন্তু ভীষণ রেগে যাবেন। আমাদের এখন যেভাবে হোক এখান থেকে জিতে ফিরতে হবে। নইলে বাংলার ভীষণ অপমান হবে। আয়, আমরা সবাই শপথ নিই, যেভাবে হোক ট্রোফি জিতবই।" ভৌমিকের কথায় উজ্জীবিত আমরা সবাই হাত মেলালাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, চ্যাম্পিয়ান হবই। বাংলার মান রাখবই।

হারুদা হোটেলে ফিরে আমাদের দারুণ বকাবকি করলেন। বললেন, সবাইকে সাসপেন্ড করে দেবেন। পরের দিন দিল্লির সঙ্গেই খেলা। মাঠেও ওরা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সবাই মিলে একাত্ম হয়ে এমন খেলা খেললাম যে, ওরা দাঁড়াতেই পারল না। বোধ হয় চার গোলে হারালাম ওদের।

জিতলাম, কিন্তু খুশি হলাম না। কেননা তখনও ট্রোফি জেতা হয়নি। ফাইনালে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দরাবাদ। আকবর ছিল ওই দলে। আমাকে মেরেওছিল খুব। কিন্তু ওদেরও হারালাম সহজেই। বি সি রায় ট্রোফি পেলাম আমরা, জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে সেরা হলাম। আমার জীবনে এই প্রথম কোনও বড় ট্রোফি জয়। সবাই মিলে লড়াই করে জিতলাম। প্রবল লড়াইয়ের পর জয় বলেই বোধ হয় খুব আনন্দ পেলাম।

(ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

দেশের হয়ে খেলতে চায় শঙ্কর

রাজীব রায়

শঙ্কর সাধুর বড় অস্ত্র হাসি। সহজ-সরল ছেলে শঙ্কর হাসি ছাড়া কোনও কথা বলে না। ওর অবশ্য এখন হাসবারই কথা। এ-বছর বড় দল মহমেডানে এসেই মিডফিল্ডার শঙ্কর সমর্থক, কর্মকর্তা এবং বোদ্ধাদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। কলকাতা ময়দানে একসঙ্গে এই তিনের প্রশংসা পাওয়া কিন্তু সহজ কথা নয়।

হাসির আড়ালে অবশ্য শঙ্করের একটা জেদি মনও আছে। এবং এই জেদি মনের জোরেই উনিশ বছরেই শঙ্কর প্রতিশ্রুতিমানদের তালিকায় এক নম্বরে। কেননা ও যদি জেদ না দেখাত তবে মহমেডান তো দূরের কথা, ফুটবল খেলাই হত না ওর। কেন ? হাসতে হাসতে সে গল্পই শোনাল শঙ্কর।

অশোকনগরের ছেলে শঙ্করের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই। বাবা ব্যবসায়ী। চার ভাই, তিন বোনের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ছোট। ওদের পরিবারে কিন্তু ফুটবলের কোনও চল ছিল না, কেউ খেলেওনি, উৎসাহীও নয়। পাড়ার দাদাদের খেলতে দেখে শঙ্কর ফুটবলের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকও। কতদিন হয়েছে,সকালে অশোকনগর থেকে কলকাতায় চলে এসেছে ইস্টবেঙ্গলের প্রিয় খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস দেখতে। গ্যালারিতে বসে একমনে দেখেছে ওঁদের অনুশীলন। ফিরে গিয়ে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। কোনও কোনওদিন বিকেলে চলে এসেছে ময়দানে ম্যাচ দেখতে। বাড়ির কেউ কিছু অবশ্য জানত না। গোলমাল হল সাবির আলি যেবার কলকাতায় প্রথম এলেন সেবারই। লিগে ইস্টবেঙ্গল-টালিগঞ্জ অগ্রগামীর ম্যাচ দেখতে এসেছে শঙ্কর। মুগ্ধ হয়ে দেখলও। কিন্তু মুশকিল হল বাড়ি ফেরার সময়। ওর ধারণা ছিল, যথারীতি অন্যান্য দিনের মতোই সন্ধের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছতে পারবে। কিন্তু ট্রেনের গোলযোগে ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল অনেক রাত। স্কুল পালিয়ে খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য বাবা দিলেন বেধড়ক পিটুনি। ভয়ে কোথায় খেলার ইচ্ছে উবে যাবে তা না, শঙ্করের জেদ চাপল নিজেই বড় খেলোয়াড় হতে হবে, খেলতে হবে তিন প্রধানের একটিতে। মনে মনে ভাবল, তখন আর নিশ্চয়ই মারবেন না বাবা।

শুরু হল অনুশীলন। শঙ্করের সাহসটা বাড়িয়ে দিলেন প্রতিবেশী পার্থ এবং শঙ্কর রায়। ওদের উৎসাহে নিজেকে ও পরিমার্জিত করতে লাগল স্থানীয় মিলন সঙ্ঘে।

১৯৮৪-তে দুর্গানগর মাঠে ওর খেলা দেখে মহমেডান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল ওর বন্ধু বাবলা (কমল রায়)। সেই বছর তৃতীয় ডিভিসনে ও খেললই না শুধু, মহমেডানের অধিনায়ক পর্যন্ত হল। তার পরের বছর এল দ্বিতীয় ডিভিসনের কালীঘাট মিলনীতে, ১৯৮৬-তে সোনালি শিবিরে। তিন বছর সোনালিতে কাটাবার ফাঁকে গত দু' বছরই জুনিয়ার ন্যাশনালে খেলে এসেছে শঙ্কর। গত বছর সহ-অধিনায়কও হয়েছিল। গত মরসুমে ওর খেলা দেখে অন্য কয়েকটি দল তো বটেই, মোহনবাগান এবং মহমেডানও যোগাযোগ করে। শেষপর্যন্ত এবার শঙ্কর মহমেডানেই সই করে। কারণ, ওদের আন্তরিকতা বেশি ছিল বলে মনে করে শঙ্কর।

মহমেডানে এসে প্রথমে যে বসে থাকতে হবে তা জানত শঙ্কর। এবং সুযোগও যে আসবে সে সম্বন্ধেও সচেতন ছিল ও। তাই সুযোগ আসা মাত্রই আর সেটাকে অপচয় করেনি। বোকারোতে একটা টুর্নামেন্টে ভাল খেলে শঙ্কর। লিগে এখন পর্যন্ত যে ক'টায় সুযোগ পেয়েছে তাতেই সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে আসতে পেরেছে। খারাপ কী ? শঙ্কর নিজে অবশ্য সন্তুষ্ট নয়। জানাল, "ভাল খেলিনি, বলতে পারেন ভাল খেলার চেষ্টা করছি।"

ময়দানে সবার প্রশংসা পেয়েছে শঙ্কর

শঙ্করের উচ্চতা বেশ ভাল—৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, ওজন ৫৬ কেজি। ক্লাবে প্র্যাকটিসের বিরাট ধকল নিয়েও, পারলেই পাড়াতে গিয়ে আলাদা অনুশীলন করে। রবিবার এবং যেদিন কোনও খেলা থাকে না, সেদিনই বিকেলে এক ঘণ্টা প্র্যাকটিস করে পাড়ার মাঠে। হেডিং এবং ট্যাকলিং আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

শঙ্করের প্রিয় খেলোয়াড় সুদীপ চ্যাটার্জি। সুদীপ সম্বন্ধে শঙ্কর বলেছে : "সুদীপদার অলরাউন্ড দক্ষতা আমার খুব ভাল লাগে।" অনিবার্যভাবে পরের প্রশ্ন আসে,"তা হলে কি তুমি সুদীপের মতো হতে চাও ?" শঙ্কর জানায়, "হ্যাঁ চাই, সুদীপদার অলরাউন্ড এবিলিটির সঙ্গে পিটুদার (সমরেশ চৌধুরী) থ্রু পাস বাড়ানোর দক্ষতাও চাই।"

খুব বেশি কোচের কাছে থাকেনি শঙ্কর, তবে তাঁদের মধ্যে শান্ত মিত্রকে খুব পছন্দ ওর। জানাল, "শান্তদা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন।" নঈমকেও অবশ্য ভাল লাগে শঙ্করের। খুব খাটালেও নঈমের শৃঙ্খলাবোধকে শ্রদ্ধা করে ও।

ফুটবল ছাড়া ক্রিকেটও শঙ্করের প্রিয় খেলা। প্রিয় খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ভিভিয়ান রিচার্ড্স। রিচার্ডসের আক্রমণাত্মক খেলা খুব উপভোগ করে ও। নিজে আক্রমণ করতে ভালবাসে বলেই কি পছন্দের তালিকায় প্রথমেই রিচার্ডসের নাম ?

শঙ্করের প্রিয় স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলা। এখন থেকে তাই নিজেকে প্রস্তুত করছে। বিখ্যাত মিডফিল্ডার গৌতম সরকারের মতে, "শঙ্করের খেলা আছে, ডিস্ট্রিবিউশনও ভাল। তবে আরও পরিমার্জনা দরকার।" সেই কাজই এখন চালাচ্ছে শঙ্কর।

শঙ্করের স্বল্প ফুটবল-জীবনে বলার মতো ঘটনা এখনও তেমন কিছু ঘটেনি। তবু তারই মধ্যে একটি ঘটনাকে ও এখন পর্যন্ত স্মরণীয় বলে মনে করে। সেটি হল, অসমের তিনসুকিয়াতে জুনিয়ার ন্যাশনাল খেলতে গিয়ে প্রথম প্লেনে চাপার অভিজ্ঞতা। বাংলা চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। তাই বোধহয় আকাশে-ওড়ার রোমাঞ্চটা আরও বেশি করে মনে আছে শঙ্করের।

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

আমি

সুমিতা লাহা

এই সংখ্যা থেকে শুরু হল একটি নতুন ফিচার 'আমি'। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স এবং অন্যান্য খেলার বিখ্যাত খেলোয়াড়রা তাঁদের নিজের কথা জানাবেন এই বিভাগে। জানাবেন তাঁদের পছন্দ, অপছন্দ সমেত অনেক অজানা তথ্যও। সঙ্গে থাকবে তাঁদের বিষয়ে একটি আলোচনাও। প্রথম 'আমি' সুমিতা লাহা। সদ্য পশ্চিম জার্মানির কার্লসরুহিতে পাওয়ার-লিফটিংয়ের বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় স্কোয়াটে বিশ্বরেকর্ড করে এলেন সুমিতা। নন-ওলিম্পিক গেম্‌সে এই ধরনের কৃতিত্ব সুনীল গাওস্কর ছাড়া আর কোনও ভারতীয়ের নেই। বিশ্বরেকর্ডকারীকে দিয়েই তাই এই ফিচার শুরু হল। প্রত্যেক মাসের প্রথম সংখ্যায় এই ফিচার থাকবে। আগামী 'আমি' এক বিখ্যাত ফুটবলার।

রেকর্ড, আর রেকর্ড

শান্ত, চুপচাপ সুমিতাকে একঝলক দেখলে বোঝাই যায় না, তিনি কিছুদিন আগে বিশ্বের খেলার জগতে ভারতবর্ষকে কতটা উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়ে এলেন। পাওয়ার লিফটিং-এর বিশ্ব গেম্‌সে সুমিতা স্কোয়াটে ২২৫ কেজি ওজন তুলে বিশ্বরেকর্ড করলেন। বিশ্ব গেম্‌স ওলিম্পিকেরই মতো প্রতি চার বছর অন্তর হয়। এবং গুরুত্বে ওলিম্পিকেরই সমান। বিশ্ব সেরারাই এতে অংশ নেন। সুমিতা ছিলেন এশিয়া-ওশেনিয়া দলে। সুমিতার বিভাগে (৭২ কেজি) সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন হল্যান্ডের এক তরুণী। সুমিতা রুপো পান। সুমিতার দুঃখ অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়ে গেল। যাতায়াতের বিরাট অঙ্কের টাকা কোথা থেকে পাবেন—এই চিন্তা মাথায় থাকায় সুমিতা প্র্যাকটিসে সম্পূর্ণ মন দিতে পারেননি। পাওয়ার লিফটিং-এ এলেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সুমিতা যখন হাসতে হাসতে জানালেন, "বিশ্বরেকর্ড করব বলে," তখন সুমিতার উত্তর ঠিকই মনে হয়, তাঁর রেকর্ড করবার বহর দেখে। পরে অবশ্য সুমিতা জানান, ছেলেবেলায় তিনি দৌড়, জ্যাভলিন ইত্যাদি করতেন, কিন্তু শরীর ভারী হওয়ায় দৌড়তে অসুবিধা হচ্ছিল আর লম্বা না হওয়ায় জ্যাভলিনেও ভাল কিছু হচ্ছিল না। তাই তিনি পাওয়ার লিফটিং-এ চলে এলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে অনুশীলন এবং তারপর থেকে তো শুধু জয় এবং রেকর্ড, রেকর্ড আর রেকর্ড। কিন্তু প্রশ্ন হল, এশিয়ার 'স্ট্রং ওম্যান' সুমিতার জয় বেশি, না রেকর্ড বেশি? সুমিতাও কি এর উত্তর জানেন?

জন্মেছি :
১৯৬৪ সালের ৯ মার্চ।

থাকি :
হুগলি জেলার বেগমপুরে।

পাওয়ার-লিফটিংয়ে এলাম কেন :
বিশ্বরেকর্ড করব বলে।

উৎসাহ পেয়েছি :
বাবা, মা, এশিয়ান পাওয়ার লিফ্‌টিং ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি মনোজিৎ বসু, ওলিম্পিয়ান লক্ষ্মীকান্ত দাস, কোচ দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী এবং বেগমপুরের অনেকের কাছ থেকে।

দেশে রেকর্ড করেছি :
১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত, প্রতিবার। তবে বিশ্বরেকর্ড করি গতবারের ন্যাশনালে, জামশেদপুরে। স্কোয়াটে ২২৭·৫ কেজি তুলেছিলাম। যদিও সেটা সরকারি স্বীকৃতি পায়নি।

বিশ্বরেকর্ডের পর কতটা খুশি হয়েছি :
আধা-খুশি। কারণ আমার লক্ষ্য ছিল ২৩২·৫ কেজি তুলব স্কোয়াটে।

আমার আগামী লক্ষ্য :
স্কোয়াটে ২৩৫ কেজি তোলা এবং বিশ্ব-সেরা হওয়া।

অনুশীলন করি :
প্রতিদিন চার ঘণ্টা, সকাল ৭টা থেকে ১১টা।

খাই :
মধ্যবিত্ত পরিবারে সবাই যা খায়।

যা খেতে ভালবাসি :
মাছ, যে-কোনও।

অবসর কাটা :
গান শুনে, গল্প করে।

প্রিয় খেলোয়াড় :
কপিলদেব আর স্টেফি গ্রাফ।

সবচেয়ে আনন্দিত হয়েছি :
জাপানে এশিয়ার 'স্ট্রং ওম্যান' নির্বাচিত হয়ে।

যা দেখে খুব মজা পেয়েছিলাম :
আমেরিকার ডিজনিল্যান্ড, কী মজার জায়গা!

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

টেনিসে সুইডেন এত সফল কেন

সমীরণ নন্দী

ব্যক্তিগত জয়ে দেশের মানুষ গর্বিত হন তো বটেই, কিন্তু দলগত জয়ে গর্বের পরিমাণটা আরও একটু বেশি বোধ হয়! অন্তত টেনিসের ক্ষেত্রে এটা বলা যায়। উদাহরণ, উইম্বলডনে বরিস বেকারের জয়ে নিঃসন্দেহে পশ্চিম জার্মানির টেনিস-প্রেমিকরা খুশি, কিন্তু সে জয় মূলত বেকারেরই জয়। আবার এই বেকারই যখন কয়েকদিন পরেই ডেভিস কাপের সেমিফাইনালে দারুণ খেলে আমেরিকান আন্দ্রে আগাসিকে হারান, তখন তা বেকারের জয় হিসেবে চিহ্নিত হয় না, হয় পশ্চিম জার্মানির জয় হিসেবে। দেশ সেখানে বড়, ব্যক্তি গৌণ।

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সুইডেন নিঃসন্দেহে দেশ হিসেবে এখনও টেনিসের একচ্ছত্র অধিপতি। টানা সাতবার ডেভিস কাপ ফাইনালে ওঠার মধ্যে দিয়ে এর সত্যতা বোঝা যায়। ১৯৭২ সালে, চ্যালেঞ্জ রাউন্ড প্রথা উঠে যাবার পর একটানা ফাইনালে ওঠার এটাই রেকর্ড। সম্প্রতি বাস্টাডে সুইডেন সেমিফাইনালে ৪-১ ম্যাচে হারাল যুগোস্লাভিয়াকে। ফাইনালে সুইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানি। আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৫ থেকে ১৭ তারিখ জার্মানিতেই এই প্রতিযোগিতা হবে। গতবার সুইডেনের গোটেনবার্গে পশ্চিম জার্মানি হারিয়ে দিয়েছিল সুইডেনকেই। কিন্তু এবার কী হবে? সুইডেন অবশ্যই 'মধুর' প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে, অতঃপর বেকারের পশ্চিম জার্মানি এই সুইডিশ হামলার মোকাবিলা কীভাবে করে সেটাই দেখার।

সুইডেনের সাফল্যের কারণ কী? অনেকের মতে, ভাল খেলোয়াড়ের ধারাবাহিক আবির্ভাব। বিয়র্ন বর্গকে দিয়ে শুরু, এর পর একে একে এসেছেন ম্যাটস ভিলন্ডার, স্টেফান এডবার্গ, কেন্ট কার্লসন, আন্দ্রে জারিড এবং জোয়াকিম নাইস্ট্রম। বিয়র্ন বর্গ একসময় একাই টেনিস-দুনিয়াকে শাসন করেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে লাভ করেছেন ১১টি গ্র্যান্ড স্লাম সিঙ্গলস টাইটেল—পাঁচ বার উইম্বলডন এবং ছ' বার ফ্রেঞ্চ ওপেন তিনি জিতেছিলেন।

পঁচিশ বছর বয়স্ক ম্যাটস ভিলন্ডারও বেশ কিছু গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে জয়ী হয়েছেন, গতবছরই তিনটিতে তিনি চ্যাম্পিয়ান হন। গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এবং এ-বছরের উইম্বলডন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালিস্ট স্টেফান এডবার্গ সব কোর্টেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। একুশ বছরের কেন্ট কার্লসন ইউরোপিয়ান ক্লে কোর্ট সার্কিটে বেশ ভাল খেলছেন। আন্দ্রে জারিড গত ছ' বছরে বেশ কয়েকটি ডাবলস গ্র্যান্ড স্লাম বিজয়ী জুটির একজন ছিলেন। ভিলন্ডার এবং নাইস্ট্রম তো ১৯৮৬-তে উইম্বলডন ডাবলসেও জয়ী হন।

এইসব তথ্যই প্রমাণ করে, খেলোয়াড় হিসেবে এঁদের কারও সফলতাই কম নয়। এবং এই তারকারা দলগতভাবেও সাফল্য লাভ করেছেন। তাই সুইডেন গত ছ' বছরে তিন বার ডেভিস কাপ জয় করেছে। বর্গ অবশ্য দেশের হয়ে সেরকম কিছু করতে পারেননি। বর্গের পরবর্তীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কিন্তু বর্গের দ্বারাই। এবং সাফল্যও এসেছে তাই দু'ভাবে—ব্যক্তিগত ও দলগত।

সুইডিশদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁদের মানসিকতা। আমেরিকার জিমি এরিয়াস এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুন্দরভাবে, "সুইডিশরা যখন খেলে তখন কী করে আরও ভাল খেলা যায়, সেটাই তারা চেষ্টা করে। অন্যদিকে আমেরিকানদের লক্ষ্য শুধু জয় আর জয়! এবং তাঁদের কাছে সেটাই সব। উদাহরণ দিয়ে বলছি, আমি বেসলাইনে খেলে জয় পাচ্ছি দেখে খেলার আর উন্নতির চেষ্টা করিনি। এটা কিন্তু পরে আমার ক্ষতিই করেছে।"

জয়ের উদগ্র ইচ্ছা এবং তার জন্য যা খুশি তাই করা—এটা সুইডিশ চরিত্রবিরোধী। এডবার্গ-ভিলন্ডারকে কোর্টে দেখলেই বোঝা যায়, তাঁদের মানসিক ধৈর্য কতখানি। এজন্য অন্য অনেক দেশের প্রতিভাবানদের মতো সুইডিশরা চট করে ফুরিয়ে যান না।

দলগত বা দেশের হয়ে সাফল্যের আরও একটি কারণ, সুইডিশরা শুধু কোর্টেই একসঙ্গে খেলেন না, যখন বিদেশে খেলতে যান তখন একসঙ্গেই থাকেন, প্র্যাকটিস করেন এবং খেতেও যান একসঙ্গে। 'আমরা সবাই একসঙ্গে' এই মানসিকতা খেলাতেও প্রভাব বিস্তার করে।

ভিলন্ডার শুনিয়েছেন ১৯৮৭ সালের স্টকহোম ওপেন চলার সময়ের একটি গল্প। স্থানীয় টেলিভিশনে ছোটদের জন্য একটি প্রোগ্রাম করতে চার সুইডিশ খেলোয়াড়কে ডাকা হয়। চারজনেরই পরনে কমলা রঙের টি-শার্ট। ভিলন্ডার জানিয়েছেন, "আমরা গল্প করি, কথা বলি, নানা প্রশ্নের উত্তর দিই। উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তারা খুশি। শেষে কিন্তু অবাক হয়ে যান, যখন শোনেন কিছুক্ষণ পরেই আমরা এই চার জন পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছি।" সুইডিশদের এই পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা যে দলগত সাফল্যকেও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়, তা বলাই বাহুল্য।

সরকারের কাছ থেকে সেরকম সাহায্য না মিললেও সুইডেনে আছে প্রায় এক হাজার টেনিস ক্লাব। সবচেয়ে বড় কথা, জনগণ দারুণ সাহায্য করেন এইসব ক্লাবকে। আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন কম্পানি এবং জনগণ। নব্বইয়ের দশকে আর-এক বিয়র্ন বর্গ তৈরি করা এবং আশির মতো নব্বইয়ের দশকেও সুইডেনকে টেনিস-বিশ্বের শীর্ষস্থানে রাখাই তাঁদের স্বপ্ন।

এই তরুণ দলই সুইডেনকে ডেভিস কাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

লিনেকার কি পারবেন ফর্ম ফিরে পেতে

অঞ্জন মুখোপাধ্যায়

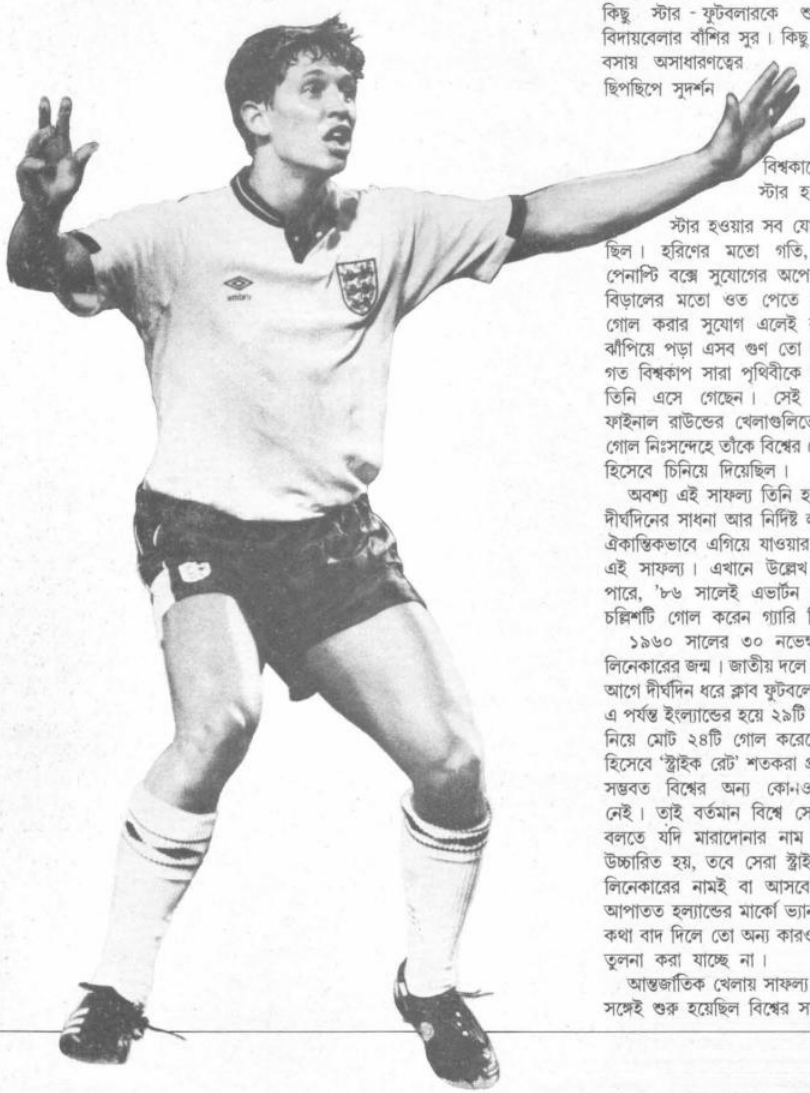

গত মেক্সিকো বিশ্বকাপে সাড়াজাগানো এক ব্রিটিশ ফুটবলারের নাম এখনও ক্রীড়ারসিক মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। আর্জেন্টিনার দিয়েগো মারাদোনা, ইতালির পাওলো রোসি, ব্রাজিলের জিকো অথবা পশ্চিম জার্মানির রুমেনিগের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকেরা সেবার হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছিলেন ইংল্যান্ডের ফুটবলার গ্যারি লিনেকার-এর খেলা দেখে। প্রতিটি বিশ্বকাপ কিছু স্টার - ফুটবলারকে শুনিয়ে দেয় বিদায়বেলার বাঁশির সুর। কিছু ফুটবলারকে বসায় অসাধারণত্বের আসনে। ছিপছিপে সুদর্শন লিনেকার মেক্সিকোতে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপে রাতারাতি স্টার হয়ে গেলেন।

স্টার হওয়ার সব যোগ্যতাই তাঁর ছিল। হরিণের মতো গতি, প্রতিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে সুযোগের অপেক্ষায় শিকারি বিড়ালের মতো ওত পেতে থাকা অথবা গোল করার সুযোগ এলেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া এসব গুণ তো তাঁর ছিলই। গত বিশ্বকাপ সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিল তিনি এসে গেছেন। সেই বিশ্বকাপেরই ফাইনাল রাউন্ডের খেলাগুলিতে মোট ছ'টি গোল নিঃসন্দেহে তাঁকে বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার হিসেবে চিনিয়ে দিয়েছিল।

অবশ্য এই সাফল্য তিনি হঠাৎ পাননি। দীর্ঘদিনের সাধনা আর নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ঐকান্তিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার ফলেই তাঁর এই সাফল্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, '৮৬ সালেই এভার্টন ক্লাবের হয়ে চল্লিশটি গোল করেন গ্যারি লিনেকার।

১৯৬০ সালের ৩০ নভেম্বর ইংল্যান্ডে লিনেকারের জন্ম। জাতীয় দলে স্থান পাওয়ার আগে দীর্ঘদিন ধরে ক্লাব ফুটবলে খেলেছেন। এ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে ২৯টি খেলায় অংশ নিয়ে মোট ২৪টি গোল করেছেন। অঙ্কের হিসেবে 'স্ট্রাইক রেট' শতকরা প্রায় আশি, যা সম্ভবত বিশ্বের অন্য কোনও স্ট্রাইকারের নেই। তাই বর্তমান বিশ্বে সেরা ফুটবলার বলতে যদি মারাদোনার নাম বিনা দ্বিধায় উচ্চারিত হয়, তবে সেরা স্ট্রাইকার হিসেবে লিনেকারের নামই বা আসবে না কেন? আপাতত হল্যান্ডের মার্কো ভ্যান বাস্তেন-এর কথা বাদ দিলে তো অন্য কারও সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা যাচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক খেলায় সাফল্য আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল বিশ্বের সমস্ত বড় বড়

ক্লাবের তরফ থেকে লিনেকারকে নিয়ে টানাটানি। রাতারাতি তাঁর পারিশ্রমিকও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। একটা হিসেব দেওয়া যাক। স্বদেশের লিস্টারশায়ার দলে লিনেকার খেলতেন বার্ষিক আশি হাজার পাউন্ডে। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে এভার্টন দলে যোগ দেন বার্ষিক ১১ লক্ষ পাউন্ডের চুক্তিতে। কিন্তু এত পারিশ্রমিক দিয়েও এভার্টন তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৮৬ সালে পাড়ি দিলেন স্পেনে। সেখানে বার্সিলোনার টেরি ভেনাবল্‌স্ লিনেকারকে কিনে নেয় বার্ষিক ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ডের চুক্তিতে। বলার কথা, এই দলেরই ম্যানেজার হল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার যোহান ক্রুইফ। তবে লিনেকারের মন বসেনি স্পেনে। তাঁর মন পড়ে ছিল লন্ডনে, যেখানে আজন্ম তিনি প্রতিপালিত। তিনি আবার ইংল্যান্ডেই ফিরে গেছেন।

ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলিতে বছরখানেক আগে হল্যান্ডের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এক প্রদর্শনী খেলা হয়। সেখানেও লিনেকার দেশের পক্ষে গোল দিয়েছেন। যাঁরা ভেবেছিলন লিনেকার স্পেনের বার্সিলোনাতে গিয়ে ফর্ম হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন লিনেকারের মারাত্মক গতি আর গোল করার দক্ষতা অম্লানই রয়েছে।

সামনের বছর ইতালিতে বিশ্বকাপের আসরে ইংল্যান্ডের সাফল্য লিনেকারের ওপরেই অনেকটা নির্ভরশীল। সেজন্যই ইংল্যান্ডের ম্যানেজার ব্রায়ান রবসন সাংবাদিকদের বলেছেন "আমরা ভাল ফল করব। কারণ, আমাদের রয়েছে গ্যারি লিনেকার।"

কিন্তু মাঝখানে লিনেকার নিজেকে কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। গোল দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর কেমন যেন কমে গিয়েছিল। তবে লিনেকার জানেন, মানুষের জীবন অবিচ্ছিন্ন সাফল্যে ভরে থাকে না। মাঝে মাঝে আসে দুঃসময়। ইতালির রোমে লিনেকার আবার তাঁর সুসময় ফিরে পাবেন, এটাই ইংল্যান্ডের সমর্থকদের আশা। তার আগে অবশ্য ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপের মূল পর্বে যেতে হবে। লিনেকার যে দলে আছেন সে দলের পক্ষে কাজটা যে কঠিন নয়, তা শুধু ম্যানেজার রবসন নন, সারা বিশ্বই জানে। লিনেকারের এখন একটাই কাজ। তাঁকে তাঁর ফর্ম ফিরে পেতে হবে। না হলে শুধু মেক্সিকো বিশ্বকাপ ফুটবলের অন্যতম তারকা হয়েই তিনি চিহ্নিত থাকবেন।

চটিতং

বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান মাইক টাইসনের অপরাজেয় আখ্যা কেড়ে নিতে পারলেন না কার্ল 'ট্রুথ' উইলিয়াম। এখনও পর্যন্ত ৩৭টি লড়াইয়ে টাইসনের রেকর্ড ৩৭—০। উইলিয়াম যে হারবেন, এটা উইলিয়াম ছাড়া আর সকলেই জানতেন। কিন্তু লড়াইটা যে এত তাড়াতাড়ি, মাত্র ৯৩ সেকেন্ডে শেষ হয়ে যাবে সেটা সত্যিই অনেকের অজানা ছিল! উইলিয়াম দোষ দিয়েছেন রেফারির ওপর। তিনি নাকি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। ভীষণ চটেছেন অবশ্য এক দর্শকও! গনগনে মুখে জানিয়েছেন, "সিটে বসতে না বসতেই বক্সিং শেষ। এত হাজার ডলার দিয়ে টিকিট কিনেছি কি শুধু সিটে বসামাত্রই উঠে আসবার জন্যে?"

অতীত যখন কথা বলে

ষাট বছরে পা রাখলেন বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত গোলকিপার লেভ ইয়াসিন। সেই উপলক্ষে মস্কোর ডায়নামো স্টেডিয়ামে হয়ে গেল এক অসাধারণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। অসাধারণ এই অর্থে যে, সেই ম্যাচে ভেটারেন্স দলে খেললেন অতীতের কয়েকজন সুপারস্টার— ব্রাজিলের কার্লোস আলবার্তো, পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার, ইংল্যান্ডের ববি চার্লটন এবং পর্তুগালের ইউসেবিও। পেনাল্টিতে দারুণ গোল করলেন ববি চার্লটন। আর পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে 'ইউরোপের পেলে' ইউসেবিও দুরন্ত গতির শটে যে গোলটি করলেন, দূরদর্শনের পরদায় তার ঝলক দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল, হায়, ঐদের যৌবনের খেলা কেন আমরা দেখতে পেলাম না।

সেরা কোর্ট

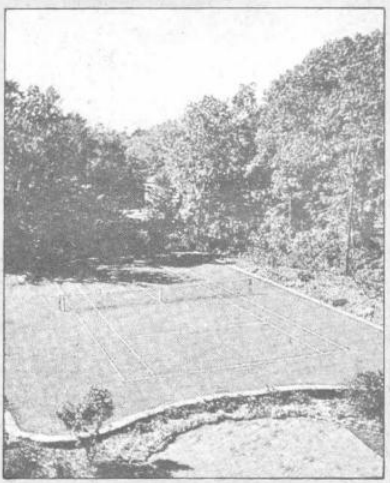

ছবির মতো যে ঘাসের কোর্টটি দেখা যাচ্ছে, অন্য কোর্টের সঙ্গে তার কিছুটা পার্থক্য আছে। এটি রয়েছে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের প্যাক্সটনে। আরও পরিষ্কার করে জানালে, শ্রী পিটার ও শ্রীমতী ওয়েন্ডি গুটারম্যান-এর বাড়ির পেছনের অংশে। এর চারদিকে কোনও দেওয়াল নেই, তার পরিবর্তে আছে বিরাট এলাকা জুড়ে সত্তর রকমের ঘন গাছের সারি, তেরো রকমের ফলের গাছ। অন্য কোর্টের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? এটি আসলে, টেনিস ইন্ডাস্ট্রি ম্যাগাজিনের বছরের সেরা কোর্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে।

ইভান লেন্ডল

গ্যারি লিনেকার
umbro

প্রাণচঞ্চল নিউ ইয়র্ক

সৃঞ্জয় চৌধুরী

নিউ ইয়র্কের কর্মব্যস্ত রাস্তায় চলছে

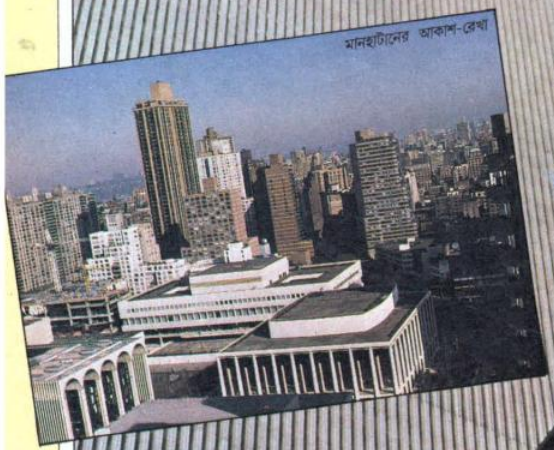

মানহাটানের আকাশ-রেখা

মাইলের পর মাইল জুড়ে যতদূর চোখ যায় শুধু গাছ আর গাছ। সেইসব গাছের বিশুষ্ক ও মৃত শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে আছে পাউডারের মতো একরাশ সূক্ষ্ম, সাদা বরফকুচি। ধূসর আকাশের পটভূমিতে দূরে নিঃসঙ্গভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কতকগুলি কাঠের খামারবাড়ি। ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতের কনকনে বাতাস তুষারে মাখামাখি হয়ে হু-হু করে ছুটে আসছে। সেই হু-হু হাওয়ার মধ্যে আমাদের ট্রেনটা এখন বস্টন থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে। সেই নিউ ইয়র্ক, মার্কিনি যুবক-যুবতীরা যাকে তাদের নিজস্ব ভাষায় ঠাট্টা করে 'বিগ অ্যাপল' বলে থাকে।

আচমকা একটা সময়ে গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমে এল, বাড়তে লাগল বাড়ির সংখ্যা। ছোট-ছোট একরাশ ঘনসংবদ্ধ বাড়ি। আমার চোখে পড়ল গোধূলির বিষণ্ণ মায়াবী আলোয় উজ্জ্বল হাডসন নদীর উপর সুবিশাল ভেরাজোনা-ন্যারোস সেতু। পৌঁছে গেছি নিউ ইয়র্ক।

গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে ট্রেনটা যখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বাইরে স্লেটের মতো ধূসর আকাশ থেকে তখন তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। একরাশ ব্যস্ত-সমস্ত জনতা, খবরের কাগজের ফিরিওয়ালা ও জুতো-পালিশ করা বালকদের ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে, ব্যাগেল-স্টল (এক-জাতীয় খাবারের দোকান), চুল ছাঁটার দোকান ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে এসে পৌঁছলাম স্টেশনের বাইরে। বার হওয়া-মাত্র আবার সেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। কোনওমতে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে পাকড়াও করা গেল।

ট্যাক্সি-চালকটি স্বভাবে রীতিমত শান্ত ও অলস। একজাতীয় দুর্বল, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে সে যাবতীয় কাজ চালায়, পরে গল্পে-গল্পে জানা গেল লোকটি আসলে রুমানিয়ার অধিবাসী, নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে মাত্র কয়েক মাস আগে।

এখানেও শহরে রাস্তার সেই চিরপরিচিত, একঘেয়ে বিশৃঙ্খল ব্যস্ত জনতার ভিড় আর লাগাতার গাড়ি। তবু, তারই মধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরটা যেন একটু-একটু করে আমার কাছে তার নিজস্ব ঘোমটা খুলে ধরছিল। প্রায় ৬০ লক্ষ লোকের এই শহরটি সুস্পষ্ট পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত : মানহাটান, ব্রংক্স, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যাণ্ড। এদের মধ্যে সবচেয়ে কর্মব্যস্ত অঞ্চল হল মানহাটান। এটাই নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বেশি অভিজাত, সবাধিক প্রাণচঞ্চল ও সৌন্দর্যময় এলাকা। বস্তুত, মানহাটানের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য গোটা নিউ ইয়র্ককে বিখ্যাত ও অতুলনীয় করে রেখেছে। সেটি হল গগনচুম্বী প্রাসাদ ও অট্টালিকার সমাহার। এইসব আকাশছোঁয়া বাড়িগুলির অধিকাংশ একশো তলাকে অনায়াসে অতিক্রমে করে গেছে।

একরাশ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ব্রডওয়ে ছাড়িয়ে, পকেটমার ও চোর-ছ্যাঁচড়ের ভিড়ে ভর্তি বিয়াল্লিশ নং রাস্তা ধরে আমাদের ট্যাক্সিটা ক্রমশ সেন্ট্রাল পার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য! আচমকা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম সেন্ট্রাল পার্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির সঙ্গে জুতে দেওয়া রয়েছে কতকগুলি ক্লান্ত, রুগ্‌ণ ঘোড়া।

এই সেন্ট্রাল পার্কেই এক সপ্তাহ আমাকে থাকতে হবে। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মানহাটানের ওয়েস্ট সিক্সটিয়থ স্ট্রিটের একটি বাড়ির পঁয়ত্রিশ তলার উপরে একটি ঘরে। ঠিক আছে ঘুরে-ফিরে এই মানহাটানেই বরং সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

ট্যাক্সির ভাড়া নিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে ড্রাইভারের সঙ্গে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করে শেষ অবধি একটা রফায় পৌঁছনো গেল। ইস্, আমার শান্ত রুমানিয়ান ড্রাইভার এতক্ষণ নিউ ইয়র্কের দৃশ্য-ফিশ্য দেখিয়েছে ভালই, কিন্তু দামের দিক থেকে গলা কাটতেও সে রীতিমত ওস্তাদ লোক। যাকগে, গতস্য শোচনা নাস্তি। বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক কোনটি? পৃথিবীর কোন স্থাপত্যটিকে একঝলক চোখে দেখলেই মনে পড়ে যায় আমেরিকার নাম? নিঃসন্দেহে এর উত্তর হল স্ট্যাচু অব লিবার্টি। হ্যাঁ, একদা ফরাসি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপহার, ২০০ বছরেরও বেশি পুরনো, জ্বলন্ত মশাল হাতে এই মর্মর নারীমূর্তিটিই এখনও নিউ ইয়র্কের সবাধিক আকর্ষক ট্যুরিস্ট-স্পট!

> নিউ ইয়র্ক শহরের প্রায় সব রাস্তাই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। গোটা শহরটা যেন এক উদ্দাম উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। ... কলকাতার কথা মনে হয়। এমন বিচিত্র বর্ণ, জাতি ও ভাষার সমাহার খুব কম দেশেই আছে।

ভোরের এই আকাশটা বেশ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শুধুমাত্র ঠাণ্ডা বাতাস হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। এইরকমই এক সকালে আমি তাকিয়েছিলাম স্বাধীনতার ওই মর্মর নারী মূর্তির দিকে। আচমকা, ধূসর ও নীল ওভার কোট গায়ে দিয়ে বাস-ভর্তি জাপানি ট্যুরিস্ট দল তাদের নিজস্ব মিনোল্টা, নিকন ইত্যাদি ক্যামেরা নিয়ে হইহই করতে করতে নেমে পড়ল। সেই সাত-সকালে আচমকা তাদের হইচই, ক্যামেরার মুর্মুহু ক্লিক-ক্লিক রীতিমত গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। নাহ্, এখান থেকে এখন সরে পড়াটাই সমীচীন বোধ হচ্ছে।

মানহাটানের দক্ষিণে ওয়াল স্ট্রিট হল মার্কিনি 'য়াপি'দের স্বর্গ। ওঃ হো, 'য়াপি' মানেটাই তো এখনও বলা হয়নি। তরুণ বয়সী যেসব শহুরে মার্কিনি বৃত্তিজীবী বছরে ৪০,০০০ ডলারেরও বেশি টাকা উপার্জন করে, অভিধানে তাদেরই নাম দেওয়া হয়েছে য়াপি। ১৯৮৭-র শেয়ারবাজারে সেই বিখ্যাত ধস, অর্থনৈতিক মন্দা সহ্য করেও এই ওয়াল স্ট্রিট এখন অবধি সারা পৃথিবীর অর্থনীতির চালক, ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক।

ওয়াল স্ট্রিটে ঢুকবার মুখে রাস্তার ধারের ছোট্ট পথচিহ্নটা প্রায়ই চোখে পড়ে না, কিন্তু একবার ঢুকে পড়লে সেখানকার গমগমে হাঁকডাক ও আভিজাত্যই বুঝিয়ে দেবে এটা ওয়াল স্ট্রিট ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা হতেই পারে না। উজ্জ্বল, গগনচুম্বী সব অট্টালিকায় হরদম ব্যস্ত লোকের আনাগোনা। কেউ ঢুকছে, কেউ-বা বেরোচ্ছে। প্রত্যেকের পরনে প্রায় একরকম পোশাক, পুরুষরা গায়ে দিয়েছে বারবেরি ওভারকোট, তার নীচে ফর্মাল জ্যাকেট। মহিলাদের পরনেও নিখুঁত, নিভাঁজ বিজনেস স্যুট। প্রত্যেকের চোখ-মুখে একজাতীয় চাপা ক্লান্তি ও উত্তেজনা। আমার পরনের নীল জিন্স, জ্যাকেট, পশমি টুপি ও বাকস্কিন বুটে নিজেকেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। পোশাকই বুঝিয়ে দিচ্ছিল আমি এখানকার কেউ নই, বরং অনেক...অনেক দূরের এক বহির্লোকের অধিবাসী।

ওয়াল স্ট্রিটে প্রত্যেকেই শেয়ারব্যাপারি, প্রত্যেকেই রীতিমত ধনী এবং কীভাবে আরও বেশি ধনী হওয়া যায় তার জন্য তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মনে হল, এই য়াপি-স্বর্গের গাড়িগুলোও এই পাড়ার বনেদিয়ানার পরিচায়ক। এখানকার ব্যবসায়ীদের মতো এই পার্কিং-জোনে দাঁড় করানো গাড়িগুলোও অর্থকৌলীন্যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম। মনে হল, সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার

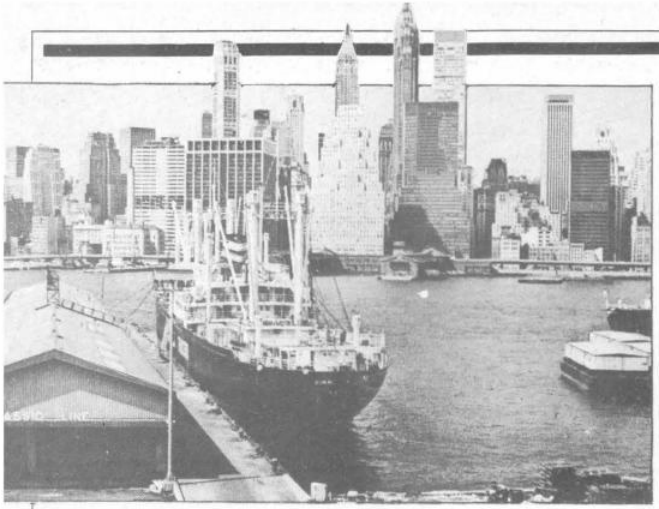

ব্রুকলিনে আছে জাহাজ তৈরির কারখানা

করলে, বি এম· ডব্লু গাড়িগুলিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এর সঙ্গে ভলভো এবং অডি গাড়িও পাল্লা দিচ্ছে সমানতালে।

কলকাতার সবুজ ফুসফুস যেমন ময়দান, মানহাটানের সেরকম রয়েছে সেন্ট্রাল পার্ক। তবে, মানহাটানের ফুসফুসটি আয়তনে কলকাতার ফুসফুসের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক বেশি সবুজ। গ্রীষ্মের ঘন সবুজ গাছপালা, রং-ঝলমলে পোশাকে বেড়াতে আসা লোকজন—এসব মিলিয়ে তখন সেন্ট্রাল পার্ককে প্রায় পারিজাত-উদ্যানের মতো মনে হয়। সেই মে-জুন-জুলাই মাসে এখানে কনসার্টের আসর বসে, হঠাৎ-হঠাৎ বিভিন্ন মেলা বসে। ডিসেম্বর মাসটা আলাদা। শীতের সেন্ট্রাল পার্ক তখন গ্রীষ্মের রংচঙে, ঝলমলে সেন্ট্রাল পার্কের এক প্রেতাচ্ছায়ামাত্র। শুধু একপাশে, স্কেটিং রিঙ্কে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা স্কেট করছে, মাঝে-মাঝে পড়ে যাচ্ছে।

জিন্‌সের প্যান্ট আর চামড়ার জ্যাকেট পরনে মোটাসোটা, কালোমতো লোক হঠাৎই আমার কাছে এগিয়ে এল। একটা টেলিফোন করবে, পঁচিশ সেন্ট তার ভীষণ দরকার। যাক্, মানহাটানেও তা হলে ভিখিরি আছে! তা, কী আর করা যাবে। লজ্জার মাথা খেয়ে বীরদর্পে হাঁটতে-হাঁটতে তাকে জানিয়ে দিলাম আমার কাছে আদতে কোনও টাকা-পয়সাই নেই।

চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত সাবমেশিনগান উঁচিয়ে, দুর্ধর্ষ রক্ষীরা শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্ক-ভল্টগুলিকেই পাহারা দেয় না, প্রায় একইরকম নিশ্ছিদ্র, কড়া প্রহরা রয়েছে মিউজিয়ামগুলির সামনেও। ব্যাঙ্কের ভল্ট ছাড়া, জাদুঘরেও যে অনেক মূল্যবান সামগ্রী থাকতে পারে, এ-বিষয়ে নিউ ইয়র্কবাসীদের মনে অন্তত কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। আর, মানহাটান তো স্রেফ মিউজিয়ামেই ভর্তি। রয়েছে সেন্ট্রাল পার্কের লাগোয়া মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম, নিউ ইয়র্কবাসীরা আদর করে যাকে 'মেট' বলতেই অভ্যস্ত। এখানকার প্রাচীন মিশরীয় কারুকাজ, ভারতীয় ভাস্কর্য, চিনামাটির সংগ্রহ দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চিত্রকলার সংগ্রহও অতুলনীয়, একটা হলঘরের অর্ধেক জুড়ে শুধু সারি-সারি রেমব্রান্টের ছবি। আমার ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি, রঁদার ভাস্কর্য বেশি ভাল লাগে। এখানেই দেখলাম, রঁদার করা ভিক্তর ইয়ুগোর সেই বিখ্যাত আবক্ষ প্রতিমূর্তি। তা ছাড়া, তখন মেট্-এ জর্জিয়া ও কেফে'র ছবির প্রদর্শনী চলছিল। ফাঁকতালে, উপরি পাওনা হিসেবে সেই প্রদর্শনীটাও আমার দেখা হয়ে গেল।

আর-একটা বিখ্যাত জায়গা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট, যার সংক্ষিপ্ত আদুরে মার্কিনি নাম 'মোমা'। একটা ঘরে টাঙানো আছে মঁনের সুবিশাল একটা ক্যানভাস। ঘরের চার দেওয়ালের বিষণ্ণ নির্জনতায় শুধুমাত্র মঁনের আঁকা সেই ছবি···উফ্! ইম্প্রেশনিজমের চূড়ান্ততম পরিণতি বোধ হয় এই ছবিটাই!

শুধুই কি মঁনে আর ইম্প্রেশনিজম? তেল-রঙে আঁকা একটা ছবি থেকেও চোখ সরিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কার আঁকা ছবি? সালভাদর দালি।

মোমার বেসমেন্টের একটা অংশ শুধুই চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে। চ্যাপলিনকে একদা যে সাম্মানিক অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, তারও মানপত্র এখানে রয়েছে। মোমারই এক কর্মচারী, প্রবাসী এক উত্তরপ্রদেশী ভারতীয় স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আমাকে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। কারণ? "আপনি কলকাতার লোক। রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়ের দেশের লোক। আপনাকে এসব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো···আমার কাছে একটা সম্মান-ই বলতে পারেন।"

আরও অসংখ্য মিউজিয়াম আছে। আধুনিক চিত্রকলার চোখ-ধাঁধানো সংগ্রহ রয়েছে ওগেনহেইম-এ, রয়েছে ফোটোগ্রাফির ওপরে একটি মিউজিয়াম। তবে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ফ্রিক সংগ্রহশালা। এককালে, এক ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত বাসভবন এখন চিত্রশালায় রূপান্তরিত। কয়েকটা মারাত্মক ছবি তো আছেই, উপরন্তু পরিবেশটাও অসাধারণ।

সংগ্রহশালা দেখার নেশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি, অগত্যা একদিন চলে গেলাম বইয়ের সংগ্রহশালা দেখতে। সেই সংগ্রহশালার নাম 'নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি'। অবস্থান ওই মানহাটানেই, ৪৫ নং রাস্তায়। থরে-থরে সাজিয়ে রাখা, লাখো-লাখো বই আর পত্রপত্রিকা তো আছেই, উপরন্তু রয়েছে জর্জ ওয়াশিংটনের একগাদা প্রতিকৃতি।

শেষ যে মিউজিয়ামে ঢুঁ মারলাম, সেটা প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংগ্রহশালা। সোজা কথায়, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম। গিয়েছিলাম আমাদের কিছু পুরনো বন্ধুর কঙ্কাল-কাঠামো দর্শন করতে। পুরনো মানে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের বন্ধু। সত্তর থেকে একশো মিলিয়ন বছর আগে স্রেফ ওঁরাই তো পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ওঁদের নাম ডাইনোসর। কী বিশাল-বিশাল কঙ্কাল, একেবারে ভয় পাইয়ে দেয়। খুদে দর্শকরাও সেই বিশালত্বে ভীত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

এদিকে সময় তার নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে চলেছে। বুঝলাম, এই স্বল্প সময়ে যা দেখেছি, তা নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলির অতুল সম্পদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কিন্তু এতেই রীতিমত মাথা ঘুরতে শুরু করেছে।

নিউ ইয়র্ক শহরের প্রায় সব রাস্তাই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। গোটা শহরটা যেন এক উদ্দাম উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। কেমন যেন কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। রাস্তাঘাট ভিড়ে ভিড়াক্কার, লোকে গায়ের

উপরে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে, ক্ষমা চাওয়ার কোনও বালাই নেই। কেউ-কেউ আবার ট্রাফিক-আলো অমান্য করে রাস্তা পেরোচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় এমন বিচিত্র দেশ, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র জাতি, বিচিত্র ভাষার সমাহার পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। বিচিত্রদর্শন পাংকদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। ছেলেরা 'মোহাক' পুরুষের মতো চুল ছেঁটে তাতে কমলা রং করেছে, গায়ে দিয়েছে হাতাবিহীন লেদার জ্যাকেট। দৃষ্টি বহুদূরে, যেন অনন্ত-কিছু দেখছে। কেউ-কেউ আবার কানে দুল, কানপাশাও চড়িয়েছে। মেয়ে পাংকরা হাতব্যাগের বদলে, হাতে কেটলি ঝুলিয়ে বহাল তবিয়তে হেঁটে যাচ্ছে। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের অধিকাংশই বেশ ষণ্ডামার্কা, ওয়াকম্যান কানে জগঝম্প, লারেলাপ্পা গান শুনতে-শুনতে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানে, নাচতে নাচতে হাঁটছে আর কি! আর রয়েছে ভদ্র কলেজীয় স্নাতক। পরনে লাল নেকটাই, অক্সফোর্ডিয়ে নীল জামা, দামি স্যুট, ওভারকোট ইত্যাদি অভিজাত পরিচ্ছদ। ঘন চুল নিটোলভাবে পিছন দিকে উলটে আঁচড়ানো।

রাস্তায় দ্রুত গতিতে হাঁটতে থাকা নিউ ইয়র্কের লোকেরা আবার আপনমনেই কীসব বকবক করে! পাগল নাকি? নাহ্, পরে জেনেছিলাম, ওটা নাকি টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পদ্ধতি। আসলে, নিউ ইয়র্কে সব-কিছুই চলে। কারণ, এখানে কেউই কাউকে পাত্তা দেয় না।

শহরের কোনও কোনও অংশে গেলে মনে হয়, সেটা যেন বিশেষ একটি জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। লেক্সিংটন অ্যাভিনিউতে গিয়ে আমি তো রীতিমত হতবাক। সার-সার ভারতীয় দোকান, সিল্কের শাড়ি থেকে শুরু করে সাদা সরষে কালো জিরে সবই এখানে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ব্যবসায়ী হয় গুজরাতি, নয় সিন্ধি। 'মেহতা অ্যাণ্ড সন্স', 'প্যাটেল ব্রাদার্স' এইসব নামের দোকানের ছড়াছড়ি। ভর্তি সব ইলেকট্রিক গ্যাজেট। ভাত রান্নার কুকার থেকে শুরু করে ২২০ ভোল্টে চলতে পারে এরকম মিউজিক-সিস্টেম। আমি রীতিমত হতবাক হয়ে গেছি। ২২০ ভোল্টের মিউজিক-সিস্টেম ভারতের যে-কোনও জায়গায় চলতে পারে কিন্তু আমেরিকায় তো তা ব্যবহারের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। ইতালিয়ানও রয়েছে প্রচুর। নিঃসন্দেহে এটাই শহরের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। ইতালীয় মাফিয়ারা আর যাই হোক, অন্তত রাস্তাঘাটে ছিঁচকে চুরিচামারি রাহাজানি যাতে না হয়, সে-বিষয়ে নিঃসংশয় করে দিতে পারে।

তীব্র শৈত্যময় এক অপরাহ্ণে উপস্থিত হলাম হারলেমে। ছবি তোলার জন্য যতবার দস্তানা থেকে হাত বার করি, মনে হয় ঠাণ্ডায় আঙুল জমে যাচ্ছে। শেষে হাল ছেড়ে দিলাম।

স্বভাবচরিত্রে হারলেম মানহাটানের একেবারে বিপরীত। এখানে উজ্জ্বল ইস্পাতের বা স্বচ্ছ চাকচিক্যময় কাচের কোনও বৃহৎ প্রাসাদ ঢেকে দেয়নি আকাশের মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ বাড়িঘর কেমন যেন বিবর্ণ, চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ। কোনওটা মনে হচ্ছে ভগ্নস্তূপ এক ভুতুড়ে বাড়ি, কোনওটা সত্যিই পরিত্যক্ত। দেখে মনে হয়, মার্কিনি বিমানবহর হঠাৎ কতকগুলি বাড়িতে বোমা ফেলে চলে গেছে। বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত এক নগর।

হারলেম হল নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণাঙ্গদের এক শক্ত ঘাঁটি। এখানে সাদা চামড়া প্রায় চোখেই পড়ে না। পুলিশেরা সবাই কৃষ্ণাঙ্গ, এমনকী রাস্তার হোর্ডিং থেকে যে সুন্দরী মহিলা নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন, তিনিও কৃষ্ণাঙ্গী।

এইসব কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো অধিকাংশ বেশ ক্রুদ্ধ ও হতাশ। হতাশ কেন না তাদের বক্তব্য, দেশটার যাবতীয় উন্নতিই হয়েছে তাদের বাদ

দর্শনার্থীদের কাছে এই জলভ্রমণ কম আনন্দদায়ক নয়

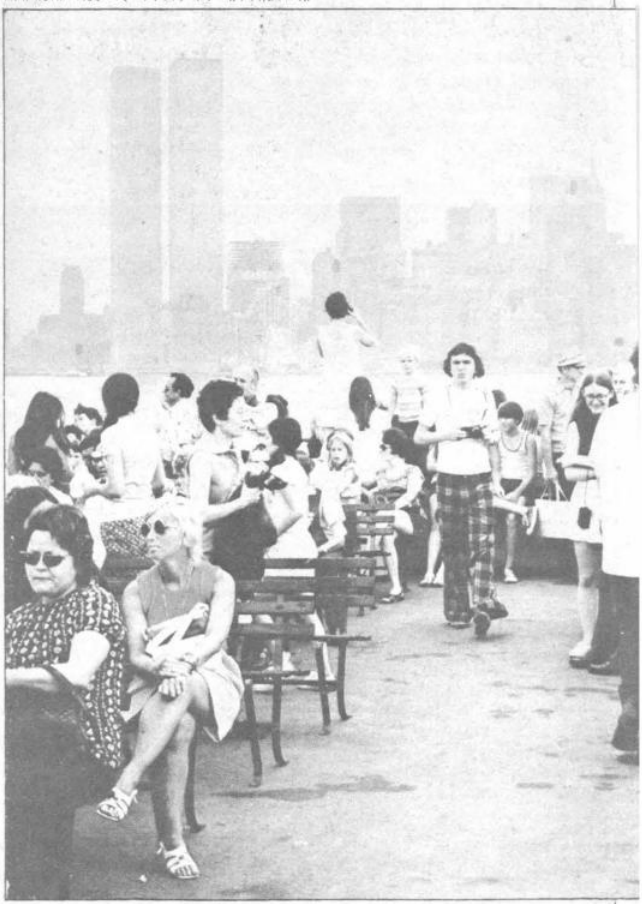

দিয়ে। দেওয়ালে আঁকাআঁকি আর লেখালেখির ছড়াছড়ি। কোনও-কোনও ছবি বেশ মজার, তবে অধিকাংশই বেশ দুঃখের। দুঃখ বা মজা, যাই হোক না, এইসব দেওয়ালচিত্রের শিল্পবৈচিত্র্য যে রীতিমত উঁচু মানের তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। নিতান্ত সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বাস করেও কিছু-কিছু কৃষ্ণাঙ্গ আজকাল বেশ উন্নতি করেছেন। ক্রুদ্ধ, অশান্ত অনেক হারলেম-সন্তান খেলাধুলো, সঙ্গীতজগতে বেশ বিশিষ্ট নাম।

নিউ ইয়র্কের রাস্তার মোড়ে-মোড়ে খাবারের দোকান। মাত্র এক ডলার খরচ করলেই একটি বেশ বড়সড়, তাজা হটডগ চাটনি ও কাসুন্দি সহযোগে অনেকক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায়। শীতের জনপ্রিয় পানীয় এখানে কফি। চকোলেট, ক্যাণ্ডি ইত্যাদি মুখরোচক জিনিস তো বিক্রি হয় হরদম। খাবারের মধ্যে ইথিওপিয়ান খাবার আর ঝাল, মসলাওয়ালা ইতালীয় সসেজই বেশি জনপ্রিয়। টরটিলা, ন্যাকোস্ ইত্যাদি মেক্সিকান খাবারও পাওয়া যাচ্ছে। রেস্তরাঁগুলি রীতিমত দুর্মূল্য। আমার মতো হতদরিদ্র ট্যুরিস্টের যেখানে বসা সাজে না। সুতরাং, সেইসব হোটেল ও রেস্তরাঁর নিখুঁত, নিভাঁজ উর্দিপরিহিত দ্বাররক্ষীদের দিকে ফ্যালফাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

রেস্তরাঁর মতোই দুর্মূল্য স্থান এখানকার পোশাকের দোকান। ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে এখানকার যত বড়-বড় সব বিজ্ঞাপনের এজেন্সি আর ফ্যাশন-ডিজাইনারের ভিড়, পোশাকজগতে সম্রাট ফরাসি 'ইয়ভস্ সঁ-লর্গি' লারোশ, ব্রিটিশ 'হালস্টন', 'র‍্যাল্ফ লরেন' ইত্যাদি পৃথিবীবিখ্যাত লোভনীয় নামের সমাহার ঘটেছে এই রাস্তায়। আমার পক্ষে অবশ্য এসব পৃথিবীখ্যাত ফ্যাশন-দোকানের কাচের জানলায় জুলজুল করে তাকানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। ঘুরে-ফিরে মনে হল, 'বিল ব্লাস' নামের দোকানটায় ঢোকা যেতে পারে। প্রথমত এটা সেরকম বিখ্যাত নয়। দ্বিতীয়ত, দোকানের সামনে লাল রঙে জ্বলজ্বল করছে একটি নোটিস বোর্ড, 'সেল ! সেল্ ! শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়।'

সাহস সঞ্চয় করে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ওহ্ বাবা ! সবচেয়ে শস্তা জামাটার দাম ১২৫ ডলার। একরকম ছুটে পালিয়েই এলাম বলতে হবে।

নিউ ইয়র্কে এক-একটা অঞ্চল এক-একটা আলাদা দেশ। পৃথিবীর এক-একটা দেশের অধিবাসী তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই শহরের এক-একটা অংশে হাজির হয়। একটি বিশেষ অংশে পৃথিবীর সব দেশ-ই হাজির। সেই অংশটা ইস্ট নদীর ধারে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের এলাকা। পৃথিবীর ১৬০টা দেশের প্রতিনিধিই এখানে নিয়মিতভাবে উপস্থিত।

মাত্র তিন ডলারের বিনিময়ে গাইড ঘুরিয়ে দেখাবে গোটা বাড়িটা। আর, দেখার জিনিসও প্রচুর। একরাশ বিস্ময় নিয়ে একটা ঘড়ি দেখছিলাম। হিরোশিমায় অ্যাটমবোমা পড়ার সময় যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম সাধারণ পরিষদ আর নিরাপত্তা পরিষদ। কত আন্তর্জাতিক ঘটনা ও নাটক যে এসব জায়গায় ঘটে ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাঁটতে-হাঁটতে পেরিয়ে এলাম কাছের সুভেনিরের দোকানটায়। যদি রেখে দেওয়া যায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোনও স্মৃতিচিহ্ন।

সুভেনিরের দোকানটায় তখন দাঁড়িয়ে এক জাপানি ভদ্রলোক। একটা-দুটো নয়, পঁচিশটা চাবির রিং তিনি অনায়াসে কিনে ফেলেন। এক-একটা রিঙের দাম পাঁচ ডলার। আর আমি ? শস্তা একটি টি-শার্ট ছাড়া আর কোনও সুভেনির নেওয়ার সামর্থ্য ছিল না।

ওখানে হাঁটছিলাম একটা জায়গা দিয়ে। যেখানে উড়ছে পৃথিবীর সব দেশের জাতীয় পতাকা। খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় পেলাম তাকে। মৃদু বাতাসে পতপত করে উড়ছে তিনরঙা সে। নিজের দেশের জাতীয় পতাকাকে দেখে বেশ গর্বিত ও আনন্দিতভাবে আবার হাঁটা শুরু করলাম।

ছুটি ফুরিয়ে আসছে। টান ধরেছে পকেটে। সপ্তাহশেষের এক বিষণ্ণ সকালে আবার হাঁটা দিলাম সেই গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে। ক্যামেরাতে ফিল্ম একেবারেই নিঃশেষ, মানিব্যাগে টাকাও প্রায় নেই। এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে নিউ ইয়র্ক আর যা-ই হোক, অন্তত গরিবদের শহর নয়। তবে সময় কেটেছে চমৎকারভাবে। এখন অবশ্য, সেই অ্যামট্রাক স্পেশাল ট্রেন ধরে বস্টনে ফিরে যাওয়ার সময়। বস্টন থেকে এয়ার-ইণ্ডিয়ার ফ্লাইট ধরার সময়ও এগিয়ে আসছে বড় তাড়াতাড়ি।

সেন্ট্রাল পার্কের সুন্দর পরিবেশে নিজেকে নিয়ে কিছুটা সময় কাটানো যায়

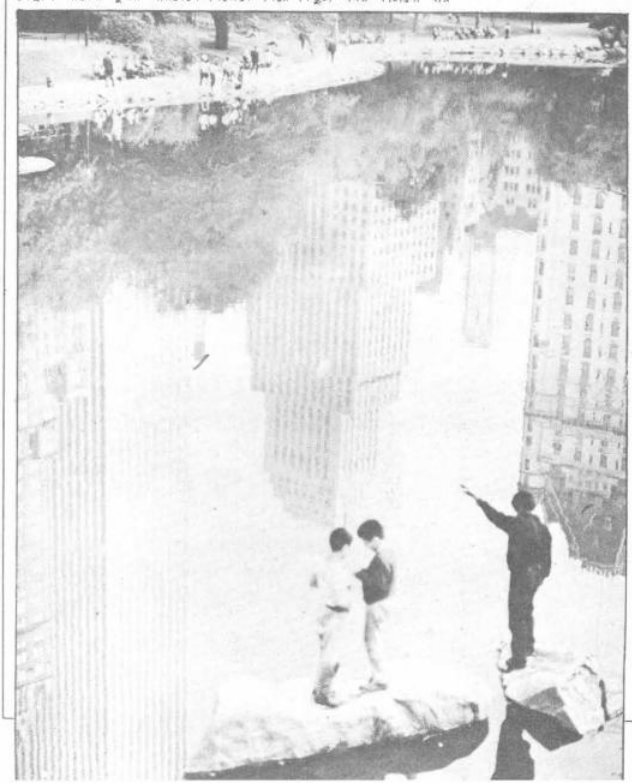

দিগ্‌দর্শন থেকে রামধনু

সিদ্ধার্থ ঘোষ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-কে প্রথম পাতায় ছেপে 'বালক'-এর প্রথম সংখ্যা বেরোল ১৮৮৫-তে। সম্পাদক জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। গল্প কবিতা প্রবন্ধ ও গান ইত্যাদি নিয়ে প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের ছ'টি লেখা ছাপা হয়। এবং এক বছরে ঊনসত্তরটি লেখা! 'বালক'-কে একা রবীন্দ্রনাথই মাতিয়ে রেখেছিলেন। 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এখানে, পালা করে এক-এক সংখ্যায় 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' নামে দাদু ও নাতির মধ্যে চিঠিচাপাটির আকারে নতুন কায়দায় প্রবন্ধমালা এবং দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ক্রমান্বয়ে ইংরেজি 'শারাড' নাটকের আদর্শে হেঁয়ালি-নাট্য পরিবেশন করেছেন তিনি।

বাংলায় হেঁয়ালি-নাট্যের চল ছিল না, তাই প্রথমেই রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল, "মনে কর 'পাগোল' শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তারপর উপস্থিতমত মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে ; সেই নাটকের মধ্যে কোন স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল।"

'বালক'-এর জন্য তিনি 'হাসপাতাল', 'ডানপিটে', 'মারপিট' 'আগুন', 'বাগান' 'আদায়' ইত্যাদি শব্দ নিয়ে হেঁয়ালি-নাট্য লিখেছিলেন।

বালক-এর পাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পাদকের দারুণ একচোট লাঠালাঠি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সংখ্যাতেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'ব্যায়াম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি অভিযোগ করেন, বাঙালিরা শুধুই পড়ার বই মুখে দিয়ে পরীক্ষা-পাশ নিয়ে ব্যস্ত, শারীরচর্চা ও স্বাস্থ্যের দিকে কোনও নজর নেই তাদের। ইউরোপ আমেরিকার তরুণ বয়স্কদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি সমালোচনা করেছিলেন এই আচরণের। প্রবন্ধের শেষে ছিল লাঠি নিয়ে নানা ধরনের ব্যায়াম শিক্ষার উপদেশ। এরই উত্তরে পরের সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'লাঠির উপর লাঠি'। বিদেশীদের সঙ্গে কেন আমাদের তুলনা করা উচিত নয়, তার জন্য যুক্তি তিনি পেশ করেছিলেন। প্রথমে শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল, এ-দেশের ছেলেরা দরিদ্র বলেই চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াশোনায় প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, বিদেশী ভাষার মাধ্যমেই নিতে হয় তাদের পাঠ। রবীন্দ্রনাথের মিঠে-কড়া সমালোচনা তাঁর ভাষাতে না পড়লে কিছুই বোঝা যায় না :

ছাত্রেরা যে খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে, তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। জ্যামিতি বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া তাহারা কিছু নিতান্তই আত্মহত্যা করিতে বসে নাই। আসল

কথা এই যে, আমরা নিতান্ত গরীব, আমরা যে কত গরীব সম্পাদক মহাশয়ের বোধ করি তাহা ধারণা নাই। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি ঠিক কল্পনা করিতে পারেন না যে তাঁহার বালকের দু টাকা মূল্য দিবার সময় আমাদিগকে কত ভাবিতে হয়। আমি যে কাগজ খানায় লিখিতেছি তাহাতে তাঁহারা [বিদেশীরা] জুতাও মোড়েন না। যে কলমটায় লিখিতেছি তাহা তাঁহাদের কান চুলকাইবারও অযোগ্য।"

এই প্রসঙ্গেই পরের ভাষায় বিদ্যাশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায় :

পড়াশুনা সম্বন্ধেও ইয়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন করে, আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন করি। বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত জ্ঞান। মাতার ভাষা আমরা স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা করি। মাতৃ দুগ্ধের সহিত তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তাহা আমরা আকর্ষণ করি। সে ভাষা আমাদের আদরের ভাষা, প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ভাষা, সে ভাষা আমাদের মা-বাপের ভাষা, আমাদের ভাইবোনের ভাষা, আমাদের খেলাধূলার ভাষা। আর বিমাতৃভাষা আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল, নাক চোক জলে ভাসিয়া যায়।

"হি ইজ আপ"—তিনি হন উপরে, "আই গেট ডাউন"- আমি পাই নীচে—ইহা মুখস্ত করিতে করিতে কোন্ বাঙ্গালীর ছেলের না রক্ত জল হইয়া যায়। ভাষা নামক কেবল একটা যন্ত্র আয়ত্ত করিতে গিয়াই আমাদের হাড়গোড় সেই যন্ত্রের তলে পিষিয়া যায়। ইংরাজের কি সে অসুবিধা আছে? যে শৈশবকাল স্নেহের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়, সেই শৈশবে বিদেশী চালকড়াইভাঙা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিতে হয়। তবুও যদি পাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, জ্ঞানের প্রতি অরুচি না হয়, তবে সে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মাথার উপরে দারিদ্র্যের বোঝা, সম্মুখে বিদেশীয় ভাষার দুর্গম পর্ব্বত, তাড়াতাড়ি করিয়া পার হইতে হইবে। সতা সতাই আমাদের লাঠি ঘুরাইবার সময় নাই।...

এর উত্তরে সম্পাদক আবার কলম ধরেছিলেন, কিন্তু, খুব সুবিধে করতে পারেননি।

প্রথম সংখ্যা থেকেই বালক-এ আর একটি নতুনত্বের আকর্ষণ ছিল। প্রতিভা দেবীর 'সহজে গান শিক্ষা' ও 'গান অভ্যাস'। প্রতি সংখ্যায় থাকত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক গানের স্বরলিপি। তার মধ্যে বেশ কিছু রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'কালমৃগয়া'র গানেরও স্বরলিপি ছাপা হয়েছিল। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বন্দে মাতরং'-এর প্রথম ছ'টি পঙক্তির স্বরলিপি প্রকাশ (রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি)।

'বালক' জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছিল শিশুসাহিত্য রচনায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন 'মুখচেনা', মুখের চেহারার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা শর্টহ্যান্ড পদ্ধতির প্রবর্তক, তিনি লিখেছিলেন 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'। গদ্যে নয় পদ্যে, যাতে সূত্রগুলি সহজে মনে রাখা যায়। সুধীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী ও বলেন্দ্রনাথ—এঁরা সকলেই হাত পাকিয়েছিলেন বালক -এ।

বালক বের হওয়ার দু' বছর পরে সুকুমার রায়ের জন্ম। কিন্তু ছোটবেলায় তাঁর হাতে যে বালক-এর পুরনো সংখ্যা এসেছিল, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বালক-এর প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল বালক হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট্ট একটি কাহিনী 'বারো আনা ও ষোল আনা'। নদী পার হওয়ার সময় পণ্ডিতমশাই একের পর এক প্রশ্ন করছেন মাঝিকে। অঙ্ক কষা কাকে বলে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে নৌচালনা বিদ্যার কী সম্পর্ক ইত্যাদি কিছুই জানে না বেচারা মাঝি। তার বোকার মতো একটা করে উত্তর শুনছেন পণ্ডিত চার আনা, আট আনা করে শেষ পর্যন্ত তার জীবনের বারো আনাই মাটি করে ফেলেছেন যখন, হঠাৎ উঠল ঝড়। এবার মাঝির প্রশ্ন করার পালা। বোঝা গেল, পণ্ডিত সব জানেন শুধু সাঁতারটা ছাড়া। বহু বছর পরে সুকুমার লিখেছিলেন 'জীবনের হিসাব' কবিতাটি। এই গল্পেরই প্রায় আক্ষরিক পদ্যরূপ :

বিদেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে,
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস,
সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে,
জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মরলি রে তুই ঘাঁটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে
চারি-আনাই মাটি!"

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা দার্জিলিঙের দু-তিনটি ছবি বাদ দিলে বালক-এর যাবতীয় ছবি এঁকেছিলেন হরিশচন্দ্র হালদার এবং পাথর কেটে তার লিথোগ্রাফও তিনি তৈরি করতেন। 'রাজর্ষি', 'মুখচেনা' এবং কিছু গান ও কবিতার সুন্দর ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন তিনি।

বালক-এর বিষয়বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব সত্ত্বেও সেটি সখা ও সাথী-র মতো কিশোরদের তুলনায় বরং বয়স্ক পাঠকদেরই বেশি আকৃষ্ট করেছিল। সম্ভবত সেটা বুঝতে পেরেই এক বছর পরে পত্রিকাটিকে প্রাপ্তবয়স্কদের 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করে নতুন নাম দেওয়া হয় 'ভারতী ও বালক'।

সখা ও সখা ও সাথী-র পথ ধরে এর পরে যে পত্রিকাটি ছেলেমেয়েদের মাতিয়ে তুলল তার নাম 'মুকুল'।

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত এই পত্রিকার জন্য বাংলা সাহিত্যের সেরা লেখকরা অনেকেই লিখতে শুরু করেন— রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। ৮-৯ থেকে ১৬-১৭ বছরের বালক-বালিকাদের উপযোগী এই পত্রিকা সহজ ও সরস পরিবেশনের গুণে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। আট বছরের শিশু সুকুমার রায় চৌধুরীর কবিতা 'নদী', মুকুল-এর পাতায় ছাপা হয়।

মুকুল-এর পরে যে পত্রিকাটি ছোটদের রাজ্যে তোলপাড় ফেলে দিল, তার নাম 'সন্দেশ'। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সন্দেশ-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই তার পড়ুয়া, এমন এক খুদে পাঠকের চোখে কেমন লেগেছিল কাগজটি, জানতে পারলে সেটা নিশ্চয় আজকে বসে তাকে যাচাই করার চেয়ে বেশি মূল্যবান হবে। তা ছাড়া এই পাঠকটি পরবর্তীকালে নিজেও ছড়া, কবিতা আর গল্প লিখে শিশু ও কিশোরদের মন ভরিয়েছিলেন। সুনির্মল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন :

...সন্দেশের মধ্যে ডুবে গেলাম। আরে এতো অদ্ভুত বইয়ের কথা তো ধারণাই করতে পারি না, —কী সুন্দর ছবি, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, আমায় যেন এক নতুন রাজ্যে নিয়ে গেল।... প্রতি সংখ্যার প্রথমেই রঙীন ছবি আর ভিতরে গল্পের সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে সব মজার মজার টুকরো ছবি। প্রতি ছবির ভিতর শিল্পীর নাম U.R. লেখা। ইনি যে উপেন্দ্রকিশোর রায় তা আর বুঝতে দেরী হোল না...আমাদের লোক ভোরবেলা ডাকঘরে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসত, যদি পয়লা তারিখে তার হাতে 'সন্দেশ' না দেখতাম, মুখ শুকিয়ে যেত, সমস্ত দিনটাই যেন মাটি হয়ে যেত।...'সন্দেশ' নিয়ে মেতে উঠলাম। বিজ্ঞাপনের প্রথম পাতা

থেকে মলাটের শেষ পাতা পর্যন্ত আকুল আগ্রহে পড়ি। মনে পড়ে মলাটের শেষ পাতায় গন্ধ-দ্রব্য বিক্রেতা 'এইচ বসুর' ছবিওলা বিজ্ঞাপন। একজন লোক রুমাল নেড়ে বলছে, "বহুৎ আচ্ছা দিল্‌খোস্ হো গিয়া—" কিংবা একটি ছোট মেয়ে জলে নৌকা ভাসিয়ে যাচ্ছে, উপরে লেখা 'মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে' ইত্যাদি।...আর ভিতরে? সে তো অনির্বচনীয় অমৃতের পরিবেশন ও পরিবেশ। কত নাম করব, অবনীন্দ্রনাথ, প্রিয়ম্বদা দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও—আরো কত নাম এখনও স্মৃতির গুহায় হীরা মাণিক্যের মতো চক্‌চক করছে। আর একজন প্রতি মাসে লিখতেন 'বনের খবর' ছদ্মনাম দিয়ে, তাতে থাকত U.R.-এর ছবি। কী ভালোই যে লাগত। লুসাই পাহাড়ের কাছে বেণী চাকরের লোটা ফেলে ছুট্ দেওয়া, বালটির জলে ঘটিসুদ্ধ বরফ হয়ে জমে যাওয়া, হাতীর বাচ্চার শুঁড় ধরে টানাটানি—U.R.-এর এ সব ছবির কথা এখনও মনে পড়ে—তার সঙ্গে লেখারই কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী আমরা উপভোগ করেছি।

...'সন্দেশের' আর একটি প্রবল আকর্ষণ ছিল। কে একজন বেনামে 'সন্দেশে' মজার গল্প কবিতা লিখতেন। এত সুন্দর লেখা যে কার আমরা বুঝতে পারতাম না। পাগলা দাশু, চালিয়াৎ, যগিদাসের মামা প্রভৃতি সুন্দর গল্প আর বোম্বাগড়ের রাজা, দাঁড়ে-দাঁড়ে দ্রুম, গানের গুঁতো, গোঁফ চুরি, নারদ নারদ, সৎপাত্র, রামগরুড়ের ছানা প্রভৃতি সচিত্র কবিতাগুলি যে কার মাথা থেকে বার হচ্ছে আমরা বন্ধুরা অনেক আলোচনা করেও তা স্থির করতে পারতাম না। ...আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কে একজন বললে, রবিঠাকুর ঐ সব গল্প কবিতা লেখে আমি জানি। কেউ বলে—U.R. নামে ঐ আর্টিস্টেরই ঐ সব লেখা...একদিন আমাদের বন্ধু মুলু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে) আমাদের সব রহস্যের উদ্ঘাটন করল। সে বললে, "এসব লেখা তাতাদার।" তাতাদা হচ্ছেন উপেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে সুকুমার রায়। এইবার সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ সব লেখার মধ্যে মজার মজার ছবি থাকত, তাতে সই থাকত S. Ray; এইবার বুঝলাম ছবিগুলিও সুকুমারবাবুর আঁকা।

সুনির্মল বসুর স্মৃতিকথা 'জীবনখাতার কয়েক পাতা'-য় বারবার এসেছে সন্দেশ-এর কথা, উপেন্দ্রকিশোরের কথা, তাঁর মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে সুকুমারের সন্দেশ-সম্পাদক হওয়ার প্রসঙ্গ। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "সন্দেশ'ই আমার চোখ ফোটালো, আমাকে সাহিত্যের প্রেরণা দিল, নতুন পথের সন্ধান দিল।" আবার আর-এক

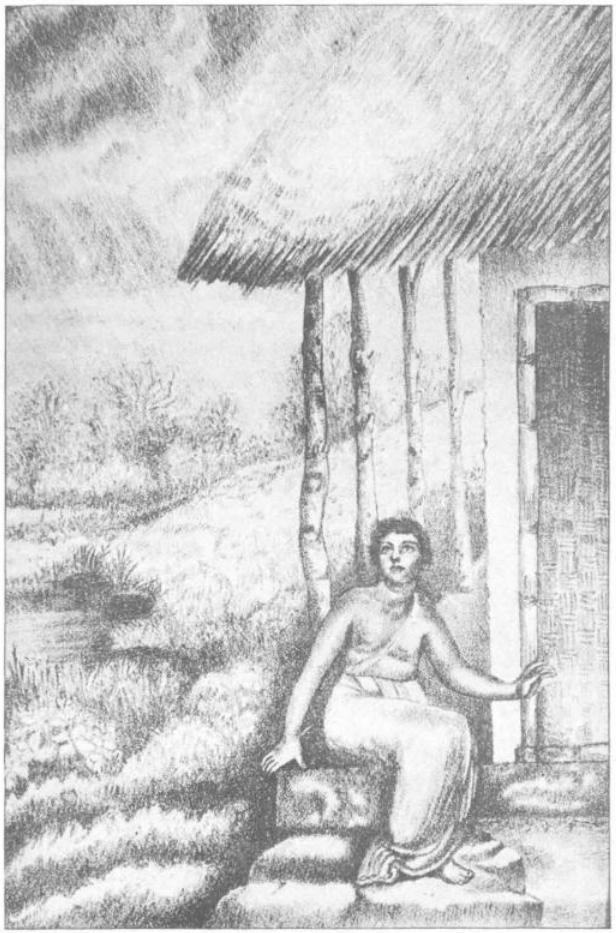

'মুকুট'-এর ইলাসট্রেশন। শিল্পী: হরিশচন্দ্র হালদার

জায়গায়, "আমার জীবনে 'সন্দেশ' যে কতখানি স্থান জুড়ে আছে তা আর বলবার নয়।"

শুধু সুনির্মল বসু নয়, শিশুসাহিত্যও নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কতখানি আজও জুড়ে রয়েছে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের সন্দেশ, তার হদিস মেলা ভার।

সন্দেশ প্রথম প্রকাশের সাত বছর পরে 'মৌচাক'-এর আবির্ভাব। বিখ্যাত প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়েছিল মৌচাক। সন্দেশ-এর কথা বাদ দিলে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, শিশু সাহিত্যিক ও প্রতিভাধর নবীন লেখকদের এমন সমাবেশ এখনও অবধি আর কোথাও ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। প্রথম পাতাতেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। সেই সংখ্যা থেকেই শুরু অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আঙলা'র ধারাবাহিক প্রকাশ। জয়ন্ত-মানিক ও বিমল-কুমারের স্রষ্টা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা গোয়েন্দা ও ভূতের গল্প ছিল মৌচাকের অন্যতম আকর্ষণ। সেরা বাংলা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'ও মৌচাকেই বেরিয়েছিল।

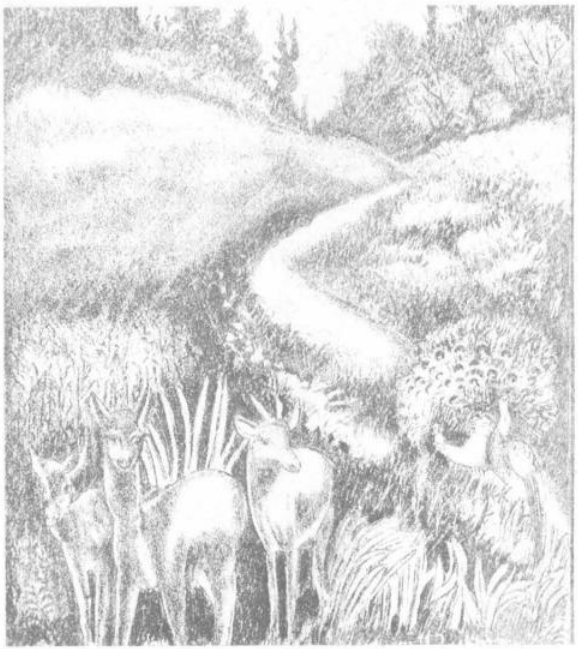

রবীন্দ্রনাথের গান 'রিমঝিম ঘন ঘনরে বরষে'-র ইলাসট্রেশন। শিল্পী : হরিশচন্দ্র হালদার

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চরণিক', যাযাবরের 'ঝিলম নদীর তীরে', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'লাল কুঠি', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভূতের গল্প', সুনির্মল বসুর গল্প ও কবিতা, কত নাম করব ? তাও তো বাদ পড়ে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, দীনেন্দ্রকুমার রায়, কুলদারঞ্জন রায়, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বিশেষ করে শিবরাম চক্রবর্তী। শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প ছাড়া মৌচাক-এর কথা চিন্তাও করা যায় না।

মৌচাক প্রসঙ্গে আর-একটি কথা জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না। সত্যজিৎ রায় তখনও সিনেমা-পরিচালক হননি, শঙ্কু বা ফেলুদার গল্প লেখা তো দূরের কথা, কিন্তু মৌচাকের পাতাতেই ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম 'ইলাস্ট্রেশন' প্রকাশিত হয়েছিল। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'এ্যাটাচি কেস'-এর জন্য একটি ছবি। অবশ্য তার আগে ১৯৪০-এ 'পাগলা দাশু'-র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদটি তিনি এঁকেছিলেন।

মৌচাকের সঙ্গে একে একে যুক্ত হয়ে 'শিশুসাথী' (১৯২২), 'খোকাখুকু' (১৯২৩), 'মাস-পয়লা' (১৯২৯), 'রংমশাল' (১৯৩৭), 'জলছবি' (১৯৩৭) ও 'ভাইবোন' (১৯৩৭) ইত্যাদি পত্রিকা বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ধারাকে ক্রমেই আরও জোরালো করে তোলে। এই পর্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম বাদ পড়েছে। 'রামধনু' পত্রিকার কথা আলাদাভাবে বলতে হবে। কারণ, রামধনু-ই প্রাচীনতম পত্রিকা যা অনিয়মিতভাবে হলেও এখনও প্রকাশিত হয়। (সন্দেশ'ও বেরোচ্ছে কিন্তু এখন তার নবপর্যায়)। ১৯২৭-এ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রথম বেরিয়েছিল রামধনু। কিন্তু রামধনু-র প্রাণ ছিলেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের পুত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যিনি এই পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক। মনোরঞ্জনবাবুর গোয়েন্দা 'হুকাকাশি'-র দাপট বাংলা সাহিত্যে আজও মলিন হয়নি। সেইসঙ্গে এ-কথাও বলা দরকার, পৌরাণিক চরিত্রদের নিয়ে 'নূতন পুরাণ' নামে বইটির মতো মজার গল্পের সঙ্কলন আজও দুর্লভ। মনোরঞ্জনবাবুর অকালমৃত্যুর পর থেকে তাঁর ছোট ভাই সায়েন্স ফিকশন ও বিজ্ঞানের নিবন্ধ লেখক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য আজও হাল ধরে আছেন রামধনুর।

রামধনু অবধি যত পত্রিকার কথা লেখা হল, বাদ থেকে গেল তার থেকে অনেক বেশি। সত্যি বলতে পুরনো পত্রিকার কথা লেখার সময়ে কীভাবে কালে কালে ছাপার হরফ পরিবর্তিত হল, পরিবর্তন এল ভাষায়, এমনকী মুদ্রাযন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, হাতে টিপে ছাপ তোলা থেকে লেটার প্রেস মেশিন বা আধুনিক অফসেট পদ্ধতি ও ফোটো-টাইপ সেটিং কীভাবে পত্রিকার রূপ বদলে দিয়েছে— এ সবই বিবেচনা করা যেতে পারে। ছোটদের কাগজে ছবির একটা আলাদা টান। সেখানেও প্রতিচ্ছবি ছাপার নিত্য নতুন পদ্ধতির সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পী নতুন কায়দায় ছবি এঁকেছেন। বাঙালিদের মধ্যে প্রাচীনকালে কাঠখোদাই করে ছবি ছাপার যুগে সবচেয়ে নাম করেছিলেন প্রিয়গোপাল দাস (পি· জি·) ও ত্রৈলোক্যনাথ দেব।

সখা ও সাথী ও মুকুল পত্রিকার নিয়মিত শিল্পী পি· জি·। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও-র তৈরি করা কিছু মনীষীর লিথো-চিত্র ছাপা হয়েছিল সাথী-তে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র জন্য আঁকা গ্রন্থকারের ছবিগুলোর কাঠের ব্লকও তিনি তৈরি করেন। কাঠখোদাইয়ের পর লিথোগ্রাফির প্রচলন হয়। বালক পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে বহু লিথো ছবি এঁকেছিলেন হরিশচন্দ্র হালদার। তারপর 'হাফটোন' ছবির যুগ। উপেন্দ্রকিশোর শুধু এই যুগের প্রথম বড় শিল্পীই নন, হাফটোন পদ্ধতিতে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির কারিগরি গবেষণার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। সন্দেশ-এর সেরা অবদান শুধু উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের অসাধারণ ও অদ্ভুত রসের লেখা ছাপা নয়, হাফটোন ছবি ভরা সচিত্র পত্রিকার যে-আদর্শ তাঁরা তৈরি করেছিলেন, তারই ফলে পি· ঘোষ, ফণী গুপ্ত, পূর্ণ চক্রবর্তী, চারু রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ অনেককেই পেয়েছি আমরা। যতীন সেনের ছবি ছাড়া যেমন পরশুরামের গল্পের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনই 'ঘনাদা' বলতেই অজিত গুপ্তর আঁকা মুখটিই প্রথম মনে পড়ে। জয়ন্ত-মানিক ও আরও অনেক গোয়েন্দার কাজ অনেকটা হাসিল করেছেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার শিবরামের 'আমি' ও বিনি বা হর্ষবর্ধন কি গোবর্ধনের যে কী হাল হত শৈল চক্রবর্তীর কাজ দেখতে না পেলে বোঝাই যায় না। (সমাপ্ত)

রোভার্সের রয়

রয় আর জিমি স্লেড যৌথভাবে দারুণ একটা ক্যাচ নিল !

কিন্তু…
ফুল টস ! যেমন বল তেমন মার !
র‍্যালফ কারমোডি হাঁকড়ে বাউণ্ডারি পার করে দিল !
এবং আবার ! ক্যাভেলিয়ার্সের অধিনায়ক হাত খুলে মারছে !
হাত জমে গেলে ও একাই খেলা জিতিয়ে দেবে…
কিন্তু রয়ের তৃতীয় বল হঠাৎ নিচু হয়ে এল এবং…
আহ !
বোল্ড ! দারুণ বল, রয় !
চমৎকার ইয়র্কার !
রয়, মনে হচ্ছে ও যাতে সতর্কতা বিসর্জন দেয় তাই প্রথম দুটি চার উপহার দিয়েছিলে !
আর তাতে কাজ হয়েছে ! শটটা কারমোডির মতোই নয়…
দুই ওভার বাদে, স্টিভ নেলোরের মারাত্মক বল…
মনজিৎ আউট… লেগ বিফোর উইকেট !
হাউজ্যাট ?
ক্যাভেলিয়ার্স তিন উইকেটে সাতাত্তর !
ভ্রাম্যমাণ দল জয়ের থেকে ৭৮ রান দূরে…
এবার আসছে ধ্বংসের প্রধান নায়ক র‍্যালফ মিকার
নোয়েল, ওর নিজের দাওয়াই ওকে একটু ফিরিয়ে দাও !
মিকার রোভার্সকে ব্যঙ্গ করেছিল…তবে নোয়েল ব্যাক্সটার ওর যোগ্য প্রতিপক্ষ !
ক্যাভেলিয়াররা নিশ্চয় ভয় পেয়েছে, র‍্যালফি… তোমাকে এত আগে পাঠাল !
পিছিয়ে দাঁড়াও বলছি, নইলে বল মেরে তোমার দেঁতো হাসি ঘুচিয়ে দেব !
নোয়েলের মন্তব্যে মিকারের ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া !
কেমন !
রয় ! সামলে !
কিন্তু বল এত জোরে যাচ্ছিল !
আহহহহ
ও সরতে পারেনি ! পায়ের নলিতে বল লেগেছে !
আর-একটা জখম ! গুরুতর হলে রোভার্স বিপদে পড়বে !
ক্রমশ
রেসির জখম কি সত্যিই গুরুতর ? আগামী সংখ্যায় জানা যাবে !

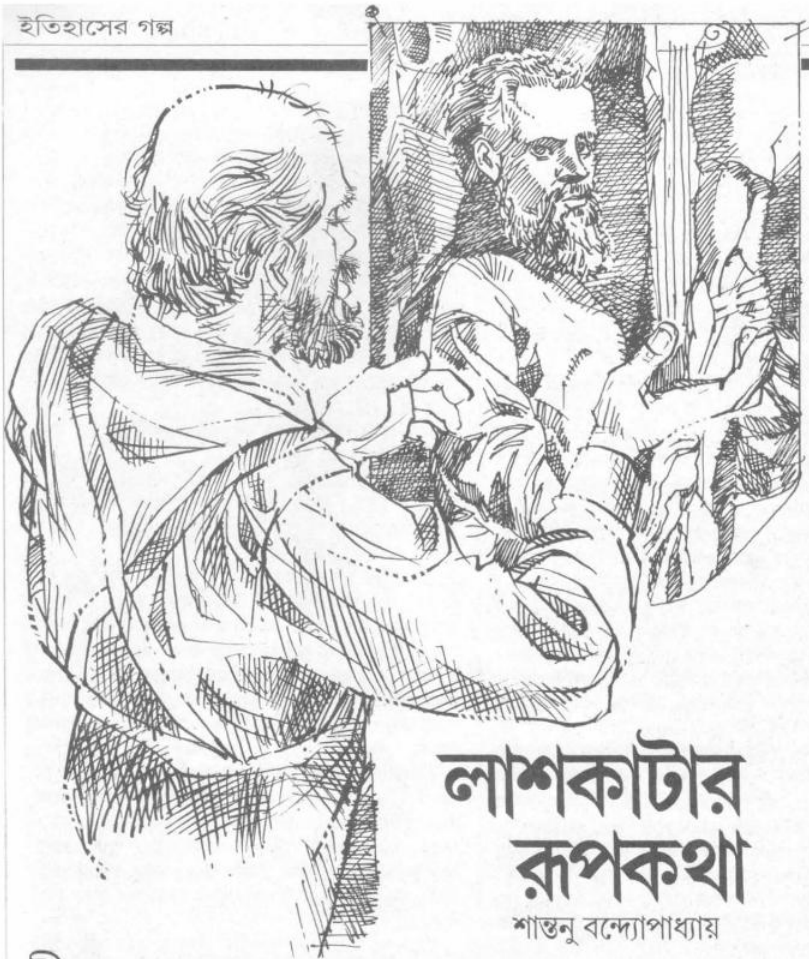

লাশকাটার রূপকথা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতটা এবার একটু বেশিই পড়েছে। সারা এডিনবরা যেন হিহি করে কাঁপছে। দরজা-জানলা সব বন্ধ করে ডাঃ নকস ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন।

ডাঃ রবার্ট নকস। ইউরোপের একনম্বর শারীরস্থানবিদ। ক'দিন ধরেই কী যেন একটা চিন্তা তাঁকে কুরে-কুরে খাচ্ছে।

ডাঃ নকসের গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস নকস জিজ্ঞেস করলেন, "কী নিয়ে তুমি এত আকুল বলো তো?"

"শোনোনি?" ডাঃ নকস বললেন, "সার্জেন স্কোয়ারে অ্যানাটমির আরও কয়েকটি নতুন স্কুল খুলেছে।"

"খুলুক না। ছাত্র পড়ানোর প্রতিযোগিতায় ওরা কেউই তোমায় হারাতে পারবে না।"

"জানি। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠার জন্যে যা সবচেয়ে বেশি করে পাওয়া দরকার, তা যে বড় বিষম বস্তু!"

"কী সেই বস্তু?"

"মানুষের শব!"

"বলো কী!" কথাটা কানে ঢুকতেই মিসেস নকস যেন আঁতকে উঠলেন।

"তার উপায় অবশ্য একটা খুঁজে পেয়েছি আমি।" ডাঃ নকস কথাটা শেষ করবার আগেই ডোর-বেল বেজে উঠল।

"কে?" মিসেস নকস দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু এ কী! দরজা দিয়ে উঁকি মেরেই তিনি চমকে উঠলেন। এ যে একদল গুণ্ডা।

"ওদের আসতে দাও।" ডাঃ নকসের কথা কানে পৌঁছতেই মিসেস নকস সরে দাঁড়ালেন।

ডাঃ নকস। এক অদ্ভুত মানুষ! সেই কবে থেকে স্বপ্ন দেখছেন, ইউরোপের সেরা শারীরস্থানবিদ হবেন। আন্ড্রিয়াস ভেসালিয়াসের মতো জগদ্বিখ্যাত হবেন।

বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরের এক গরিব ওষুধ-বিক্রেতার ছেলে আন্ড্রিয়াস ভেসালিয়াস। শুধু জানবার আগ্রহেই তিনি একদিন বাড়ি

থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুদূর প্যারিসে। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। কিন্তু প্যারিসে পৌঁছে তিনি হতবাক হয়েছিলেন। সেখানেও তখন অ্যানাটমি শেখানোর নামে চলছিল বুজরুকি। বানর আর শুয়োর কেটে শেখানো হচ্ছিল অ্যানাটমি। ব্রাসেলসের মতোই সেখানেও তখন মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করার শাস্তি ছিল ফাঁসি! তা হলে কি অন্য কোনও উপায় নেই? ভাবতে-ভাবতে আন্ড্রিয়াস শুরু করেছিলেন রাতের অন্ধকারে মাটির তলা থেকে নিত্যনতুন কফিন বার করে মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা। নিস্তব্ধ রাত্রে মোমের আলোয় তাঁর সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি রচনা করেছিলেন অ্যানাটমির প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থটি। আন্ড্রিয়াস বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের প্রকৃত অ্যানাটমিকে না জানতে পারলে রোগব্যাধির চরিত্রনির্ণয় সম্ভব নয়। সম্ভব নয় মানুষের রোগমুক্তি ঘটানো এবং বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির সৃষ্টি করা।

আন্ড্রিয়াস-এর পর কেটে গিয়েছে আরও চারশো বছর। অথচ আজও তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হল না। মানুষের অ্যানাটমি আজও রয়ে গিয়েছে তেমনই অজ্ঞাত। ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলিতে অ্যানাটমি শিক্ষার প্রতি আজও কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। অথচ এ-দেশের ছাত্ররাও এখন মানুষের অ্যানাটমি শেখার জন্য যেন পাগল! তারাও যে বুঝে গেছে, অ্যানাটমি জানা নেই বলেই রোগের প্রকৃত কারণ এবং তার চিকিৎসা আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

হ্যাঁ, ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলি তখনও চলছিল সেই পুরনো নিয়মেই। সেখানে শব-ব্যবচ্ছেদ করা হত কোনও অজ্ঞাত কারণে কারও মৃত্যু হলে। কিন্তু তেমন রোগী তো জুটত কালেভদ্রে! তাই দেশজুড়ে হঠাৎ চিকিৎসকরা একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ওই আইনের বিরুদ্ধে। তখন তাঁদের থামাতে গির্জা অ্যানাটমি শিক্ষা বিষয়ক ওই নিয়মটিতে একটু ঢিলেও দিয়েছিল। বলেছিল, চিকিৎসকরা এবার ইচ্ছা করলে অ্যানাটমি শেখাবার জন্য প্রাইভেট স্কুল খুলতে পারেন। পারেন সেখানে মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদ করতেও। তবে তার জন্য অবশ্য তাদের খুঁজে নিতে হবে কোনও বেওয়ারিশ লাশ! এডিনবরায় ডাঃ নকসের স্কুলেই ছাত্রদের যত ভিড়। কিন্তু লাশ না পাওয়া গেলে তিনি সেই ভিড়কে ধরে রাখবেন কী করে? বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া নিয়ে এখন তো ওই স্কুলগুলির মধ্যেও চলবে তুমুল প্রতিযোগিতা! সেই চিন্তা মেটাতেই ডাঃ নকসের মাথায় এসেছে এক নতুন মতলব। আর তাই তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন ওই গুণ্ডাগুলোকে।

ডাঃ নকসকে দেখেই ছেলেগুলো থমকাল! মেরিলিস ওদের দলপতি।

"নিশ্চয় জানো কেন ডেকেছি তোমাদের?" ডাঃ নকস ওদের সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন।

"শোনো, আজ তোমাদের ডেকেছি একটা বিশেষ কারণে। কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে তোমাদের আর কোনও দুঃখ থাকবে না।"

"বলেন কী!" ডাঃ নকসের কথা শুনে ওদের চোখ লোভে চকচক করে উঠল। পাশের ঘরে মিসেস নকস তখন উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন স্বামীর কথা।

ডাঃ নকস এবার ড্রইংরুমের দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "তোমরা এবার চুরি-ছিনতাই ছেড়ে দাও। বদলে তোমরা বরং এ-পাড়ায় একটা সৎকার সমিতি খুলে ফেলো।"

"সৎকার সমিতি?"

"হ্যাঁ, সৎকার সমিতি। যা বলি, তা মন দিয়ে প্রথমে শোনো। নিশ্চয় জানো, আমার একটি অ্যানাটমির স্কুল আছে, যেখানে নিয়মিত শব-ব্যবচ্ছেদ করা হয়?"

"শুনেছি।"

"সেখানে তো প্রতিদিন শবদেহের দরকার। সেই শবদেহ এবার থেকে আমায় জোগাড় করে দেবে তোমরা।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"যখনই শুনবে কেউ মারা গেছে,যাকে সৎকার করার কেউ নেই, অমনি তোমরা গিয়ে দাঁড়াবে সেখানে। তারপর সেই সৎকার করার নামে মড়াটাকে সোজা চালান করে দেবে আমার স্কুলে। এক-একটা লাশের জন্যে তোমরা পাবে দশ পাউণ্ড। তা ছাড়া সৎকার সমিতির নামেও সাধারণের কাছ থেকে পাবে দেদার চাঁদা।" ডাঃ নকস ওদের ওপর স্থির দৃষ্টি মেললেন।

"এক-একটা লাশের জন্যে দশ পাউন্ড! আমরা রাজি সার", মেরিলিস উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল।

ডাঃ নকস সিগার ধরিয়ে বললেন, "কাজটা করতে হবে কিন্তু খুব সাবধানে। সার্জেন স্কোয়ারে হালফিল আরও অনেকগুলি অ্যানাটমির স্কুল গজিয়েছে। ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে পারবে না কিন্তু। শয়তানি কোরো না।"

ছেলেগুলো চলে যাওয়ার পর ডাঃ নকস দৃঢ় কণ্ঠে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "শুধু আমার স্কুলটিকে টিকিয়ে রাখার জন্যে নয়, মানুষের অ্যানাটমিকে নিশ্চিতভাবে জানাই এখন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের সব অসুখের প্রকৃত কারণ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।" ডাঃ নকস এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির সামনে। দৃঢ় প্রত্যয়ে ভরপুর একটি মুখ। আগুনের মতো উজ্জ্বল দুটি চোখ। আন্ড্রিয়াস ভেসালিয়াস। ওঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা!

মেরিলিসের হাতসাফাইয়ে ডাঃ নকসের স্কুল ক'দিনেই বেশ রমরমিয়ে উঠল। রোজই এখানে নতুন-নতুন শবদেহ আসছে। ছাত্ররা দরকারমতো ব্যবচ্ছেদ করছে। দেখতে-দেখতে ডাঃ নকসের স্কুলটি বেড়ে যেন একটি মেডিকেল কলেজ হয়ে দাঁড়াল। পাশাপাশি অন্য স্কুলগুলি চলতে লাগল টিমটিম করে। তারা তো কেউ বুঝেই উঠতে পারল না, ডাঃ নকস এত শবদেহ জোটাচ্ছেন কোথা থেকে, কীভাবে?

সারা দেশ জুড়ে শুরু হল গুঞ্জন! শবচুরির এমন হিড়িক পড়ল কেন? সকলের সন্দেহ গিয়ে পড়ল ওইসব-অ্যানাটমির স্কুলগুলির ওপরেই। জনতা তাই শুরু করল পুলিশ ফাঁড়ির ওপর হামলা।

এডিনবরা ক্রমেই হয়ে উঠল থমথমে। সবচেয়ে বেশি ভয় পেলেন বিদেশীরা। বিদেশী পর্যটকেরা এডিনবরার দিকে আসা প্রায় ছেড়েই দিলেন। কে জানে, তাঁদের শরীর যদি চালান হয়ে যায় ডাক্তারবাবুদের লাশকাটা ঘরে!

মিসেস নকস মাঝে-মাঝেই তাঁর স্বামীকে দু-কথা শুনিয়ে দিতেন। বলতেন, "তোমাদের জ্বালায় এডিনবরাটা শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল ইউরোপের কলঙ্ক!"

সে-কথা শুনে ডাঃ নকস কিন্তু রাগ করতেন না। বরং চেষ্টা করতেন কেন এই কাজ করছেন মিসেস নকসকে তা বোঝাতে। শোনাতেন চিকিৎসা-শাস্ত্রের যত পুরনো ইতিহাস! শুরুতে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা ছিল কুসংস্কারে ভরা! তখন প্রচলিত ছিল দু'রকমের চিকিৎসা-বিদ্যা।

এক, পাদ্রি বা পুরোহিত-চিকিৎসা, এবং, দুই, জাদুকরী-চিকিৎসা।

পাদ্রিরা বলতেন, মানুষের রোগ হয় ঈশ্বর কুপিত হলে। রোগ সারাতে তাঁরা তাই নানা দেবদেবীর উপাসনা করতেন। আর জাদুকরী-চিকিৎসকরা ভাবত, মানুষের রোগ হয় দেহে কোনও শয়তানের প্রবেশ ঘটলে। সেই শয়তানকে তাড়িয়ে রোগ সারাতে তাঁরা চালাতেন তাঁদের রোগীদের ওপর চরম অত্যাচার। যা সহ্য করতে না পেরে রোগীরা অনেকেই তখন মারা পড়ত। তারপর ইউরোপে সূচনা হল বিজ্ঞান-নির্ভর চিকিৎসার। যার পত্তন করেছিলেন গ্যালেন, অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিস! পরিণামে, পাদ্রি-ডাক্তাররা হয়ে পড়েছিলেন কোণঠাসা।

কিন্তু মানুষকে কি চিরকাল এমন অন্ধকারে আটকে রাখা সম্ভব! তাই ইউরোপে উঠেছিল রেনেসাঁসের ঝড়! অজানাকে জানতে দেশের মানুষ খেপে উঠেছিল। চিকিৎসাকে বিজ্ঞানের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তারা দাবি জানিয়েছিল মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করার অধিকার!

গির্জা তখন ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। নব্য চিকিৎসকদের ঠেকাতে হুকুমনামা জারি হয়েছিল। সেই হুকুমকে উপেক্ষা করেই তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যান্ড্রিয়াস ভেসালিয়াস।

অবশেষে বিজ্ঞানকে জানার নেশায় খ্রিস্টানদের মধ্যেও ধরেছিল ফাটল। দু' দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। এক, রোমান ক্যাথলিক, অর্থাৎ, গির্জা-সমর্থক, এবং, দুই, প্রোটেস্ট্যান্ট, অর্থাৎ গির্জা-বিরোধী।

একদিন সকালে সংবাদপত্রের ওপর চোখ রেখেই ডাঃ নকস ভুরু কোঁচকালেন। এ কী! গির্জার মনোনীত সৎকার সমিতি ছাড়া বেওয়ারিশ শব সৎকার করার আর কারও কোনও অধিকার থাকবে না? মেরিলিসের চক্র তো তা হলে এবার অকেজো হয়ে পড়বে। তা হলে উপায়! এদিকে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে-বাড়তে দাঁড়িয়েছে পাঁচশোর মতো। তাদের নিয়মিত শব -ব্যবচ্ছেদ করতে না দিতে পারলে তো ···

ডাঃ নকস আর ভাবতে পারলেন না। মিসেস নকস বললেন, "তোমরা বরং হাউস অব কমন্স-এর কাছে আবেদন করো। তোমাদের স্কুলগুলি চালাবার দায়িত্ব এবার বরং গির্জাই নিক।"

দেখতে-দেখতে ডাঃ নকসের স্কুলে শবের আমদানি সত্যিই বেশ কমে গেল।

একদিন সন্ধ্যায়, বাগানে বসে ডাঃ নকস তখন ওই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছেন ওঁর সহকারীর সঙ্গে। হাঁকপাঁক করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সমাধানের কোনও পথ···। এমন সময় ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন মাঝবয়েসী লোক। উইলিয়াম হেনরি আর উইলিয়াম বার্ক। ভয়ার্ত তাদের চোখ-মুখ।

"কী চাই?" ডাঃ নকস প্রশ্ন করলেন।

"শুনেছি, আপনারা নাকি শবদেহ কেনেন?"

"তা তোমরা কি শবদেহ বেচাকেনা করবে নাকি?" ডাঃ নকস হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, "তোমরা তো দেখছি শব কথাটা উচ্চারণ করতেই কাঁপছ!"

"ঠিক কথা। যদি অপরাধ না নেন তো বলি, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে বেচার মতো একটি শব রয়েছে।"

"কোথায়?"

"আজ্ঞে, এই হেয়ার-এর বাড়িতে।"

ডাঃ নকস মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবলেন। তারপর ওঁর সহকারীর কানে-কানে বললেন, "মনে হচ্ছে, এ-লোক দুটো স্পাই! এসেছে আমাদের ফাঁদে ফেলতে।"

সহকারী ভদ্রলোক কথাটা শুনেই নড়ে বসলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "তোমার বন্ধুর বাড়িতে শবদেহ কেন? তোমরা কি কাউকে খুন করেছ?"

"না হুজুর। আজ্ঞে, ও লোকটা ছিল হেয়ারের ভাড়াটে। একটা বুড়ো। আত্মীয়স্বজন তার কেউ নেই। আজ ভোরে সেই বুড়োটা হঠাৎ মারা গেছে···।"

ডাঃ নকস সব শুনেটুনে হাসলেন। ভাবলেন, গল্পটা ওরা মন্দ ফাঁদেনি। হাজার হোক স্পাই তো! ··· ডাঃ নকস একটু থেমে বললেন, "তোমরা তা হলে কোনও সৎকার সমিতিকে খবর দিলে না কেন?"

"দিতে পারি। কিন্তু আমাদের বড় টাকার প্রয়োজন। তাই এখন ক'দিন পেট চালাতে···।"

"আমার শবদেহের কোনও প্রয়োজন নেই। তোমরা যেতে পারো।" ডাঃ নকস ওদের সোজা হাঁকিয়ে দিলেন।

লোক দুটোকে বিদায় করেই, ডাঃ নকস ওঁর সহকারীকে বললেন, "যাও, চট করে মেরিলিসকে ডেকে আনো। আমি চাই মেরিলিসকে এক্ষুনি ওদের বাড়ি পাঠাতে। ও গিয়ে কোনও ছুতোয় দেখে আসুক ঘটনাটা সত্যি কি না! সত্যি হলে, ওদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বুড়োটাকে এক্ষুনি নিয়ে আসুক। স্কুলে এখন একটাও লাশ নেই!"

কথাটা শুনেই সহকারী ভদ্রলোক ছুটলেন মেরিলিসের খোঁজে।

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই মেরিলিস হাজির। মুখে একগাল হাসি। বলল, "সার, সুসংবাদ। বুড়োকে এনেছি।"

"সে কী! আমি তো ভেবেছিলুম লোক দুটো স্পাই।"

"আমিও তো! তারপর গিয়ে দেখি··· লোক দুটো ভীষণ গরিব। থাকে পাশাপাশি। দু'জনেরই কোনও ছেলেপিলে নেই। ওরা দুটোই তখনও বাড়ি ফেরেনি। বাড়িতে তখন রয়েছে ওদের বউরা। নেলি আর মার্গারেট। দু'জনেই বেশ চতুর।"

"তারপর?" ডাঃ নকস উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

"তারপর তো বুঝতেই পারছেন সার। এখন দয়া করে যদি আমার বখশিশটা মিটিয়ে দেন···।"

"না, না, আজ শুধু তোমাকেই বখশিশ দিলে হবে না। আমার ওদেরও কিছু দেওয়া উচিত। লোক দুটো বলছিল, ওরা নাকি দারুণ গরিব। তুমি বরং ওদেরও খবর পাঠাও। ওদের বলো, আজ বিকেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

এ কী! সন্ধেবেলা হেয়ার আর বার্ক ডাঃ নকসের চেম্বারে ঢুকেই তো থ! দেখে, ডাঃ নকসের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটা। যে কাল ওদের কাছে গিয়েছিল ঘরের খোঁজে!

ওদের দেখেই ডাঃ নকস বললেন, "আপনাদের ইচ্ছারই জয় হয়েছে। আপনাদের সেই বুড়োটিকে আমি কিনেই নিলুম।"

"সে কী!" ডাঃ নকসের কথা শুনে ওরা তো অবাক! বলল "তাকে তো ওই ভদ্রলোক সৎকার সমিতিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল!"

"হ্যাঁ। ও ওই রকমই সব করে বেড়ায়, বুঝলেন। যাক্‌গে, এই নিন ধরুন।" ডাঃ নকস ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন একতাড়া নোট।

একসঙ্গে অতগুলো পাউন্ড দেখে ওরা তো হাঁ!

"নিন,ধরুন! অমন অবাক হচ্ছেন কেন? কাল তো আপনারা ওই বুড়োটাকে বেচতেই এসেছিলেন? তবে কথাটা কিন্তু আপনারা গোপন রাখবেন। শুনেছেন নিশ্চয়, আমাদের লাশ সংগ্রহ করা নিয়ে

দেশে এখন কেমন হইচই চলছে ? তাই এ-কেসে একবার জড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না কিন্তু।"

ওদের বিদায় দিয়ে ডাঃ নকস চোখ ফেরালেন মেরিলিসের দিকে। বললেন, "তুমি তো ফিরে যাবে ফের চুরি-ছিনতাইয়ে। এখন মুশকিল হল আমার। জানি না আমার স্কুলটা এখন চলবে কীভাবে !"

"আমার মাথায় একটা নতুন মতলব এসেছে।" মাথা চুলকে বলল মেরিলিস।

"কী মতলব শুনি ?"

"পরে বলব সার।"

নিউইংটন-এ ডাঃ নকসের স্কুল থেকে এডিনবরার মুচিশাহির দূরত্ব ক্রোশখানেক। এখানেই হেয়ার আর বার্ক থাকে। মুচিশাহির দিকে এ-শহরের লোকজন বড় যায় না কেউ। ওখানে বাসিন্দা বলতে ওই ক' ঘর। ওদিকটায় এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। বিকেল ফুরোলেই ওদিকটা ডুবে যায় গভীর অন্ধকারে।

মুচিশাহির লোকগুলো যেমন গরিব, তেমনই নোংরা। ওরা সকলেই প্রায় চামড়ার কারবারি। ওখানে গেলে সেটা বোঝাও যায়। হাঁটতে-হাঁটতে মেরিলিস যখন হেয়ারের বাড়ি পৌঁছল তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। মেরিলিসকে দেখেই হেয়ার, বার্ক, মার্গারেট, আর নেলি তো হইহই করে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্পগুজব বেশ জমে উঠল। এক সময় মেরিলিস বলল, "নিজেদের এই দৈন্যদশাকে মেনে না নিয়ে, আপনারা তো ডাঃ নকসের সঙ্গে নিয়মিত কারবার চালালেই পারেন।"

"নিয়মিত ! কিন্তু আমরা পাব কোথায় অমন আরও বুড়ো ?"

"কেন ? আপনাদের ঘরে পাকাপাকিভাবে কোনও ভাড়াটে না বসিয়ে, আপনারা তো এবার থেকে ঠিকে ভাড়াটে রাখলেই পারেন।"

"ঠিকে ভাড়াটে ! মানে ?"

"মানে, ভাড়াটে আসবে-যাবে, দু-একদিন থাকবে। তারপর..."

"আপনি ঠিক কী বলছেন, বুঝতে পারছি না," বার্ক মেরিলিসের দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

"আপনারা তো জানেন, এডিনবরায় ভবঘুরের কোনও অভাব নেই। তেমন লোকগুলোকে এখানে দু-একদিন থাকবার জন্য ডাকলেই তো পারেন। এমন শীতের দেশে, ঘরের মধ্যে থাকবার লোক দেখালে, সুযোগ পেলে, দেখবেন তারা দৌড়ে আসছে। তখন না হয় তাদের জন্য কিছু খরচাও করবেন ক'দিন। দু' দিন তাদের খাওয়াবেন-দাওয়াবেন। তারপর একফাঁকে রাতের অন্ধকারে দেবেন সাবাড় করে। নিজেরা না পারলে আমাকে খবর পাঠাবেন। কী, বোঝা গেল ? তা হলে দেখবেন, বাড়িতে বসেই রোজগার করছেন মুঠো-মুঠো ! ক'দিনেই আপনাদের এই ভোল দেখবেন পালটে গেছে !" মেরিলিসের ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

মেরিলিসের কথা শুনে মার্গারেট আর নেলি বলল, "এসব কী বলছেন আপনি ?"

"ঠিকই বলছি। বলছি, শুধু-শুধু এই দারিদ্র্য না মেনে নিয়ে বরং কাজে নেমে পড়ুন। আমরাও তো রইলুমই সঙ্গে। ওই অকেজো লোকগুলোকে সাবাড় করা, বয়ে নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি বাকি সব তো করব আমরা।"

"কিন্তু এ তো পাপ "

"কিসের পাপ ? পেটের জন্য দেশের বড়-বড় পেশার লোক যদি এসব করতে পারে, তা হলে আমাদের মতো গরিবের বেলায় সেটা দোষের হবে কেন ?"

মেরিলিস উঠে দাঁড়াল। চলে যাবার আগে, আর-একবার ওদের মনে করিয়ে দিল, অমন এক-একটা লাশের জন্য মিলবে মুঠো-মুঠো পাউণ্ড !

ক'দিনের মধ্যেই হেয়ার আর বার্কের ব্যবসা বেশ জমে উঠল। মেরিলিসের মুখেও হাসি ফুটল। ডাঃ নকস ভাবলেন, বিচ্ছু ছেলেটা দুটো অকেজো লোককে দিয়ে শেষে আমার স্কুলটাকে কিনা সত্যিই আবার দাঁড় করিয়ে দিল ! বার্ক বেছে নিল শহরের মধ্যে ভবঘুরে খোঁজার কাজটা। তেমন কাউকে চোখে পড়লেই, ভুলিয়েভালিয়ে তাকে এনে তুলত হেয়ারের বাড়িতে। ক্রমে নেলি আর মার্গারেটও বেশ পটু হয়ে উঠল।

কাণ্ড দেখে মুচিশাহির সবাই যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু কেউই ওরা বুঝে উঠতে পারল না, কী করে এসব সম্ভব হচ্ছে ! ক'দিনের মধ্যেই বাড়ির চালে পড়ল কাঠের ছাউনি, ঘরের দেওয়ালে পড়ল রং, আস্তাবলে এল দুধসাদা ঘোড়া ! শোনা গেল, ওরা নাকি বিদেশে চামড়া রপ্তানির কারবার খুলেছে। হবেও বা ! নিত্যই এখন দেখা যায় ওদের বাড়িতে নানা মানুষের আনাগোনা। সেই সঙ্গে রোজই ঠেলায় চেপে আসছে বড়-বড় বাক্স, থলে ! তবে আসল ব্যাপারটা যে কী তা কিন্তু ওরা কেউই আন্দাজ করতে পারল না।

দেখতে-দেখতে এসে পড়ল এডিনবরার সেই বহু-প্রতীক্ষিত উৎসব হ্যালউইন-এর রাত। দেশের মানুষের বিশ্বাস, ওই দিন নাকি নরকের যত ভূতপ্রেত আসে মর্ত্যলোকে ! এই রাতটিতে এডিনবরার মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। ঘরে-ঘরে শোরগোল পড়ে যায় বাড়ির রং ফেরাতে, আতসবাজি বানাতে। সবাই সেদিন চায়, ঘরের যত ধুলোবালি, নোংরা ঝেড়েমুছে সংসারের ভোল পালটাতে। নোংরা গন্ধ পেলেই যে ভূতেরা সেখানে আস্তানা গাড়বে !

ওই রাতে এডিনবরার কেউই দু' চোখের পাতা এক করে না। কচি-কাঁচাগুলোকে পর্যন্ত চিমটি কেটে জাগিয়ে রাখে। কে জানে, ঘুমোলে যদি ভূতে ধরে ! ছেলে-ছোকরারা তো সারারাত ফেরে পথে-পথে টহল মেরে, আকাশ ভরিয়ে দেয় আতসবাজিতে। হ্যালউইনের উৎসব দেখতে প্রতি বছরই এডিনবরায় ভিড় জমায় ইউরোপের নানা জায়গার বিস্তর হুজুগে মানুষ।

বার্ক আর হেয়ারের মন কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই খিঁচড়ে ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে ওদের বেশ খারাপ অবস্থা চলছিল। কিছুতেই পারছিল না কাউকে জোটাতে।

হ্যালউইনের মওকায় শিকার ধরতে বার্ক সেদিন দুপুর থেকেই তাই ঘুরছিল শহরের এদিক-ওদিক।

হেয়ার বাড়িতেই ছিল। হঠাৎ সে দেখল এক থুত্থুরে বুড়ি এসে দাঁড়াল ওর দোরগোড়ায়।

"কী চাই ?" হেয়ার এগিয়ে গেল।

"আচ্ছা, এইটিই কি উইলিয়াম হেয়ারের বোর্ডিং হাউস ?" বুড়ি প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ?"

"আমার নাম ডোকাটি। আসছি আয়ারল্যান্ড থেকে। আমার ছেলের খোঁজে। কিছুদিন আগে সে এখানে এসেছিল তার বাবার খোঁজে। পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার পেতে সে বলেছিল, সে তার বাবাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবে। বাবা তার এই ঠিকানাতেই থাকতেন। কিন্তু কই ফিরল না তো। তাই আমি নিজেই এসেছি..."

"ভেবেছেন অবশ্য ঠিকই আপনি।" তারপর বিনয়ে ভেঙে পড়ে হেয়ার বলল, "এ-বেলাটা না হয় এখানেই থাকুন। তারপর রাত হলে না হয় অন্য কোথাও একবার খোঁজাখুঁজি করে দেখবেন।"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার ছেলে কি তা হলে এই ঠিকানায় আসেনি?"

হেয়ার একটু থতমত খেয়ে গেল। বৃদ্ধার মুখে ছেলেটির চেহারার বর্ণনা শুনে ওর আর বুঝতে বাকি রইল না কিছু। কারণ ক'দিন আগেই ছেলেটিকে তাদের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছে। হেয়ার নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "সেটা আমি আপনাকে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারছি না। কত লোক আসে-যায় এখানে । আমার বন্ধু আসুক । সেই আসলে এই বোর্ডিং হাউসের সব খবর রাখে···।"

"বেশ, বেশ। বুড়ি ঠুকঠুক করে গিয়ে ঢুকল হেয়ারের ঘরের মধ্যে।

এদিকে এডিনবরার বাজার-পাড়ায় বার্কের সামনে এসে দাঁড়াল এক সাংবাদিক ভদ্রমহিলা, স্বামী আর মেয়ের হাত ধরে। ওঁরা এসেছেন হ্যালউইনের সংবাদ শিকারে, লন্ডন থেকে। ওঁরা চান, রাত কাটাবার মতো কোনও সস্তা হোটেলের খোঁজ।

বার্ক ওদের অনুরোধটা শুনেই আনন্দে ডগমগ করে উঠল। বলল, "চলুন, আমার সঙ্গে। অমন হোটেল পেতে আপনাদের যেতে হবে শহরের একটু বাইরে।" যেতে-যেতে বার্ক তো আনন্দে দুলে-দুলে উঠতে লাগল। ভাবা যায়, একসঙ্গে এতগুলো!

বাড়ির দরজায় পৌঁছেই বার্ক দারুণ খেপে গেল। হেয়ারকে বলল, "দূর করে দাও ওই বুড়িটাকে। আমি তো এতগুলো লোক নিয়ে এসেছি।"

"বলি ও বুড়িটা কে তা জানো?" হেয়ার গোল-গোল চোখ করে প্রশ্ন করল।

"কে?"

"ও বুড়ি এসেছে ওর ছেলের খোঁজে। ছেলে নাকি এখানেই এসেছিল তার বাপের খোঁজে!"

"অ্যাঁ, বলো কী! তা হলে আমার এই দলটাকে নিয়ে এখন যাই কোথায়?"

"এক রাত্রের মতো ওদের তোমার ঘরে ব্যবস্থা করো না। তারপর কাল একটু বেলার দিকে আমার এদিকে নাহয় পাঠিয়ে দিও!" হেয়ার ফিসফিস করে বলল।

সন্ধে হতেই হেয়ার ব্যস্ত হয়ে উঠল। মেরিলিসকে খবর পাঠাতে হবে।

বার্ক বলল, "ওকে আজ পেলে হয়। নেশাভাঙ করে কোথায় আজ ঘুরে বেড়াবে ও তার ঠিক কী!"

"কিন্তু জালে তো আজ অনেক মাছ! ওকে না পেলে চলবে কেন? অন্তত বুড়িটাকে তো আজই পাচার করা দরকার।"

"কিন্তু এ কী! মেরিলিস বলেছিল বটে আসবে; সকাল গড়িয়ে গেল, অথচ তার দেখা নেই কেন?" বার্ক আর হেয়ার তো চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল। বুড়িটাকে যে মাঝরাতেই ওরা সাবাড় করেছে।

নেলি বলল, "আমি জানতুম··· আজ ও জ্বালাবে।"

মার্গারেট বলল, "বুড়িটাকে বরং আস্তাবলে পাচার করে দাও। থাকুক আজ ও পড়ে খড়ের গাদায়।"

বার্ক বলল, "ঠিক বলেছ। তা ছাড়া ওই তিনজনও আমার ওই ছোট্ট ঘরটায় আর থাকতে চাইছে না।"

হেয়ার বলল, "যা করার তাড়াতাড়ি করো। সারারাত জেগে আমরা তো আর কেউই দাঁড়াতে পারছি না।"

সারা এডিনবরাটা তখন ঝিমোচ্ছে। হ্যালউইনের পরের দিন প্রতি বছরই শহরটার এমনিই দশা হয়। হেয়ার, বার্ক, নেলি, মার্গারেট একটু পরেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। জেমসও কাল সারারাত ঘুরেছিল পথে-পথে। একটু পরে সেও ঢলে পড়ল বিছানায়। জেগে রইল খালি সেই সাংবাদিক ভদ্রমহিলা আর তাঁর খুদে মেয়েটা। তিনি তখন হ্যালউইনের রিপোর্ট লেখাটা শেষ করছিলেন। পরের দিনই তো ফিরে যেতে হবে।

মেয়েটা তখন ঘরের বাইরে। এদিক-ওদিক খেলে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ওর লক্ষ পড়ল দূরে সাদা ঘোড়াটার ওপর। আর অমনি সে ছুটল আস্তাবলের দিকে। কিন্তু এ কী! আস্তাবলে ঢুকেই মেয়েটা চমকে উঠল! দেখল, খড়ের গাদার নীচে সেই বুড়িটা মরে পড়ে আছে। যাকে কাল দেখেছিল ও হেয়ারের বাড়িতে। অমনি সে ছুটল মায়ের কাছে।

অ্যান তো বুড়িকে দেখেই হতভম্ব। খড়ের তলায় মানুষের লাশ! তার মানে··· এটা কি কোনও শব পাচারকারীর বাড়ি নাকি! এডিনবরায় তো শোনা যায়···! সাংবাদিকটির মনে পড়ে গেল অনেক কথা! আর অমনি তিনি ছুটলেন মেয়েকে নিয়ে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি।

লাঠির গুঁতোয় ঘুম ভাঙতেই হেয়ার আর বার্ক দেখে ওদের বাড়িতে থইথই করছে পুলিশ! নেলি আর মার্গারেট তো হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

অমন সুনসান শহরের মধ্যে খবরটা রটতে কিন্তু বেশি সময় নিল না। আর অমনি শুরু হল এক নাটকীয় কাণ্ড! রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে শৃঙ্খলিত বার্ক আর হেয়ার। তাদের পেছনে চলেছে নেলি আর মার্গারেট। আর অসংখ্য মানুষ ওদের পিছনে পাগলের মতো ধাওয়া করে চলেছে। কেউ ওদের ইট ছুঁড়ছে, কেউ গায়ে থুতু দিচ্ছে, কেউ চুল-দাড়ি ধরে টানছে।

ক'দিন বাদেই বসল আদালত। জনতার হইচইয়ে সওয়াল শোনে কার সাধ্যি! জনতা বারবার দাবি তুলল, ওদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক ওই খুনিগুলোকে।

এদিকে নিউইংটনে ডাঃ নকসকেও পুলিশ তখন রেখেছে নজরবন্দী করে। জনতা সেখানেও হানা দিয়েছে।

ক'দিন বাদেই হেয়ার হঠাৎ চাপের মুখে পড়ে রাজি হয়ে গেল রাজসাক্ষী হতে। আইনের বিচারে কিছুতেই তো প্রমাণ করা যাচ্ছিল না ওদের খুনি বলে। বুড়িকে যে অন্য কেউ মেরে ওদের আস্তাবলে ফেলে যায়নি তারই বা ঠিক কী!

হেয়ারই শেষপর্যন্ত আদালতকে জিতিয়ে দিল। রাজসাক্ষী হয়ে স্বীকার করে নিল ষোলোটা খুনের দায়!

হেয়ার ছাড়া পেয়ে গেল। রাজসাক্ষী হওয়ার পুরস্কার। নেলি আর মার্গারেটও মুক্তি পেল।

কিন্তু হতভাগ্য বার্ক! তার জন্য জারি হল ফাঁসির হুকুম। ২৮ জানুয়ারি, ১৮২৯ সাল। সকালবেলা এডিনবরার লন মার্কেটে হাজার-হাজার মানুষের চোখের সামনে বার্ককে লটকে দেওয়া হল ফাঁসির দড়িতে। ওদিকে নিউইংটনে তখন জ্বলছে ডাঃ নকসের বাড়ি, স্কুল। হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ পারেনি সেদিন জনতাকে আটকাতে।

সবই শেষ হল। আর ওই সঙ্গেই জন্ম নিল একটি নতুন আইন। এর ঠিক তিন বছর পর। সূত্রপাত ঘটল 'অ্যানাটমি অ্যাক্ট'-এর। ১৮৩২ সালে শিক্ষার জন্য, বিজ্ঞানের স্বার্থে, মানুষের শব সংগ্রহ করা বৈধ ঘোষিত হল।

ছবি : অনুপ রায়

কাগজ কেটে নকশা

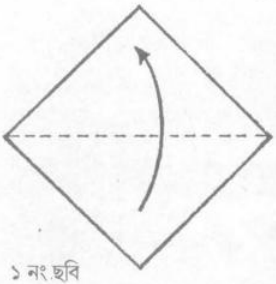

১ নং ছবি

সামান্য একটুকরো কাগজ থেকে কত সুন্দর নকশা বানানো যায় তা এবার শিখে নাও। রঙিন পোস্টার কাগজ, মারবেল কাগজ অথবা ফেলে-দেওয়া পুরনো পত্রিকার রঙিন ছবির পাতা কেটেও বানাতে পারো। প্রথমে যে-কাগজটা নেবে সেটা সমানভাবে চার চৌকো করে কেটে নাও। এক নম্বর ছবির মতো চৌকো কাগজটার উপর নীচ কোনা দুটো এক করে মাঝখানে একটা ভাঁজ করো।

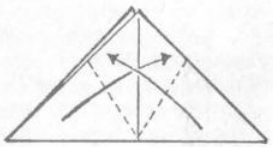

২ নং ছবি

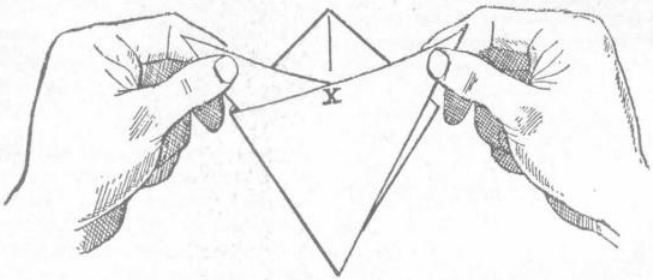

৩ নং ছবি

৪ নং ছবি

এবার কাগজটা খুলে অন্য দুটো কোণ এক করে আবার ভাঁজ করো। এবার আর ভাঁজটা খোলার দরকার নেই। দু' নম্বর ছবির দাগ দেওয়া লাইন অনুযায়ী ভাঁজ করো।

দুটো ভাঁজ যেখানে মিশেছে সেটা যেন নীচের লম্বালম্বি ভাঁজের উপর পড়ে। তিন নম্বর ছবিতে 'ক্রস' চিহ্ন করে দেখানো আছে।

৫ নং ছবি

এখন চার নম্বর ছবিতে যেখান দিয়ে দাগ দেওয়া লাইন আছে ঠিক সেখান দিয়ে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ভাঁজ করে নাও। এবার পাঁচ নম্বর ছবিতে একটা নকশা আউট লাইনে করা আছে সেরকম একটা নকশা পেনসিল দিয়ে ছকে নাও।

কাঁচি দিয়ে যে অংশটা ছবিতে সাদা আছে সেটুকু রেখে বাকি লাইনটানা অংশটুকু সুন্দরভাবে কেটে বাদ দিয়ে দাও। এবার সমস্ত ভাঁজগুলো আস্তে-আস্তে খুলে দ্যাখো কী সুন্দর একটা ছ-কোনা নকশা তৈরি হয়ে গেল।

কবির

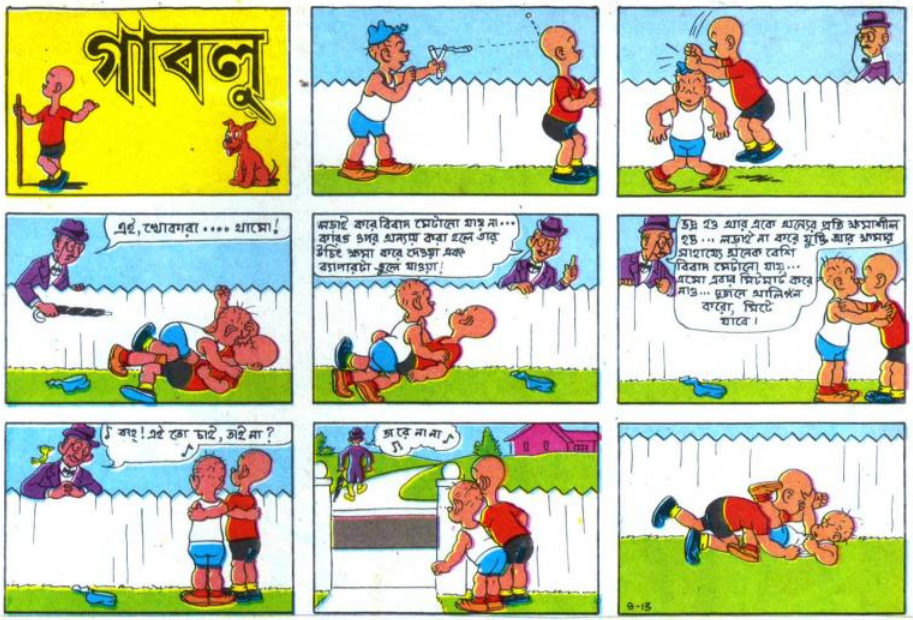

গাবলু
এই, খোকারা .... থামো!
লড়াই করে বিবাদ মেটানো যায় না... কারও ওপর অন্যায় করা হলে তার উচিৎ ক্ষমা করে দেওয়া এবং ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া!
ভদ্র হও আর একে অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল হও... লড়াই না করে যুক্তি আর আমার সাহায্যে অনেক বেশি বিবাদ মেটানো যায়... এসো এবার মিটমাট করে নাও... দুজনে আলিঙ্গন করো, মিটে যাবে।
বাঃ! এই তো চাই, তাই না?
আ রে না না
9-13

গাবলু
টপ
টপ
টপ
থুপ
থুপ
থুপ
টপ
টপ
টপ
দুম
দুম
দুম
গাবলু... মা তোমাকে এসব বন্ধ রাখতে বলেছিল!
দড়াম
দড়াম
দড়াম
বলে দিচ্ছি, লক্ষ্মী না হলে তোমার মাথায় একদিন শিং গজাবে!
অ্যাঁ!
9-6

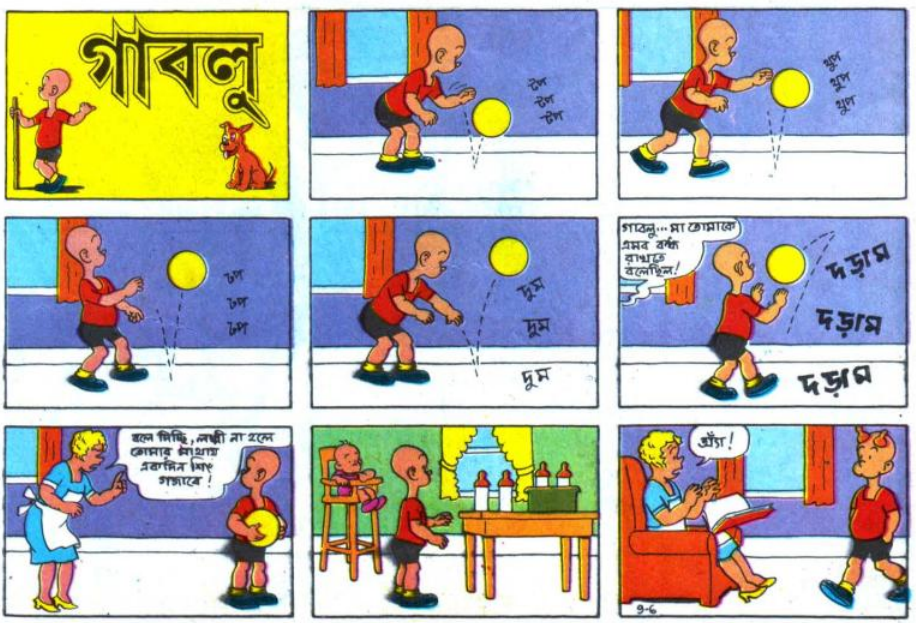

রেলগাড়ির কামরায়

রতন ভট্টাচার্য

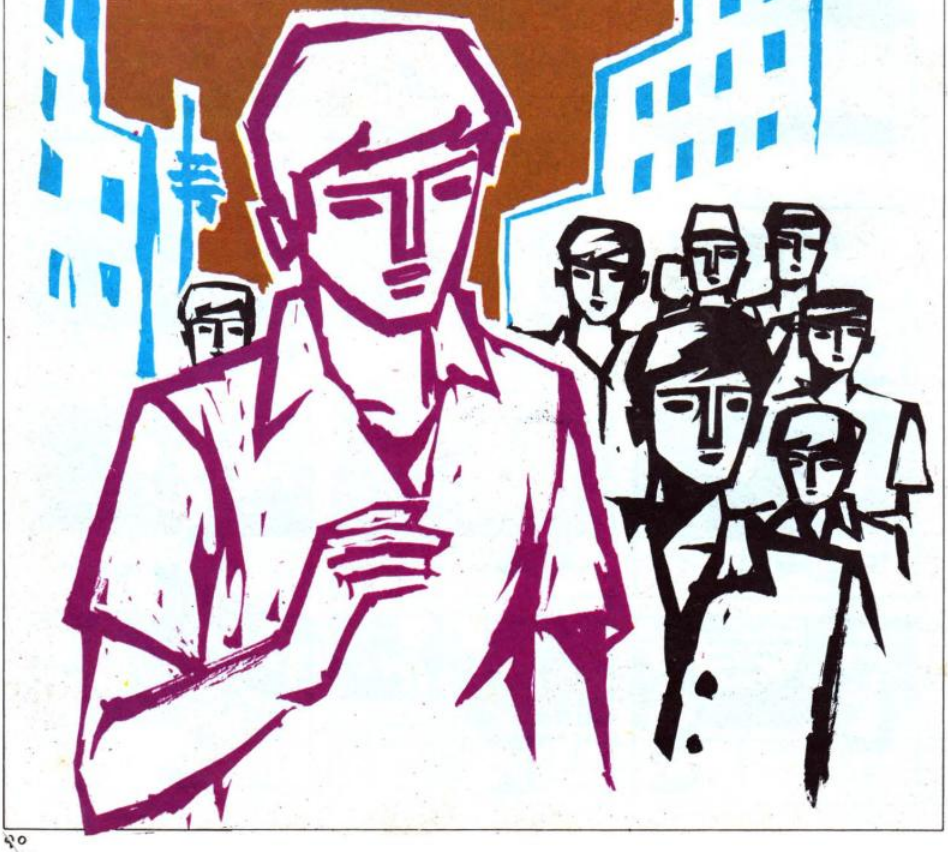

চারদিকে খটখটে শুকনো দিন। ঝাঁ-চকচক রোদ। পরিষ্কার আকাশ। তা সত্ত্বেও পার্কের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য একটা ঘূর্ণিঝড় উঠল। তেমন ধুলো উড়ল না। উড়ল নানা গাছের ঝরাপাতা, ছেঁড়া কাগজ আর তুলো। এই পার্কের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও একটা শিমুল গাছ আছে। তুলোগুলো লাইন দিয়ে সেখান থেকেই উড়ে এল। তারপর আমাদের দু'জনের মাথার অনেক ওপর দিয়ে উড়ে কোথায় চলে গেল কে জানে! হাওয়ায় বেশ নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম। মজাও লাগল। তবে মনের মধ্যে শান্তি ছিল না বলে মজাটা জমল না। যখন হাওয়া উঠল তখন আমি মায়ের কথা ভাবছিলুম। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল যে, মা আমাকে আসতে দিতে চাননি। আমি জোর করে, কান্নাকাটি করে এসেছি। অবশ্য এটা ঠিক, বেশি টাকার ওপর মায়ের একটু লোভ ছিল। সেই লোভেই শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছিলেন মা। কিন্তু লোভ দেখিয়ে মুজিবরদা আমাকে এ কোথায় নিয়ে এল আর আমিই-বা কেন এলুম! আমি গ্রামে পেতুম সপ্তাহে চল্লিশ টাকা। কম মজুরির সেই চল্লিশ টাকাই আমি মায়ের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন আমি মাকে পাঠাচ্ছি একশো টাকা। মাসে। তার মানে মা সপ্তাহে পাবেন পঁচিশ টাকা। প্রত্যেক সপ্তাহে পনেরো টাকা আয় কমে গেল মায়ের। ওই টাকায় মায়ের হয়তো চলে যাবে। একলা মানুষ। চালিয়ে নেবেন। পুকুর থেকে গেঁড়িগুগলি তুলবেন, কাঁকড়া তুলবেন! কোনওদিন শাক, চলে যাবে। কিন্তু টাকাটা? এতদূর যে এলুম সে কি আরও কম মজুরিতে খাটবার জন্য? কথাটা ভেবে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হল। আসবার সময় মুজিবরদা ভাড়া দিয়ে নিয়ে এসেছে। ভাড়া অনেক। ইচ্ছে হলে যে ফিরে যাব তারও উপায় নেই। টাকা কোথায়? সম্বল তো প্রতি মাসে হাত-খরচার তিরিশ। সাবান কিনে, মাথায় মাখার তেল কিনে, সিনেমা দেখে, হোটেলের বাইরে কখনও কিছু ভাল-মন্দ খেয়ে মাসের শেষে এক পয়সাও বাঁচে না। ওই টাকায় কুলোতে চায় না তো বাঁচবে! বড্ড অসহায় লাগছিল। এখানে আমি বিদেশী, এখানে কেউ আমার চেনা নয়, বাড়ি থেকে ছ'-সাতশো মাইল দূরে আছি, এসব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ উঠল ঘূর্ণি হাওয়া। ভাবনাচিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও কীরকম একটা চাপা কষ্টে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলুম আমি। বুক ঠেলে একটা নিশ্বাস উঠে এল। খটখটে শুকনো দিনে কিছুক্ষণের জন্য ওঠা হাওয়ার মজাটা তেমন করে জমতে পারল না।

গৌতম একটু চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল, "সত্যদা, আজকাল শুরু হয়েছে আর-এক নতুন উৎপাত। ভক্কাভাইয়ের ওখান থেকে বেরিয়ে তোমায় বলছিলুম না, এখন উনি ঘনঘন বোম্বাই যাচ্ছেন। আগে এখানকার মাড়োয়ারি গদি থেকে কাজ আনতেন। আজকাল আনছেন বোম্বাই থেকে। বোম্বাই গিয়ে কুড়ি দিন পঁচিশ দিন করে থাকছেন। এবার যে বোম্বাই গেছেন তাও তো মনে হয় কুড়ি দিন হয়ে গেল, তাই না?"

"হ্যাঁ। তা তো হবেই।"

"আমাদের ভয় ঢুকেছে উনি না রাতারাতি এখানকার কারবার গুটিয়ে বোম্বাই চলে যান।"

"জরির লোকেরা সবাই দেখছি বম্বে যেতে চায়। আমরা যাই বেশি মজুরির লোভে। যাদবজি কেন যাবে?"

"যেখানে মজুরি বেশি সেখানে লাভও বেশি। লাভ বেশি না হলে কি আর বেশি মজুরি দেয়? আমাদের দেশের কথা মনে আছে তোমার? বছরে তিন মাস কাজ নেই। বোম্বাইতে কিন্তু সারা বছর কাজ। ওখানকার কারখানাতে আরব দেশের কাজ হয়।"

আমি মাথা নাড়লুম। "হ্যাঁ। তা জানি। আরব দেশের কথা শুনেছি। কিন্তু যাদব জরিঅলা হঠাৎ বাড়িঘর ছেড়ে সেখানে যেতে যাবে কেন?"

"জরিঅলার এখানে বাড়িঘর, তোমায় কে বলল?"

"এখানে বাড়ি না?"

"না। ভাড়াবাড়ি।"

"তবে তো সত্যি যে-কোনওদিন চলে যেতে পারে।"

"পারে তো। তোমায় তা হলে বলছি কী এতক্ষণ। বোম্বাই এখান থেকে পনেরো-ষোলো ঘন্টার রাস্তা। গাড়িভাড়া আছে, তার ওপর সময় নষ্ট। তাই যদি কারবারটাকেই বোম্বাই নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে সবদিক থেকে সুবিধে।"

"হুঁ। আমাদের টাকাটা মেরে দিতেও আর কোনও অসুবিধে থাকবে না। এখানে মারা যদিবা একটু কঠিন হয়, একবার বোম্বাই চলে যেতে পারলে আর জরিঅলাকে পায় কে।"

"শুধু আমাদের টাকা বলছ কেন সত্যদা, আরও কত জায়গায় কত টাকা বাকি রেখে পালাবে তার ঠিক আছে? এই তো ভক্কাভাইকেই এক মাস দশ দিন হয়ে গেল,এখনও টাকা দেয়নি। আর দিন-কুড়ির মধ্যে কারবার গুটিয়ে পালাতে পারলে ভক্কাভাইয়ের পাওনা হবে দু' মাসের টাকা। দু' মাসে কত টাকা হবে ভক্কাভাইয়ের?"

"কুড়িজনের?"

"হ্যাঁ। কুড়িজনের। একশো টাকা করে।"

এবারে আর জোরে-জোরে হিসেব করলুম না। মনে-মনে হিসেব করে বললুম, "বেশি না। চার হাজার।"

গৌতম অবাক হয়ে বলল, "চার হাজার টাকা বেশি নয়!"

"আমাদের তুলনায় বলেছি। আমাদের কাছে চার হাজার টাকা বেশি না? ব্বাবা! জীবনে চল্লিশ টাকার বেশি হাতে পাইনি কোনওদিন।" একটু থেমে বললুম, "তা হলে তোরা ধরে নিয়েছিস জরিঅলা বোম্বাই যাবেই?"

"হ্যাঁ। অত ঘনঘন বোম্বাই যাওয়া আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। তারপর অতদিন করে থাকে। এর মধ্যেই বোম্বাইতে আলাদা একটা কারখানা খুলে ফেলেছে কি না তাই বা কে জানে?"

"সব জেনেও আমরা কিছু করব না? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?"

"আমরা জানছি কোথায়? এসব তো অনুমান। আর জানলেও কিছু করা যাবে না সত্যদা। তোমায় তো একটু আগে বললাম,এখানে আমাদের কেউ চেনে না, আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"একবার থানায় গেলে হয় না।"

"থানায় গিয়ে কী বলব?"

"বলব, জরিঅলা আমাদের টাকা আটকে রেখে দিয়েছে।"

"মাথা খারাপ! উলটে থানায় আমাদেরই আটকে রেখে দেবে। সেই নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে ফেরার কথা মনে নেই? সারারাত দু'জনকে আটকে রেখে দিয়েছিল। জরিঅলা বলতে তবে ছাড়ল।"

"আমরা কি তা হলে কিছুই করতে পারব না?" দু' হাতে দুটো মুঠো পাকিয়ে কথাটা বললুম আমি। অসহায় রাগে ভেতরটা ফেটে যাচ্ছিল আমার।

গৌতম বলল, "আমরা কিছু খুঁজে পাইনি। তাই তো তোমাকে ডেকে এনে সব বললুম। তুমি শিক্ষিত ছেলে। নাইন পর্যন্ত পড়েছ। তুমি যদি কোনও উপায় খুঁজে পাও।"

আমাকে শিক্ষিত বলায় আমার বেশ লাগল। কিন্তু অনেক ভেবেও আমি কোনও উপায় খুঁজে পেলুম না। তখন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "চল,এবার ওঠা যাক। অনেক বেলা হয়েছে। যা খেয়েছি সব হজম হয়ে গেছে। খিদে লেগেছে খুব।"

গৌতম ধীরেসুস্থে উঠে পাজামা ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "হ্যাঁ, চল।"

গৌতমের দেখাদেখি আমিও হাত দিয়ে পাজামা ঝাড়লাম। তারপর কিছু না ভেবে হঠাৎ বললাম, "গৌতম, এরকম তো নাও হতে পারে।"

"কীরকম ?"

"জরিঅলার কথা বলছি। আমাদের ধারণা হয়তো ভুল। হয়তো সৎ উদ্দেশ্যেই টাকাটা উনি নিজের কাছে রেখেছেন।"

"তা হলে ফজলুর আর মাসুদকে বাড়ি যেতে দিচ্ছে না কেন ?"

"হ্যাঁ। সে-ও একটা কথা বটে। আচ্ছা, কারও বাড়ি থেকে কখনও বেশি টাকা চেয়ে চিঠি আসেনি ?"

"চিঠি ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধখানা আসে। কে লিখবে চিঠি ? আমাদের মা-বাবাও তো আমাদেরই মতো। তাঁরাও লিখতে-পড়তে জানেন না। কাউকে ধরে কখনও-সখনও এক-আধটা লেখান। কিন্তু পড়ে তো মুজিবরদা। কারও চিঠিতে কখনও টাকার কথা ছিল বলে শুনিনি।"

"এ কখনও হয় ? টাকা কামাই করতে এখানে আসা। আর বাড়ি থেকে কেউ টাকা চেয়ে চিঠি দেবে না ? বিয়েশাদি আছে, অসুখ-বিসুখ আছে।"

"তোমার কথা বুঝেছি সত্যদা। কিন্তু মুজিবভাইকে কারও চিঠিতে কোনওদিন টাকার কথা পড়তে শুনিনি। সেইজন্যই তো তোমাকে নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। মনে হয়েছিল তুমি নিশ্চয় মুজিবরদার লোক। না হলে লেখাপড়া জানা একটা ছেলেকে মুজিবভাই হঠাৎ এখানে আনতে যাবে কেন ?"

কথাটায় আমারও কেমন খটকা লাগল। সত্যি, আমার আগে মুজিবরদা লিখতে-পড়তে-জানা কোনও ছেলেকে এখানে আনেনি। তা হলে আমাকে কি কোনও মতলবে নিয়ে এসেছিল ? নাকি কিছু না ভেবে এমনি নিয়ে এসেছে ? আমার কাছে ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে থাকল। কোনও তল খুঁজে পেলাম না। আর ভাবতেও ভাল লাগছিল না। নিঃশব্দে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে বললুম, "তোদের সেই সন্দেহ এখন আর নেই তো ?"

"আমার কোনওদিনই ছিল না। থাকলে তোমাকে এভাবে ডেকে এনে সব বলি ?"

"মুজিবরদাকে সন্দেহ করিস কেন ?"

"সব সময় মালিককে টেনে কথা বলবে। একদম ভাল লাগে না। তুমি দেশ থেকে আমাদের নিয়ে এসেছ। আমাদের সুবিধে-অসুবিধে, বিপদ-আপদ তুমি দেখবে না তো কে দেখবে। এই যে মাসুদ আর ফজলুর দু' বছর ধরে বাড়ি যেতে পারছে না, এটা তোমার ফয়সালা করে দেওয়া উচিত ছিল না ? আমাদের ভালমন্দে মুজিবভাইয়ের কিছু এসে যায় না। তার এক ধান্দা, কিসে জরিঅলার ভাল হবে। এরকম ব্যবহারের জন্যই আমাদের সন্দেহ। যদি সত্যি-সত্যি জরিঅলা আমাদের টাকা মারে, তা হলে জেনে রেখো তার ভাগ মুজিবভাইও পাবে।"

"তার মানে জরিঅলা যদি ভাগে তা হলে মুজিবরদাও ভাগবে।"

"হ্যাঁ। তা তো ভাগবেই। না হলে আমরাই তো তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব।"

সেই এক রাস্তায় ফেরা। শহরের রাস্তায় হাঁটা বড্ড অসুবিধের। রাস্তা ভাল। ঝকঝকে মসৃণ পিচের রাস্তা। কিন্তু মুশকিল হল সাইকেল আর সাইকেল রিকশা নিয়ে। এগুলো এমন ধার ঘেঁষে যায় যে হাঁটা যায় না। সবসময় কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। গৌতমের অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার হল না। পাঁচ-ছ' মাস হয়ে গেল। তবু যেন বাধো-বাধো ঠেকে। মনে হয় একপাশে চুপচাপ দাঁড়াই। সব রিকশা, সাইকেল চলে যাক। তারপর হাঁটব। কিন্তু তা তো আর হয় না। অবিরাম বয়ে চলেছে গাড়ি। আমি দাঁড়িয়েই থাকব। গাড়ি আর শেষ হবে না।

রাস্তার একদম ধার দিয়ে আড়ষ্ট হয়েই হাঁটছিলাম। হাঁটছিলাম আর সমস্ত ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম আমাদের অবস্থাটা কীরকম। আর তাই করতে গিয়েই বিপদে পড়ে গেলাম। আচমকা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে বেরোবার আর কোনও রাস্তা নেই। আমরা বাড়ি ফিরব কেমন করে ? ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। টাকা যায় যাক। আমরা তো বাড়ি ফিরতেই পারব না। জরিঅলা বোম্বাই পালিয়ে গেছে। মুজিবরদা নেই। সেই অবস্থায় বাড়ি ফেরবার টাকা দেবে কে আমাদের ? এখানেও থাকতে পারব না। খাওয়াবে কে ? জরিঅলা চলে গেলে ভক্কাভাই খাওয়াবে না। আবার আমাদের সঙ্গে ট্রেনের টিকিট কাটবার পয়সা নেই। ভেবে আমার যেন দমবন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল। কেউ যেন দু' হাতে আমার গলা টিপে ধরেছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। এখানে থাকতে হলে শুকিয়ে মরব। অন্যদিকে টিকিট না কেটে ট্রেনে চাপলে জেল। আর হাঁটতে পারছিলাম না। গৌতমকে এই ভয়ানক ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আর ঠিক তখন গৌতমও আমার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারল। মেরে বলে উঠল, "সত্যদা, জরিঅলা !"

আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম আমরা গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তার ঠিক একটু আগে দাঁড়িয়ে আছি। অবাক হয়ে বললাম, "জরিঅলা ! কোথায় ?"

আমার একদম গায়ের কাছে সরে এসে হাত দিয়ে রাস্তার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মোটরগাড়ি দেখিয়ে গৌতম বলল, "ওই গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গেল। সঙ্গে মুজিবভাই।"

"তুই ঠিক দেখেছিস ?"

"আমি স্পষ্ট দেখলুম। প্রথম মুজিবভাই নামল। তারপর জরিঅলা।"

"তা হলে কি সকালবেলা ফিরেছে ?"

"না, না। বোম্বাই থেকে গীতাঞ্জলি আসে রাত্তিরবেলা। রাত্তির এগারোটা-বারোটায়।"

"তা হলে কাল রাত্তিরে ফিরেছে। হয়তো বেলায় কারখানায় এসেছে। আমরা ছিলুম না, তাই জানতে পারিনি।"

রাস্তার উলটো দিকের গাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গৌতম বলল, "সত্যদা, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয় তা নয়।"

"কী তা নয় ?"

"আমার মনে হচ্ছে জরিঅলা গোপনে রায়পুর আসে। মুজিবভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আবার গোপনেই চলে যায়। এই গোপন ব্যাপারটাই আমরা আজ দৈবাৎ দেখে ফেলেছি।"

"গোপনে আসে ?" আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে উঠল। একটু আগের সেই ভয়ানক ভয় পেয়ে যাবার কথাও মনে পড়ে গেল। দুটো মিলিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলুম আমি। একটু সময় লাগল সামলে উঠতে। সামলে নিয়ে বললুম, "হঠাৎ গোপনে আসার কথা কেন মনে হল তোর ?"

"জানি না। এমনি মনে হল।"

আমি বললুম, "হতে পারে, প্রত্যেক সপ্তাহে কাজ এনে মুজিবকে দেয়। আর সারা সপ্তাহ ধরে আমরা যে কাজ নামাই,তা নিয়ে যায়।

মুজিব ডিজাইন করে রাখে, তাও নিয়ে যায়। ডিজাইন দেখিয়ে কাজ আনে।"

গৌতম উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি ঠিক বলেছ সত্যদা। তাই হবে।"

আমি উত্তেজিত হলুম না। ঠাণ্ডা গলায় বললুম, "কিন্তু তার জন্য গোপনে আসতে হবে কেন?"

গৌতম প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। শেষে আগের মতোই উত্তেজিত হয়ে বলল, "কারণ নিশ্চয় আছে। শুধু আমরা জানি না সেটা কী।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা গোপন কি না এক্ষুনি জানা যাবে। আমরা কারখানায় গিয়ে যদি শুনি জরিঅলা কারখানায় এসেছিল তা হলে বুঝব কাল রাত্রেই ফিরেছে। কোনও গোপন নেই। আর যদি শুনি জরিঅলা কারখানায় যায়নি তা হলে বুঝব গোপন। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। কারখানায় ফিরলেই কেউ-না-কেউ খবরটা আমাদের দেবে। কারখানায় কেন? ভক্তাভাইয়ের হোটেলে গেলেই জানতে পারব। হোটেলে নিশ্চয়ই কারও-না-কারও সঙ্গে দেখা হবে।"

গৌতম আমার সব কথা শুনল কি না কে জানে। থামতেই বলল, "সত্যদা, বাড়িটার মধ্যে একবার ঢুকে দেখলে হয় না?"

"ঢুকবি?"

"হ্যাঁ। চলো না। একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলেই নিশ্চয় কেউ আমাদের ধরে পিটবে না।"

আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু গৌতম বয়সে ছোট হয়ে যা করার সাহস দেখাচ্ছে, একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে তা বন্ধ করতে আমার মন সায় দিল না। রাস্তা পার হয়ে আমরা ওপারে গেলাম। আড়চোখে গাড়িটার দিকে তাকালাম একবার। দেখলাম ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। ড্রাইভারদের এইভাবে ঘুমোতে আমি আগেও দেখেছি।

বাড়িটা তিনতলা। নীচ তলাটা দোকানঘরে ভর্তি। দোকানঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা ভেতরে উঠে গেছে। বেশ বড় রাস্তা। একখানা লরি স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে। দোতলায় রাস্তার ওপর ঘর আছে। তলায় শুধু রাস্তা। আসলে একটা দোকান হতে পারত। সেটাকে দোকান না করে সিমেন্ট-বাঁধানো রাস্তা করে রেখেছে। ভেতরটা উঁচু তাই রাস্তাটা গড়ানো মতন। ভেতরে ঢুকে দেখলুম বাঁ দিকটা পাঁচিলঘেরা মাঠ। সেখানে চার-পাঁচটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের শেষে পাঁচিলের গায়ে একটা বড় গাছ। তার তলায় বেঞ্চি পেতে চায়ের দোকান। দোকান ঠিক না, ঝুপড়ি। জনা তিনেক লোক বসে ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। মাঠের ডান দিকে কাঠের তৈরি একটা বেশ বড় দোতলা পুরনো বাড়ি। এত পুরনো যে ওপরে ওঠবার কাঠের সিঁড়িটা বেঁকে কাত হয়ে গেছে। আর তলায় তিন-চারটে ঘর জুড়ে অফিস মনে হল। ঘরগুলোর সামনে বেশ চওড়া রক। রকের ওপর চট দিয়ে সেলাই করা অজস্র বড়-বড় প্যাকেট, কাঠের বাক্স। বেশি লোকজন নেই। সব মিলিয়ে পনেরো-কুড়িজন। সকলেই কাজে ব্যস্ত। গৌতম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিসের অফিস এগুলো?"

আমি বলতে পারলুম না। একটা অফিসের মাথায় দেখলুম সাইনবোর্ড ঝোলানো আছে। তাতে হিন্দিতে লেখা আছে শাহিদুল ট্রান্সপোর্ট। পাশেরটায় লেখা আছে এ·বি·সি। আমি হিন্দি পড়তে পারি। তাই পড়লুম, কিন্তু মানে বুঝতে পারলুম না। গৌতম বারতিনেক আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ট্যান্সপোর্ট মানে কী?"

আমি প্রত্যেকবার উত্তরে বললুম, "শব্দটা ট্যান্সপোর্ট নয়,

ট্রান্সপোর্ট ।" কিন্তু মানে বলার ধার দিয়েও গেলুম না। শেষে আবার না জিজ্ঞেস করে, তাই বেশ গম্ভীর হয়ে বললুম, "কোথায় তোর জরিঅলা আর মুজিবভাই ?"

"আমি নিজের চোখে দেখেছি। নিশ্চয় আছে কোথাও। ওপরে যায়নি তো ?"

আমি চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। আমার মনে হল রাস্তার ধারে তিনতলা বাড়িটা যার, ভেতরের এই মাঠ এবং পুরনো বাড়িও তারই। ভেতরের এই বাড়িটাই আদি বাড়ি। রাস্তার ধারের বাড়িটা পরে তৈরি হয়েছে। ভেতর দিয়ে নতুন বাড়ির ওপরে ওঠার কোনও সিঁড়ি নেই। সিঁড়ি আমাদের চোখে পড়েনি বটে, কিন্তু আছে বাইরে, রাস্তার দিকে। অতএব জরিঅলা নতুন বাড়িতে নেই। গৌতম যখন ভেতরে ঢুকতে দেখেছে, তখন আছে এই বাড়িতেই। নীচে দেখা যাচ্ছে না। অতএব ওপরে। বললাম, "ওপরে যাবি, কেউ কিছু বলবে না তো ?"

"বললে তখন দেখা যাবে। এখন তো যাই।"

কাত হয়ে পড়া সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ শব্দ করে ওপরে উঠে এলাম আমরা। ওপরটা অন্ধকার। ওপরে উঠেই সামনে একটা বড় অফিস ঘর। কিন্তু কোনও লোকজন নেই। দিনেরবেলাই ঘরটার মধ্যে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। এখানেও একটা সাইনবোর্ডে দেখলুম 'ট্রান্সপোর্ট' কথাটা লেখা আছে। অফিসকে বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে গেলুম। এত অন্ধকার যে, গা-ছমছম করছিল। খালি দিনের বেলা বলে দেখা যাচ্ছিল সব। দু' পাশে ঘর। কিন্তু সব বন্ধ। আর কোথাও কোনও লোক নেই। আমার এগোতে দস্তুরমতো ভয় করছিল। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গলায় বললুম, "আর না গৌতম। আর যাব না। চল ফিরি। কাজটা···।"

আমি কথা শেষ করতে পারলুম না। তার আগেই অন্ধকারে কাঠ ফুঁড়ে যেন একটা লোক উঠে এল আমাদের সামনে। মাথায় পাগড়ি, ইয়া গোঁফ। বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করল, "কৌন হ্যায় তুমলোগ ? কাঁহা যাতা হ্যায় ?"

এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম, একলা হলে অজ্ঞান হয়ে যেতুম। নেহাত দু'জন ছিলুম বলে অজ্ঞান হলুম না। শুধু দু'জনে দু'জনকে জাপটে ধরলুম। গৌতমটা মনে হল আমার চেয়েও সাহসী। সে সেই অবস্থায় কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "মু-মুজিবভাইকে খুঁজছি।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ। আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

"চোরচোট্টা কাঁহাকা ! ইয়ে রাস্তা হ্যায় ? ভাগ্। নিকাল হিঁয়াসে।"

লোকটার দিকে পেছন ফিরতে সাহস হল না আমাদের। আমরা দু'জনেই বোকার মতো কপালে হাত ঠেকিয়ে লোকটাকে অনবরত নমস্কার করছিলাম আর অন্ধকারে এক পা এক পা করে পেছোচ্ছিলাম। কাছাকাছি কেউ বোধ হয় গরম তেলে লঙ্কা ছেড়ে কিছু রান্না করছিল। দেখতে পেলাম না। কিন্তু পোড়া লঙ্কার ঝাঁঝ ঠিক এসে নাকে ঢুকল আমাদের। দু'জনেই একসঙ্গে হেঁচে উঠলাম। হাঁচতেই থাকলাম। অনেকখানি সরে এসেছি বুঝতে পেরে হঠাৎ হাঁচতে-হাঁচতেই পেছন ফিরে দে-ছুট। যখন রাস্তায় এসে পৌঁছলাম তখন কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছি। অবাক হয়ে দেখলাম গাড়িটা নেই। হাঁফাতে-হাঁফাতে চোখ বড় করে গৌতম বলল, "ওরা নীচে ছিল। নীচে। কোনও অফিস ঘরের মধ্যে বসে ছিল। আমরা বোকার মতো ওপরে চলে গেলাম।"

॥ ৫ ॥

একদিন জুম্মান হোটেলে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। সকালবেলা আমরা পাঁচ-সাতজন জলখাবার খাচ্ছিলাম। সেদিন জলখাবারে ছিল চারটে করে কচুরি আর একটুখানি তরকারি। হঠাৎ ছেঁড়া পোশাক-পরা একটা পাগল রাস্তা থেকে ছুটে এসে আমার ডিশ থেকে দুখানা কচুরি তুলে নিয়ে হাউ-হাউ করে খেতে আরম্ভ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছু না বলে পাগলটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, তখন ভক্কাভাই এসে পাগলটার পাশে দাঁড়াল। আমার ভয় হল পাগলটাকে বুঝি মারবে ভক্কাভাই। সে তার হোটেলে সামান্য বেয়াদপি সহ্য করে না। আমার মনে হল সেদিন যেভাবে গুলগুল্লা খেতে আসা লোকটাকে তুলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, একেও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু করবে। আমার ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল যে, লোকটা আমার প্লেট থেকে কচুরি নিয়েছে। ভক্কাভাই ওকে কোনও নিষ্ঠুর শাস্তি দিলে তার দায় খানিকটা আমারও হবে।

কিন্তু সেরকম কিছু হল না। ভক্কাভাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভক্কাভাইয়ের মুখের দিকে চোখ পড়তে আমি অবাক। সেখানে একটা ভীষণ গদগদ ভক্তিভাব ফুটে উঠেছে। তার শক্ত, নিষ্ঠুর মুখখানা যেন কোনও জাদুবলে নরম মোলায়েম হয়ে গেছে। সত্যি কিছু হল না। পাগলটা কচুরি দুটো খেয়ে নিশ্চিন্তমনে ছেঁড়া জামা তুলে মুখ মুছতে-মুছতে বেরিয়ে গেল। পাগল চলে যেতে ভক্কাভাইয়ের যেন সংবিৎ ফিরল। কাউকে ডাকল না সে। নিজের হাতে টেবিল থেকে আমার এঁটো ডিশটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল এক সেকেন্ড বাদে। একটা নতুন ডিশে চারখানা কচুরি আর তরকারি নিয়ে। ডিশটা আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে কেমন যেন উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "সত্কাম, তুনে বাজি মার দিয়ে ভাই। ও পাগল নেহি। মস্তান হ্যায়, মস্তান। মস্তাননে তোর ঝুটা খেল। হামার কাছে মাঙ্গলে হামি ওকে পুরা কচুরির চাঙাড়ি দিয়ে দিত। আরিব্বাস ! ইত্না আদমি খাতা হ্যায়, ও কিসিকো পাস নেহি গিয়া। স্রিফ তেরি প্লেটসে উঠা লিয়া কচুরি। বুঝা কুছ ? বুঝা ইস্কা মতলব ?" শুনতে শুনতে সেদিন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আমার।

সেই ভক্কাভাই আজ দুপুরে আমাদের খাওয়ার শেষে গম্ভীর মুখে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "এ যাদব জরিঅলাকা কারিগর, কান খোলকর শুনলে, কাল থেকে খানা বন্ধ। দো মাস দশ দিন হয়ে গেল তোদের মালিক পয়সা দিল না। মাসে মাসে হিসাব চুক্তি করবে বলেছিল, কিন্তু কাঁহা ভাগা কে জানে। আমাকে পয়সা না দিলে হামি কাঁহাসে খিলাব। তব্ভি তো দো মাহিনা দশ দিন খিলায়া। পাঁচ হাজার রুপিয়া কোই মামুলি বাত্ হ্যায়। হাঁ ভাই আজসে খানা বন্ধ। খা-না বন্ধ।"

ভক্কাভাইয়ের শরীরটা বিশাল। যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। তার শরীরের তুলনায় আমরা সব এক-একটা ছারপোকা। তা ছাড়া আমরা জানতুম রেগে গেলে সে অক্লেশে মানুষ খুন করে ফেলতে পারে। তার নিজের দাদাকে খুন করে নাকি সে এই হোটেলের মালিক হয়েছে। সামান্য কারণে একটা লোককে উঁচু করে তুলে বাইরে ফেলে দিতে আমি নিজের চোখে দেখেছিলুম।

তাই ভয়ে আমরা কেউ টুঁ শব্দটি করলুম না। অন্যদিকে আমাদের বলারও কিছু ছিল না। মাসে-মাসে যেখানে টাকা মিটিয়ে দেবার কথা সেখানে টাকা না পেয়ে দু' মাস দশ দিন খাওয়ানো যথেষ্ট। ভক্কাভাই তা করেছে। কাজেই তার বিরুদ্ধে বলার কিছু ছিল না আমাদের। আবার এই বিদেশে হঠাৎ খেতে পাব না শুনে এমন একটা অবস্থা হল যে, চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার শক্তিও থাকল না আমাদের। যেন মানুষ না। চেয়ারের ওপর কতগুলো পাথর বসে আছে। ভক্কাভাই নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কালুয়া ! জলদি টেবুল সাফা কর।" তারপর একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে সামনে রাখা টেপটাকে গাঁকগাঁক শব্দে বাজিয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে জুম্মান হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে হল আমাদের। ভেতরে একটা কথাও বলতে পারিনি আমরা। আর তাই বাইরে বেরিয়ে সকলে একসঙ্গে কথা বলে উঠলাম। অন্যের কথা শোনার ধৈর্য কারও ছিল না। আমরা সবাই শুধু বলে যাচ্ছিলাম। কথা নয়, কোলাহল। সকলেরই বক্তব্য এক। আমরা এখন কী করব ? কোথায় যাব ? জরিঅলার দু' মাস আড়াই মাস ধরে দেখা নেই। এই দু' মাস বাড়িতে আমরা কেউ টাকা পাঠাইনি। হাত-খরচাও পাইনি দু' মাস। যার যা সুটকেসে জমানো ছিল, সব শেষ। ফাঁদে আটকা পড়া জন্তুর মতো কোলাহল করতে করতে আমরা কারখানায় ফিরে এলাম। কাজ করতে করতে উঠে খেতে গিয়েছিলাম। চাড্ডা পাতা ছিল। কোলাহল থামিয়ে অভ্যাসমতো আমরা যে যার নিজের জায়গায় বসে পড়লাম, কিন্তু কাজ শুরু করার কথা কারও মনে থাকল না। মোসারফ বলে উঠল, "আমি আজ রাত্রেই বোম্বাই মেলে ঘরে যাব। খেতে না পেলে আমি বাঁচবুনি।"

মোসারফ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খাইয়ে ছেলে। খেতে ভীষণ ভালবাসে। খাবার গল্প ছাড়া অন্য গল্প সে জানে না। খেতে একটু দেরি হলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। অন্যদিন হলে সে 'বাঁচবুনি' বলেছে বলে আমরা হেসে উঠতুম। কিন্তু আজ কেউ হাসলুম না। তার কথার উত্তর দিল মাসুদ। বলল, "খেতে না পেলে কেউ বাঁচে না মুসা। তুইও না। আমরাও না। কিন্তু বাড়ি যেতে ট্যাকা লাগে। তুই ট্যাকা কোথায় পাবি ?" মাসুদও টাকা না বলে 'ট্যাকা' বলল। এদের মুখের ভাষায় শহরবাসের যে পালিশ পড়েছিল আমার মনে হল এক ধাক্কায় তা ভেঙে পড়তে চাইছে। স্বচ্ছন্দে গ্রামের ভাষা বলতে আরম্ভ করেছে সবাই।

মোসারফ কী বলবে যেন ভাবল দু' মিনিট। তারপর বলল, "না। ট্যাকা নেই। মুই বিনা টিকিটে যাব।"

সামসুদ্দিন বলে উঠল, "তা'লে তোকে আর ঘর যেতে হবে না। শ্রীঘর যাবি।"

ইয়াকুব বলল, "শ্রীঘর হবে ? ভাল কথা। তা'লে এখন মোরা কী করব ? একটা লোকের সঙ্গেও মোদের জানপয়চান নেই। জেল হলে তবু জেলখানায় তারা খেতে দেবে। রায়পুরে না খেয়ে এই ঘরে শুকিয়ে মরে থাকব।"

একটা হট্টগোল শুরু হল। সেই হট্টগোলের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, "মুজিব কোথায় ? তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হোক এখন আমরা কী করব।"

অমনি সকলে একসঙ্গে "মুজিবভাই"-"মুজিবভাই" বলে চেঁচামেচি ফেলে দিল। মুজিবরদা জুম্মান হোটেলে খায় না। ধারেও খায় না। সে অন্য কোনও হোটেলে নগদে খায়। ভাগ্যক্রমে এই চেঁচামেচির সময়েই সে পান চিবোতে-চিবোতে ওপরে উঠে এল। আমরা কাজ না করে হল্লা করছি দেখে প্রথমে তার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। কিন্তু যেই শুনল ভক্তাভাই বলেছে আমাদের আর খেতে দেবে না, তার মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। বানিয়ে তোলা উদ্বেগ নয়। আমার মনে হল উদ্বেগটা সত্যিকারের। গৌতম যাই বলুক, মুজিবরদাকে আমার শয়তান ভাবতে খারাপ লাগে। তাকে কিছুতেই আমি জুরিঅলার শাগরেদ ভাবতে পারি না। মুজিবরদার রোগা লম্বা মুখখানা যেন কীরকম মায়াবী। আমার বাবার বন্ধু ছিল। আমার অনেকদিন মনে হয়েছে অন্য কোনও মতলবে নয়, আমাদের কষ্ট দেখেই সে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সেদিন গান্ধী পার্কে বসে অত কথা হল গৌতমের সঙ্গে। তা সত্ত্বেও আমি দেখেছি মুজিবরদার ওপর থেকে আমার ভালবাসা সরে যায়নি। সেদিন সেই বাড়িটার মধ্যে জরিঅলার সঙ্গে মুজিবরদাকে দেখতে পেলে কী হত কে জানে। তারপরেও গৌতম আমাকে নিয়ে আরও দু-তিন রোববার গেছে বাড়িটায়। কিন্তু কোনওবারেই দেখাতে পারেনি। ফলে আমার মনে হয়েছে গৌতমের দেখতে পাওয়াটাই ভুল। আমি অবশ্য গৌতমকে বলিনি যে, সে ভুল দেখেছে। জরিঅলা, মুজিবরদা নয়, অন্য কাউকে দেখেছে সে। কিন্তু মনে-মনে মুজিবরদাকে বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর করে বসে আছি। তাই তার মুখের উদ্বেগ অন্য সকলের হয়তো বানানো মনে হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হল সত্যিকার। সে যে আমাদের কথা ভাবে তার মুখে ফুটে ওঠা সত্যিকার এই উদ্বেগই তার প্রমাণ। আমরা সকলে এক দেশ থেকে এসেছি। সবাইকে সে-ই দেশ থেকে একজন দু'জন করে তুলে এনেছে। তার পক্ষে এই দায়িত্ব ভোলা খুব শক্ত। মুজিবরদা বলল, "এখানে ভাল করে সবটা বল তো। কী হয়েছে শুনি।"

সবাই "আমি বলছি," "আমি বলছি" বলে চেঁচামেচি ফেলে দিল। মুজিবরদা এক ধমক লাগিয়ে বলল, "চিল্লাসনি।" তারপর সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "বাচ্চু বলুক। ভক্তাভাইয়ের ওখানে কী হয়েছে বল তো বাচ্চু।"

বাচ্চু আমাদের গ্রামেই সরকারডাঙায় থাকে। একটু বোকা মতন। না হেসে কথা বলতে পারে না। মুজিবরদা তার নাম বলায় সে প্রথমে একগাল হাসল। তারপর গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ভক্তাভাই বলেছে আজসে খানা বন্ধ। দু' মাস দশ দিনের টাকা দেয়নি জরিঅলা, তাই।"

"ব্যস। এই বলল ?"

"হ্যাঁ। আরও বলল, জরিঅলা কোথায় ভেগে গেছে। জরিঅলার কাছে তার পাঁচ হাজার টাকা পাওনা।"

শোনার পর দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে রইল মুজিবরদা। তারপর থমথমে মুখে হঠাৎ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। বলল, "আমি জানি তোরা আমাকে কেউ বিশ্বাস করিস না। সকলে ভাবিস আমি মালিকের লোক। এমনকী সত্যকাম, যাকে আমি এই ক' মাস আগে নিয়ে এলুম সে-ও তাই ভাবে। ভাই রে, তোদের আইডিয়া ভুল। আমি মালিকের কেউ না। আমি তোদের। তোদের একটু কষ্ট লাঘবের জন্যে আমি দেশ থেকে তোদের সকলকে এখানে নিয়ে এসেছি। দেশের চেয়ে এখানে মজুরি ডবল। আমার মধ্যে কোনও শয়তানি নেই। কিন্তু জরিঅলা যদি শয়তানি করে আমি কী করতে পারি ? তোরা যেমন তার নোকর আমিও তাই। আমায় যা বলতে বলত, আমি তোদের তাই বলেছি। তোরা ভাবলি আমি দুশমন, শয়তান। কিন্তু ভাই রে, আমি তা নই। আমি একজন ইমানদার আদমি। হ্যাঁ, আমি বছরে একবার করে দেশে যাই। ফজলুর আর মাসুদ যেতে পারছে না। আমি গেছি। কিন্তু কেন গেছি ? দু'-চারজন করে তোদের এখানে ধরে আনতে। তোরা যাতে একটু সুখে থাকিস, সেইজন্যে। জরিঅলা আমার হিসেবও কোনওদিন মেটায়নি। দেশে যাবার সময় হাজারখানেক টাকা হাতে ধরিয়ে বলেছে, ঘুমকে আও। হিসাব হোগা। সেই হাজার টাকার মধ্যেই আবার সকলের গাড়িভাড়া। ফিরে এসেছি, কিন্তু কোনওদিন হিসেব হয়নি।"

বাচ্চু বোধ হয় কথা বলতে গিয়ে এই প্রথম হাসল না। অবাক হয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, "তোমার তো তা হলে অনেক টাকা বাকি মুজিবভাই ?"

"হিসেব নেই রে। কম করেও দশ হাজার।"

"দ-শ হাজার ! আর এদিকে আমরা ভেবে নিয়েছি তুমি মালিকের লোক। মালিকের সঙ্গে যোগসাজস করে আমাদের টাকা মেরে দিতে চাও।"

"না রে সোনা। আমি মালিকের না। আমি তোদের, আমি

ক্যাম্প্কো-র
নতুন
অবদান
ভেতরেতে খাসা,
চকোলেটে তাজা এক্লেয়ার
একটা ক্যাম্প্কো-র নতুন চকোলেট এক্লেয়ারের মোড়ক
খুলেই দেখুন না ! আপনাকে ঘিরে ধরবে যত হাসিখুশী মুখ।
সাবধান, শেষ পর্যন্ত যেন আপনাকে শুধু খালি মোড়ক নিয়েই না দাঁড়াতে হয়।
অবশ্য এটা সত্যি, সবাই তারিফ করবে
আপনার পছন্দ !
ক্যাম্প্কো চকোলেট এক্লেয়ার
সবার সাথে স্বাদের আনন্দ
Chocolate Eclairs
Campco
ভারতের বৃহত্তম,
আধুনিকতম প্লাণ্টের উপহার
ক্যাম্প্কো লিমিটেড ম্যাঙ্গালোর

তোদের টাকা মারব ?" ভীষণ বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল মুজিবরদা। "মালিক না ফেরায় আমি তোদেরই মতন বিরক্ত হয়ে আছি। রোজ একবার করে বাড়ি গিয়ে তার বিবির কাছে খোঁজ নিচ্ছি। কোনও খবর নেই। যেমন যায়,বিশ দিনের কথা বলে গেছে, আজ দু' মাস হয়ে গেল।"

অন্য সকলের মনে কী হচ্ছিল জানি না, কিন্তু মুজিবরদা সম্পর্কে আমার কোনও অনুশোচনা ছিল না। আমি কোনওদিন তাকে খারাপ ভাবতে পারিনি। আসলে মুজিবরদা ম্যানেজার হিসেবে তার ডিউটি করেছে। কখনও হয়তো কঠোর হতে হয়েছে তাকে। আর তাইতেই সে সকলের কাছে খারাপ হয়ে গেছে। সবাই ধরে নিয়েছে সে মালিকের লোক। আমার মনে হল মুজিবরদার সত্যিকার দোষ সে আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারেনি। দূরের লোক হয়ে গেছে। ফলে সবাই ভেবেছে যে মালিকের লোক। এমনকী সেই রোববার গান্ধী পার্কে বসে গৌতম যখন আমাকে সব বলেছিল তখন আমারও তাই মনে হয়েছিল। আজ সেই মনে হওয়াটুকুর জন্যও আমি ভেতরে-ভেতরে খুব লজ্জা পেলাম। এই সময় তাকে সমর্থন করে কিছু বলবার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু অনেক ভেবেও শেষ পর্যন্ত তার সমর্থনে বলবার মতো কোনও কথা খুঁজে পেলাম না। কথা বলল গৌতম। এতক্ষণ সে একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ না করে সে বলে বসল, "মুজিবভাই, তুমি ঠিক জানো, তোমার সঙ্গে এই দু' মাসে জরিঅলার একদিনও দেখা হয়নি ?"

"হ্যাঁ। এতে আর জানাজানির কী আছে ? আমার সঙ্গে দেখা হলে তোদের সঙ্গেও দেখা হত।"

"না। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

মুজিবরদার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। ঘরের সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে গৌতমের দিকে। আমি গৌতমকে ইশারা করে থামতে বললাম। কিন্তু সে আমার দিকে তাকালই না। আমি মুজিবরদার দিকে তাকালাম। তার শক্ত মুখটা নরম হয়ে এল। "ও ! তাই বল ! তুই দিল্লাগি করছিস ! কিন্তু এই কি দিল্লাগির সময় গৌতম ?"

গৌতম ফুঁসে উঠে বলল, "না। আমি মোটেই দিল্লাগি করিনি। পাঁচ-ছ'টা রোববার আগে একটা মটরগাড়ি চেপে তুমি আর জরিঅলা যাওনি গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তার দিকে ?"

"রোববার সারাদিন আমি কী করি তা এই ঘরের সবাই জানে।"

"মুজিবরদা, তুমি বলতে চাও আমি ভুল দেখেছি। যাওনি তুমি জরিঅলার সঙ্গে তিনতলা বাড়ির পেছনের মাঠটায় ? একটা কাঠের দোতলা বাড়ি আছে। ট্যান্সপোর্ট লেখা অনেকগুলি অফিস। রোববার এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ যাওনি তুমি ওখানে ?"

"না। যাইনি।" বলে মুজিবরদা হাসল। "তুই একটা বোকা ছেলে গৌতম। জরিঅলা হঠাৎ কেন আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে যাবে বল ?"

"আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কথা মেনে নিলুম। আমি ভুল দেখেছি।" গৌতম একইরকম ভাবে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, "দু' মাস ধরে জরিঅলার সঙ্গে তোমার দেখা নেই, তুমি কাজ আনছ কোত্থেকে ? কাজ আনছ, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে আসছ, কার সঙ্গে কারবার করছ তুমি ?"

"ও, এই কথা ! আমি কারও সঙ্গে কারবার করিনি রে ভাই। জরিঅলা যাবার আগে মাড়োয়ারির সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। আমি কাজ আনছি মাড়োয়ারির গদি থেকে। কাজ হয়ে গেলে জমাও দিচ্ছি সেখানে।"

"তা হলে সেখান থেকে টাকা এনে তুমি ভক্কাভাইয়ের টাকা দিচ্ছ না কেন ?"

মুজিবরদা হাসল। "তোরা মাঝে-মাঝে এমন অবুঝের মতো কথা বলিস না, যেন আমি মালিক হয়ে গেছি। আমি টাকা চাইলে মাড়োয়ারি দেবে কেন ? আমি ডিজাইনার, ডিজাইন দেখাই, কাজ আনি, কাজ হলে দিয়ে আসি। এর বেশি ক্ষমতা আমার নেই।"

এই সময় ইয়াকুব ভীষণ চটে উঠল। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "খামোস।" বোধ হয় কোনও হিন্দি সিনেমায় এইভাবে কাউকে 'খামোস' বলতে ও শুনেছিল। বলে এক সেকেন্ড থামল। তারপর বলল, "এখন এইসব ঝুট-ঝামেলার কথা মোর একদম ভাল লাগছে না। মুজিবভাই, তা'লে কি জরিঅলা না ফেরা পর্যন্ত মোরা না খেয়ে থাকব ?"

"আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। শেঠ কবে ফিরবে আমি জানি না। ততদিন কি মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে ?"

"তুমি মোদের বলে দাও, মোরা কী করব ?"

"আমি কী বলব বল। আমি নিজেই কপর্দকশূন্য। একটা ছেঁদা পয়সাও পকেটে নেই।"

"জরিঅলার বিবির কাছে ?"

"তার কথা আমি জানি না। তোরা যদি বলিস আমি চেয়ে দেখতে পারি।"

অনেকগুলো গলা একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, "তবে তাই দ্যাখো মুজিবভাই। জরিঅলা না ফেরা পর্যন্ত মোরা খেয়ে বাঁচি।"

খুব গম্ভীর থমথমে মুখে মুজিবরদা বলল, "যদি জরিঅলার বিবির কাছে না পাই, যদির কথা বলছি, যদি না পাই তখন কী করবি ?"

কেউ কোনও কথা বলল না। শুধু বাচ্চু বোকার মতো হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী করব ?"

মুজিবরদা হাসল না। আগের মতোই থমথমে মুখে বলল, "না। তখন আর কিছু করার থাকবে না। সবাইকে উইদাউট টিকিটে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। গাড়িতে চেকার ধরবে, ধরুক। রায়পুরে থাকা যাবে না। জরিঅলা না বলে দিলে এখানে এক পয়সার জিনিস ধারে পাওয়া যায় না। এখানে কোন ভরসায় থাকবি ?" মুজিবরদা উঠে পড়ল। "তবে অত হতাশ হবার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি ভাবীর কাছে। দেখি কী করা যায়। তোরা বসে থাকিস না। চাড্ডার কাজগুলো নামিয়ে দে। যে-কোনও সময় জরিঅলা এসে যেতে পারে। এসে যদি দ্যাখে কাজ না করে চাড্ডার সামনে বসে হল্লা করছিস তা হলে সে রেগে আগুন হয়ে যাবে। লোক তো ভাল না। তোদের বকবে। আমাকেও ছাড়বে না।"

মুজিবরদা বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে কেউ কাজে হাত লাগাল না। হল্লা চলতে লাগল। জরিঅলার বিবির কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে কি না তাই নিয়ে হল্লা। উইদাউট টিকিটে বাড়ি যাবার প্রসঙ্গও উঠল। বাইরে বেলা গড়িয়ে গেল। মেয়েদের স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ল। তিনটেয় ছুটি হয় ওদের। আমাদের নীচে দিলবাহার হোটেলে তেলেভাজার উনুনে আঁচ পড়ল। জানলা দিয়ে ধোঁয়া ঢুকতে লাগল আমাদের ঘরে। তখন বকে-বকে ক্লান্ত হয়ে আমরা হাতে সুচ নিয়ে কাজে বসে গেলাম। কাজ বেশি বাকি ছিল না। রাত আটটার মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ। সুতোগুলোকে ভাল করে পিটিয়ে পিটিয়ে সমান করা হল। শেষে শাড়ি চারখানা ভাঁজ করে চাড্ডা তুলে আমরা শুয়ে পড়লাম। আজ বিকেলে চা খাইনি। হাই উঠছিল ঘনঘন। জলখাবার খাইনি। মনে হচ্ছিল ভীষণ খিদে পেয়েছে। আজ খুব বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। বারবার মা, দাদা, বউদি আমার বন্ধ চোখের সামনে এসে ভিড় করছিল। রাত্রে খাওয়া জুটবে কি না তা নিয়েও একটা ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মুজিবরদা ফিরল দশটা নাগাদ। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কথাবার্তার শব্দে ঘুম ভাঙল। দেখলুম মুজিবরদা শাড়ি চারখানা হাতে নিয়ে আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। একে-একে সকলে উঠে বসল। মুজিবরদা বলল, "না রে। পাওয়া গেল না। ভাবীর কাছে টাকা নেই। জরিঅলা যা দিয়ে গিয়েছিল, সব ফুরিয়ে গেছে। উলটে ভাবী আমার কাছেই চাইল। তোরা কী করবি ?" আমাদের উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত থামল মুজিবরদা। "আমার পরামর্শ যদি নিস তা হলে আমি বলব তোরা স্টেশনে চলে যা। জামা-পাজামা-সুটকেস-ফুটকেস যা আছে থাক। যা পরে আছিস তাই পরেই চলে যা। হাওড়ার দিকে যে গাড়ি পাবি তাতেই উঠে পড়বি। সবাই এক কামরায় ভিড় করবি না। ছড়িয়ে উঠবি। যদি পুরীর গাড়িতে উঠিস তো খড়্গপুর নেমে পালটে নিবি। টাকা আর জিনিসপত্র যা রইল আমার জিম্মায় থাকল। আমি যদি টাকা পাই, তোরা পাবি। আমি নিজে নিয়ে যাব তোদের টাকা।" মুজিবরদা আবার থামল। এবারে বোধ হয় দম নেবার জন্য। থেমে একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, "আমারও তোদের সঙ্গে চলে গেলে ভাল হত। কিন্তু অত টাকা, সবাই মিলে চলে গেলে কী করে হবে। তাই গেলুম না। আমার জন্যে ভাবিস না। যে হোটেলে আমি খাই তার সঙ্গে কথা বলেছি। জরিঅলা না ফেরা পর্যন্ত আমাকে ধারে খাওয়াতে সে রাজি হয়েছে। আমি যাই। তোরা আর দেরি করিস না। আজ রাতটা গাড়িতে কোনওরকমে কাটিয়ে দে। কাল বিকেল নাগাদ বাড়ি ফিরেই গরম গরম ভাত পেয়ে যাবি।"

মুজিবরদা বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল তার।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে আর চাড্ডা পড়ল না ঘরে। চাড্ডা যেমন একপাশে দাঁড় করানো আছে তেমনই থাকল। ঘরময় পাতা থাকল আমাদের বিছানাগুলো। চাড্ডাহীন সকালটাকে মনে হল রোববারের সকাল। একটু বেলায় সকলের বাক্স-প্যাঁটরা হাতড়ানো হল। পাওয়া গেল পাঁচ টাকা ষাট পয়সা। তাই দিয়ে দুপুরবেলা ছাতু কিনে এনে খেলুম আমরা। দিন গড়িয়ে রাত নামল। আমরা কেউ ঘর ছেড়ে বেরোলুম না। কিন্তু সারারাত খিদের চোটে ঘুমোতেও পারলুম না। উপুড় হয়ে বিছানার ওপর পেট চেপে শুয়ে রইলুম। পরদিন শুধু জল খেয়ে কাটল সারাদিন। খুব গা গুলোচ্ছিল আর মায়ের কথা মনে পড়ছিল। আমরা চিরকালের গরিব। অথচ অনেক ভেবেও মনে করতে পারলুম না যে, কোনও দিন না খেয়ে রয়েছি। বাবার কাজ বন্ধ থাকলেও যা হোক করে মা চালিয়ে নিয়েছেন। হয়তো দিনের বেলা ভাত, রাত্তিরে মুড়ি। কিন্তু একদম না খেয়ে কোনওদিন থাকিনি। সারা দুপুর কারখানা ঘরে শুয়ে রইলাম। মন পড়ে থাকল হাওড়া জেলার সেই গ্রামে, যেখানে আমি একদিন জন্মেছিলুম। মাঝে-মাঝে ওরই মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। তখন স্বপ্ন দেখছিলাম খাবারদাবারের। যেন আমার চারপাশে থরে থরে সাজানো অজস্র খাবার। সব নাগালের মধ্যে, অথচ আমি তাদের ছুঁতে পারছি না।

মুজিবরদা শাড়ি চারখানা নিয়ে রাত্রে সেই যে নীচে নেমে গিয়েছিল তারপর আর তার দেখা নেই। আমরা গেলুম কী থাকলুম সে-খোঁজ নিতেও একবার এল না সে। সারা সকাল ধরে বোকার মতো ভেবেছি, মুজিবরদা নিশ্চয়ই টাকার সন্ধানে গেছে। তার দেশের এই ছেলেগুলো না খেয়ে আছে, যেভাবে হোক সে কিছু টাকার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কোথায় কী। সে যে শাড়ি চারখানা নিয়ে চলে গেছে আমরা তাও জানতুম না। সুদে টাকা ধার পাওয়া যায় যেখানে, তারা কাজকরা শাড়ি বাঁধা রাখে। সকালবেলা কে একজন শাড়ি বাঁধা দেবার কথা বলতে দেখা গেল কারখানায় শাড়ি নেই। ভেবেছিলুম তা হলে বোধ হয় মুজিবরদাই শাড়ি বাঁধা রেখে টাকা এনে আমাদের দেবে। এই ভাবনায় দিনের অনেকটা সময় নিজেকে সতেজ রাখলুম। তারপর যখন চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘণ্টা হয়ে গেল, লোকটার পাত্তা নেই, তখন গভীর হতাশায় ডুবে গেলুম। শাড়িগুলো হাতছাড়া করবার জন্য খুব কষ্ট হল আমাদের। যদি থাকত, বাঁধা দিয়ে কম করেও চার-পাঁচশো টাকা পেতুম। একবেলা করে খেলে ওই টাকায় দিন সাতেক বেঁচে থাকতুম আমরা।

নিজের চোখ-মুখ দেখা যাচ্ছিল না। আমার পাশে গৌতম শুয়ে ছিল। তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে ভীষণ কষ্ট হল আমার। মনে হল ছ' মাস ধরে কঠিন অসুখে ভোগা একটা রুগি শুয়ে আছে আমার পাশে। চোখের কোণে কালি। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। আমি তার দিকে চেয়ে আছি দেখে গৌতম চিঁহি চিঁহি করে বলল, "কী হবে আমাদের সত্যদা ?"

আমি কথা বললুম না। কথা বলতে ভাল লাগছিল না আমার। ঘুরে শুয়ে মাথা একটু উঁচু করে দেখলুম সারা ঘরে যারা শুয়ে আছে তারা সকলেই রুগি হয়ে গেছে। আমি মোসারফকে খুঁজছিলুম। কিন্তু দূরে দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছে বলে তার মুখ দেখতে পেলুম না। গৌতম ডাকল, "সত্যদা !" আমি কোনও সাড়া না দিয়ে তার দিকে ফিরলুম আবার। সে বলল, "বড্ড বমি-বমি পাচ্ছে।"

বললুম, "খালি পেটে বেশি জল খেলে বমি-বমি পায়। বেশি জল খাসনি। গলা শুকিয়ে গেলে একটুখানি খাবি।" কথাগুলো যখন বলছিলুম তখন নিজের গলা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলুম। যেন আমি নয়, আমার গলায় অন্য কেউ কথা বলল। বিশ্রী রকমের সরু হয়ে গেছে গলাটা।

সন্ধে হয়ে গেল। কিন্তু উঠে কেউ আলো জ্বেলে দিল না। রাস্তার আলোতে ঘরটা কীরকম যেন আলো হয়ে থাকল। রেলের কামরায় মতো। আসবার সময় ট্রেনের মধ্যে রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে যেতে সে-কথাটা মনে পড়ল আমার। একবার যেন বাবার কথাও মনে পড়ল। বাবা চেয়েছিলেন আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হই। সেই আমি বাড়ি থেকে কতদূরে এখানে না খেয়ে মরতে বসেছি।

এই সময় আমার মধ্যে যেন কী একটা হয়ে গেল। আমি আস্তে-আস্তে উঠে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। জোরে-জোরে বললাম, "না। এইভাবে ঘরে শুয়ে-শুয়ে আমাদের মরা চলতে পারে না।"

আমার গলা শুনে দু-চারজন উঠে বসল। কে যেন ঝিমুনির ঘোরে

পাশ ফিরতে গিয়ে ককিয়ে উঠল। আমি বললাম, "চল। সবাই মিলে আমরা জরিঅলার বিবির কাছে যাই।"

কে একজন বলল, "সেখানে মুজিব আছে। জরিঅলার বিবি দরজা খুলবে না।"

আমি বললুম, "তা হলে চল আমরা এমন কিছু করি যাতে আমাদের পুলিশে ধরে। পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে খেতে দেবে।"

কে যেন বলল, "ছাই দেবে। সিনেমা দেখে ফেরবার সময় আমাদের ধরেছিল। কিচ্ছু খেতে দেয়নি।"

সকলের কথা শুনে আমার ভেতরের কিছু করার ইচ্ছেটা যেন মরে যেতে বসল। শরীরেও তেমন সামর্থ্য ছিল না। মনে হল আমিও শুয়ে থাকি। তখন হঠাৎ ভক্কাভাইয়ের কথা মনে পড়ল আমার। যদি ইচ্ছে হয় তবে এই মানুষটা আমাদের খাওয়াতে পারে। হ্যাঁ পারে। নিশ্চয়ই পারে। ভক্কাভাইয়ের ওপর কেন যে আমার এতখানি বিশ্বাস হয়ে গেল কে জানে। আমি কাউকে কিছু না বলে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। মাথা ঘুরে গেল। দেওয়াল ধরে ফেলে সামলালাম। যখন বেরোচ্ছি, দেখলাম গৌতম তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মনে হয় কথা বলবার শক্তি ছিল না। তাই মুখে জিজ্ঞেস করল না কিছু। শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় নেমে এসে আমি অবাক। রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়া, আলো, দোকানপাট সব অন্য দিনের মতো। আমাদের জীবনে গভীর দুঃখের কোনও ছায়া পড়েনি কোথাও। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমি দাঁড়ালুম একটু। আমার খুব ইচ্ছে হল একটা কাগজে আমাদের দুঃখের কথা লিখে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে দেখি মানুষগুলি লেখা পড়ে কী করে। আমার মনে হল সেই লেখার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। কেন মনে হল কে জানে। ফলে ভক্কাভাইয়ের কাছে যাবার উৎসাহটাও আমার কেমন মিইয়ে গেল।

তবু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্নের শহরের রাস্তা হেঁটে আমি একসময় জুম্মান হোটেলের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। হোটেলটাও একইরকম আছে। ভক্কাভাই সেই কাউন্টারের পেছনে চেয়ারে। টেপ বাজছে। সন্ধেবেলা। হোটেল এখন ফাঁকা। দু-চারজন গল্প করছে ভেতরে। আমি আস্তে-আস্তে ভক্কাভাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে অবাক হয়ে ভক্কাভাই বলল, "আরে সত্কাম, তোরা এখনও রায়পুরমে আছিস। তোদের মালিক জরিঅলা তো ভেগে গেল। শুনলাম কি বোম্বাইমে কারখানা খুলা। এখানে আর কভি নেহি আয়গা।"

দারুণ জোরে ঢিপ-ঢিপ করে উঠল আমার বুকের মধ্যে। দাঁড়াতে পারছিলুম না। দু' হাতে কাউন্টার ধরে ফেলে বললুম, "আপনার টাকা?"

"হাঁ, হাঁ। আমার টাকা, মাড়োয়ারি গদিসে শাড়ি লায়া থা, উসকা টাকা, বাড়িঅলাকা পুরা একসালকা কেরায়া, জরি-বিক্নেবালা দোকানদারকা টাকা, কমসে কম তো দো লাখ টাকা বাকি। সবকোই মরবে তো হামিভি মরবে। ছোড়ো ইস বাতকো। ইত্না হতাশ হোনেকা কোই কারণ নেহি। যাদবকা বিবি এখনও এখানে আছে। হামার লোক পাহারা দিল। ও ভাগবার চেষ্টা করবে তো হামলোক ঘেরেঙ্গে উনকো।"

"ভক্কাভাই, জরিঅলার কাছে আমাদেরও টাকা বাকি।"

"হাঁ হাঁ। তোদের কত টাকা?"

"নব্বই-পঁচানব্বই হাজার হবে।"

"আরিব্বাস! ইত্না রুপিয়া! ইত্না রুপিয়া কাঁহে উস্কা পাস্ রহগিয়া?"

"উনি দেননি তো। শুধু আপনাকে একশো দিতেন। বাড়ি পাঠাবার জন্যে একশো আর হাতখরচা তিরিশ।"

"ও যাদবকো হাম কভি পাবে তো পহ্লে একঝাপড় মারে গা।"

"যাদবজিকে কোথায় পাবেন?"

"পাবে, পাবে। বিবি ভাগবার সময় পাকাড় যায়গা তো পরমান হো যায়গা কি যাদব আমাদের টাকা মারতে চাইল। তখন হিঁয়াসে পুলিশ ভেজা যায়গা বোম্বাইমে। সমঝা?"

আমি চোখ বুজলাম। চোখ বুজতেই আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। দু' চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলাম। যাদব জরিঅলার কাছে আমার পাওনা বেশি নয়। সে টাকা না পেলেও কিছু এসে যায় না। আমার পক্ষে কোনওরকমে বাড়ি ফিরে যেতে পারলেই হল। বাকি উনিশজনের নব্বই-পঁচানব্বই হাজার টাকা পড়ে আছে জরিঅলার কাছে। ভক্কাভাইয়ের কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি এই টাকা আর কোনওদিন তারা পাবে না। একদিকে তিন দিন না খেয়ে থাকার কষ্ট, অন্যদিকে এত টাকার শোক, আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ভক্কাভাই বোধ হয় আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলে উঠল, "তেরেকো কেয়া হুয়া সত্কাম? বেমার আদমি য্যায়সা লাগতা! কী হল রে? অ্যাঁ!"

আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। মনের যে শক্তি নিয়ে আমি

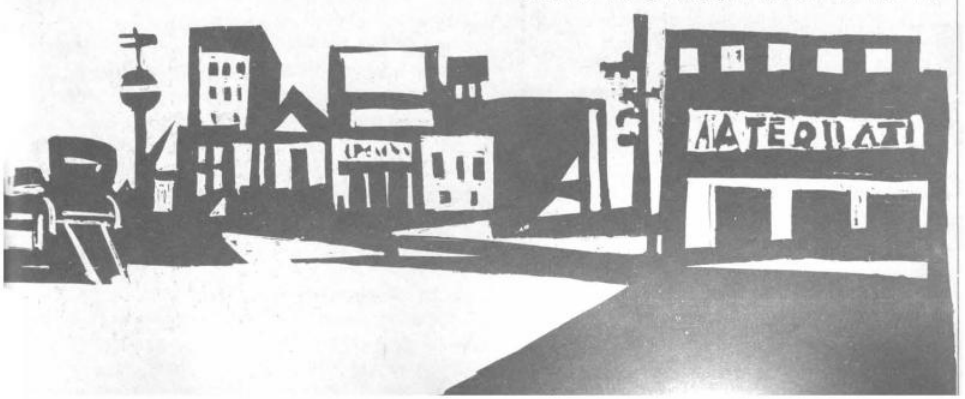

কারখানা থেকে নীচে নেমে হেঁটে জুম্মান হোটেল পর্যন্ত এসেছিলাম তার আর একফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না। পেটের ভেতরটা যেন কেমন পাকিয়ে উঠল। সেইটাই ঠেলে উঠে এল বুকের ওপর। সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল। কথা বলতে পারলুম না। বাচ্চা ছেলের মতো হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললুম।

ভক্কাভাই ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আরি! রো মাত্। কেনো কাঁদছিস?" জিভ দিয়ে শব্দ করল সে।"বোল বেটা, কেয়া হুয়া?"

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললুম, "আমরা তিনদিন কিছু খাইনি ভক্কাভাই। সেই পরশু দুপুরে আপনার এখানে খেয়েছিলুম। তারপর থেকে...।"

"কাহি খাসনি?" ভীষণ গলায় চিৎকার করে উঠল ভক্কাভাই।

আমি, তখনও ফোঁপাচ্ছি। বললুম, "কী করে খাব? আমাদের কারও কাছে পয়সা ছিল না।"

"তোদের কাছে খানেকাভি পয়সা নেই? যাদব তোদের খানেকাভি পয়সা দিল না? তিনরোজ খানা নেই?" বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল ভক্কাভাই। "এ কালুয়া! জলদি ইধার আ। শুন্।"

কাঁধের তোয়ালেতে হাত মুছতে-মুছতে কালুয়া সামনে এসে দাঁড়ালে ভক্কাভাই বলল, "কেয়া ভাই, তুনে যাদব জরিঅলাকা কারখানা জানতা হ্যায়?"

"জি, জানতা হ্যায়। দিলবাহার হোটেলকা উপর।"

"হাঁ। দৌড়কে যায়গা। লেড়কালোক সব হ্যায় উপরমে, উনকো বোলাকে লায়গা। বোলেগা, ভক্কাভাই বুলাতা হ্যায়।"

আমার কান্না থেমে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "না, না। আপনি ডাকছেন শুনলে ওরা ভয় পেয়ে যাবে। আপনাকে ওদের খুব ভয়। আমি যাব। আমি ডেকে আনছি।"

"তুনে সেকেগা বেটা?"

আমি সবেগে মাথা নাড়লুম। "হ্যাঁ। পারব।"

"তব একঠো রিকশা লিয়ে লে। এ কালুয়া, বোলাও একঠো রিকশা। হাঁ, হাঁ। রিকশা পর যা। হাঁটতে হোবে না। হামি আধাঘণ্টাকা অন্দর খানা রেডি করছি। তু সবকোইকো বোলাকে লে আ। বোলেগা যব তক্ যাদবকা সাথ ফয়সালা না হোবে তবতক ভক্কাভাই খিলাবে সবকোইকো। হাঁ। পয়সা দিতে হোবে না। পয়সাকা বাত্ পিছে। আরে ভাই, হামি কী করে জানব তোদের কাছে পয়সা নেই। পয়সা নেই তো উসদিন কাহে নেহি বোলা? ব্যস, স্রিফ এহি বাত, ভক্কাভাই, আমাদের কাছে পয়সা না আছে। স্রিফ এহি কয়নেসে কাম হো যাতা। তোরা ভাবলি কি হামি সিদ্ধি আছে? নেহি ভাই, সিদ্ধি নেহি, হাম পাঠান হ্যায়। পাঠান। সমঝা?"

আধঘণ্টার মধ্যে হল না। সন্ধেবেলা, তখনও খাবার-দাবার তৈরি হয়নি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে দেখা গেল আমরা কুড়িজন ছেলে জুম্মান হোটেলে মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছি। আমরা এসে পৌঁছবার পর ভক্কাভাই আমাদের খানিকটা শরবত খেতে দিয়েছিলেন। রোজার সময় এই শরবতটা নাকি ওরা খায়। এটা খেয়ে নিলে শুকনো গলা-বুক ভিজে যায়। অবশ্য শরবতে গলা-বুক ভিজিয়েও আমাদের খেতে কষ্ট হচ্ছিল। গলার কাছটা যেন কেমন হয়ে রয়েছে। গিলতে কষ্ট হচ্ছিল খাবার। তা হলে কী হয়, আমার বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল। এই সমস্ত ব্যাপারটা আমি করেছি ভাবতেই বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় হচ্ছিল আমার। সকলেই ভয়ানক কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে দেখছিল আমাকে। আমি যেন রাতারাতি নেতা হয়ে গেছি দলটার।

ভক্কাভাই সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়া দেখছিল আমাদের। জিজ্ঞেস করল, "মুজিবকা কেয়া খবর হ্যায়?"

আমি খেতে-খেতে সেদিন রাতের ঘটনাটা বললুম। তার বক্তৃতা, টাকা আনতে যাদব জরিঅলার বিবির কাছে যাওয়া, ফিরে এসে শাড়ি নিয়ে চলে যাওয়া, আমাদের গাড়িতে তুলে দেবার চেষ্টা, সব বললুম। তারপর থেকে যে আমাদের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি তাও জানালুম। শুনে ভক্কাভাই বলল, "তো ইয়ে বাত্ হ্যায়। ভাষণ দেকে মুজিব তোদের ভাগাতে চাইল। সা-ধু হোতে চাইল। লেকিন মুজিব হ্যায় মুজিব। সবসে পাজি। খতরনাক। আপনা দেশসে বাচ্চা-বাচ্চা লেড়কাকো উঠাকে লাতা হ্যায়, পয়সা নেহি দেতা, খানে নেহি দেতা, ও আদমি থোড়েই হ্যায়, জানোয়ার হ্যায়, জানোয়ার।"

আমরা সবে খেয়ে উঠেছি, কৌটো থেকে ভাজা মৌরি নিয়ে মুখে ফেলছি, একটা লোক ভীষণ জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে হোটেলের সামনে থামল। লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ওপরে উঠে এসে ভক্কাভাইকে বলল, "ও লোক আভি ভাগেগা। একঠো ট্রাক আয়া। ঘরকা সামান নিকালকে ট্রাকপর বোঝাই দেতা হ্যায়। ড্রাইভারনে বোলা ট্রাক বোম্বাই যায়গা।"

"কাঁহা যায়গা?"

"বোম্বাই।"

"ট্রাক লেকে বোম্বাই?"

"জি হাঁ। ড্রাইভারনে বোলা।"

ভক্কাভাই চেয়ারে বসে ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শুনা সত্কাম, ইয়ে রহমান হ্যায়। মেরা সি· আই· ডি·। ও বোলা যাদবকা বিবি ভাগতা হ্যায়।"

লোকটার কথা শুনে আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। তাই কেউ কিছু বললাম না। কিন্তু এত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে, বুকের হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল। তখন কথা বলবার শক্তিই হারিয়ে ফেললাম আমরা। ভক্কাভাই আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাল না। লোকটাকে বলল, "বহোত কাম করনা হোগা তুমকো। পহলে মাড়োয়ারি গদিমে যায়গা, উস্কা বাদ যায়গা সামসুদ্দিনকো দোকানপর, জানতা হ্যায় না সামসুদ্দিনকো? জরিকা দোকান, জরি বাগেরা বিক্রি করতা হ্যায়?"

লোকটা দ্রুত মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে।

ভক্কাভাই বলল, "সবসে পিছে যায়গা বাড়িঅলাকা হুয়া। যাকে বোলো যাদবকা বিবি ভাগতা হ্যায়। উস্কা কোঠিমে তুরন্ত আনে বোলো সবকোইকো। জলদি সে জলদি যায়গা, সমঝা? উঠ যাও সাইকেলপর। ভাগো।"

লোকটা মুখে কিছু বলল না। যেমন একটু আগে লাফ দিয়ে নেমেছিল যন্ত্রের মতোতেমনই লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ল সে। পেছন থেকে চেঁচিয়ে ভক্কাভাই আবার বলে দিল, "জলদি সে জলদি। সাইকেল মাত্ রুকো কাঁহি।" লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে জোর প্যাডেল করে বেরিয়ে যেতেই ভক্কাভাই আমাদের দিকে ফিরে বলল, "তোদেরওভি একঠো কাজ আছে। হামি থানায় যাবে। পুলিশ চাহিয়ে। পুলিশ লেকে দশ-পন্দেরো মিনিটের ভিতর হাম পৌঁছ যায়গা। স্রিফ এহি দশ-পন্দেরো মিনিট তোরা ট্রাক রুকবি। পারবি না?"

আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলুম, "পারব ভক্কাভাই।"

"তব্ দৌড়কে যা। জানতা হ্যায় না যাদবকা কোঠি?"

আবার সবাই আমরা একসঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি দু' হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি ভাববেন না। আপনার না যাওয়া পর্যন্ত আমরা ট্রাক আটকে রাখব। কিছুতেই ছাড়তে দেব না। আমরা যাদব জরিঅলার বাড়ি চিনি।" বলতে

বলতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি। শরীরের মধ্যে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠল। সকলের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম এরকম শুধু আমার একার হচ্ছে না। সকলেরই হচ্ছে। সকলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছিল। বললাম, "আপনি চলে যান থানায়। আমরা যাচ্ছি।"

হুড়মুড় করে জুম্মান হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বেরিয়েই ছুটতে আরম্ভ করলাম। পেছন থেকে চেঁচিয়ে ভক্কাভাই বলল, "আরে শুন্‌শুন্। তে লোক ক্যায়সে রুকেগা ট্রাক ? আগর ড্রাইভার স্টার্ট করে তো ক্যায়সে রুকেগা ?"

ভক্কাভাইয়ের কথার উত্তর দেবার জন্য আমরা আর দাঁড়ালাম না। ছুটতেই লাগলাম। লোকজন, গাড়িঘোড়ার মধ্যে দিয়ে পাগলের মতো ছুটছিলাম আমরা। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমাদের। তিন দিন অনাহারে থেকে খাওয়ার পর-পরই এই পরিশ্রম যেন আমাদের পিষে মেরে ফেলতে চাইছিল। বোধ হয় সাত-আট মিনিট লাগল। হাঁফাতে-হাঁফাতে জরিঅলার বাড়ির সামনে এসে দেখলাম ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। যাদব জরিঅলার এটা ভাড়া বাড়ি। সম্পূর্ণ ওপরতলাটা নিয়ে থাকত জরিঅলা। কিন্তু ট্রাকের সঙ্গে আর যাকে দেখলুম তাকে দেখে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। সে মুজিবরদা। ট্রাক মালপত্রে বোঝাই হয়ে গেছে। বোধ হয় যাদব জরিঅলার বিবির জন্য সেই বোঝাই ট্রাকের একপাশে নিরীহ ভালমানুষের মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল মুজিবরদা। আমরা খুব সময়মতো পৌঁছেছি। মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমাদের কুড়িজনকে একসঙ্গে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল মুজিবরদা। এত অবাক হল যে তার প্রথম কথাটায় তোতলামি এসে গেল। "তো-তো-তোরা ? তোরা বা-বা-বাড়ি ফিরে যাসনি ?"

"না। তুমি তাই চেয়েছিলে হয়তো। কিন্তু আমরা যাইনি।" বুকের মধ্যে ঢাক বাজছিল। দম আটকে আসছিল। তবু সেই অবস্থায় কথাটা বললাম আমি।

এর মধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছিল মুজিবরদা। আর তোতলাল না। জিজ্ঞেস করল, "তোরা অমন ছুটতে ছুটতে এলি কেন ? যাদব জরিঅলা এ-বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তায় একটা নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছে। সেখানে যাচ্ছে। তোদের দেখে মনে হচ্ছে খেয়েদেয়ে বেশ ভালই আছিস। কোথায় টাকা পেলি ?"

মাসুদ বলল, "পেয়েছি। কেন ? তুমি কি সেখেন থেকে ট্যাকা নেবে ?"

মুজিবরদা চটে গিয়ে বলল, "বড্ড বাঁকা বাঁকা কথা বলছিস। কী হয়েছে তোদের ?"

আমি বললাম, "আমাদের কী হয়েছে সে তো তুমি ভালই জানো মুজিবরদা। সেদিন রাত্রে অতবড় ভাষণ দিলে।" ভক্কাভাইয়ের মুখে শুনে ভাষণ কথাটা আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। এখন কাজে লাগাতে পেরে দারুণ আনন্দ পেলাম।

মুজিবরদা আর কথা বলল না। কীরকম যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল আমাদের। বাড়ির দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, "দেরি হো যাতা ভাবীজি। জলদি আইয়ে।"

তখনই ভাবীজিকে দেখা গেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। বেরিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে গেলেন। মুজিবরদার দিকে তাকালেন একবার। কিন্তু কোনও কথা বললেন না। তেমন লম্বা নন। তাই হুড়মুড় করে ট্রাকে উঠতে পারলেন না। কষ্ট করে উঠতে হল। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বার করে ডাকলেন, "আও মুজিব।"

১৯০৩ : এরোড্রোম

আমেরিকার অধিবাসী স্যামুয়েল পিয়েরপন্ট ল্যাংলে (১৮৩৪-১৯০৬) ছিলেন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি আমেরিকার বিখ্যাত মিউজিয়াম স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ল্যাংলে ১৮৮৭ সাল থেকে আকাশে ওড়া সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন। ১৮৯২-৯৩ সালে তিনি স্টিম এঞ্জিনযুক্ত চারটি মডেল-বিমান তৈরি করেন ও তাদের নাম দেন এরোড্রোম-০ থেকে এরোড্রোম-৩। বিমান চারটিই আকাশে উড়তে ব্যর্থ হয়। এর পর তাঁর এরোড্রোম-৪ (১৮৯৩) ও এরোড্রোম-৫ (১৮৯৪) দুটি মডেলই ব্যর্থ হয়।

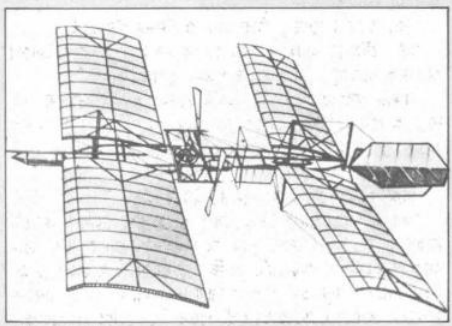

ল্যাংলের এরোড্রোম

তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলে ল্যাংলের বিমানের মডেল দেখে উৎসাহিত হন ও তাঁর প্রচেষ্টায় সামরিক বিভাগ যাত্রিবাহী বিমান তৈরির জন্য ল্যাংলেকে ৫০,০০০ ডলার অনুদান দেন। মহা উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলেন ল্যাংলে ও তাঁর সহকারী চার্লস ম্যানলি। ম্যানলি ছিলেন বিমানের এঞ্জিনের তত্ত্বাবধানে। অবশেষে ১৯০৩ সালে এরোড্রোম-এ শেষ হল। ৭ অক্টোবর এরোড্রোম ওড়ার জন্য প্রস্তুত। দেশ-বিদেশের ১০০ জন সাংবাদিক জড়ো হয়েছেন এই ঐতিহাসিক ঘটনা দেখতে। পোটোম্যাক নদীতে নোঙর-করা একটি হাউসবোটের ছাদে একটি ক্যাটাপুল্টের সাহায্যে এরোড্রোম আকাশে ওড়ার জন্য তৈরি, তৈরি বৈমানিক ম্যানলি। এঞ্জিন চালু করা হল। কিন্তু আকাশে ওড়ার বদলে নদীতে আছড়ে পড়ল এরোড্রোম। ম্যানলি কোনও আঘাত পাননি। মেরামত করে বিমানটি আবার ওড়ানোর চেষ্টা হয় ৮ ডিসেম্বর, কিন্তু আবার ব্যর্থতা, আবার ক্যাটাপুল্ট থেকে ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিমানটি নদীতে ডুবে যায়। ল্যাংলে তখনও জানতেন না তার আগের দিনই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশে উড়েছেন। ল্যাংলে এবং উইলবার ও অরভিল রাইটের সমসাময়িক কয়েকজনের নাম জেনে রাখা ভাল, আকাশে ওড়ার জন্য মানুষের প্রচেষ্টায় এঁরাও কিছু অবদান রেখে গেছেন। এঁরা হলেন : হোরেশিও ফিলিপ, ভিক্টর তাতিন, গুস্তাভ কখ, ই.পি. ফ্রস্ট, লরেন্স হারগ্রেভ, অক্টেভ ক্যানিয়ুট, পার্সি পিলচার।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মুজিবরদা এক লাফে উঠে পড়ল। চাপা রাগের সঙ্গে ড্রাইভারকে বলল, "জলদি স্টার্ট কিজিয়ে।"

আমরা একদম বোকা বনে গেলাম। এই মুহূর্তে কী করব বুঝে উঠতে পারলুম না। কথা বলে মুজিবরদাকে আর-একটু বেশি সময় আটকে রাখিনি বলে অনুশোচনা হচ্ছিল। রাস্তার ধারে একটা ছোটমতন মাঠ। সেই মাঠের ধারে বাড়ি। ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ওপর। আমরাও সবাই তাই। সেখানে দাঁড়িয়ে অনবরত রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু কেউ আসছে না। কোনও শব্দ নেই পুলিশের গাড়ির।

ড্রাইভার ট্রাকে স্টার্ট দিল। জীবন্ত হয়ে উঠল গাড়িটা। খুব জোরে একবার হর্ন বাজাল ড্রাইভার। আর দু-এক মুহূর্ত। এক্ষুনি হুশ করে বেরিয়ে যাবে। একবার বেরিয়ে গেলে আর কোনওদিন কিছু করতে পারব না আমরা। দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়ছি, তখন হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো ভাবনাটা আমার মাথায় এল। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলাম, "গৌতম, বাচ্চু, মাসুদ ! গাড়ির সামনে শুয়ে পড় সবাই। দেরি করিস না, শুয়ে পড়।" বলতে বলতে সকলের আগে গাড়ির চাকার সামনে টান হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। অমনি আমার দেখাদেখি সকলেই লাইন দিয়ে পরপর শুয়ে পড়ল মাঠের ওপর। ড্রাইভারের বিরক্ত গলা শুনতে পেলাম, "আরে ! এ কেয়া হুজ্জোত লাগা দিয়া !"

আনন্দে সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "ট্রাক নেহি যায়গা।" রায়পুরে আসার পর এই প্রথম হিন্দি বললাম আমি।

দরজা দিয়ে মুখ বার করে মুজিবরদা বলল, "এই মাসুদ, ফজলুর ! তোরা কী পেয়েছিস ? কেন যাবে না ট্রাক ? দেশে কি থানা-পুলিশ নেই ? এটা কি মগের মুল্লুক। উঠে পড়। উঠে পড় বলছি। না হলে তোদের গায়ের ওপর দিয়েই···।" তার কথা শেষ হল না, তার আগেই পুলিশ-জিপের সাইরেনের শব্দ পেলাম আমরা। সঙ্গে-সঙ্গে "নেহি যায়গা" বলে আবার চিৎকার করে উঠলাম। আনন্দে বুক ফেটে যাবার মতো হল আমাদের। পরক্ষণেই রাস্তা থেকে মাঠে নেমে ট্রাকের পাশে এসে থামল পুলিশের জিপ। ভক্কাভাই আর একদঙ্গল পুলিশ লাফ দিয়ে নেমে পড়ল জিপ থেকে। সেই সময়েই এসে পৌঁছল মাড়োয়ারির মোটর গাড়ি। সেই গাড়ি থেকে নামল মাড়োয়ারি, বাড়িঅলা আর জরির দোকানদার সামসুদ্দিন। ভক্কাভাই না বলে দিলেও মাড়োয়ারি নিজের বুদ্ধিতে তাদের তুলে নিয়ে এসেছে। আমরা অবশ্য তাদের কাউকেই চিনতাম না।

সকলে এসে পড়ায় আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। ভক্কাভাই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শাবাশ ! শাবাশ বেটা ! আমি ভাবলোম কি গাড়ি চলেই গেল। দেখিয়ে দারোগাসাহাব, গাড়ি স্টার্ট দে দিয়া। এ লোক সামনামে শো কর রুক দিয়া গাড়ি। আপ্‌কো বোলাথা না হাম। ইয়ে হ্যায় সত্‌কাম। জিতা রহ বেটা।"

হঠাৎ ছেলেগুলো সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "জয়, সত্যকামের জয়। না না। জয়, সত্‌কামের জয়।"

আমার ভীষণ লজ্জা করছিল। কিন্তু সেই লজ্জা নিয়ে এক মুহূর্তের বেশি বিব্রত থাকতে হল না। কেননা ছেলেদের গলার আওয়াজ মিলাতে না মিলাতে একের পর এক দারুণ সব ঘটনা ঘটতে লাগল। বিস্তর লোক জমে গেল মাঠটায়। ট্রাকের সব মাল নামিয়ে আবার জরিঅলার বাড়িতে তুলে দেওয়া হল। তার বিবিকে বলা হল, "আপ অন্দর যাইয়ে।" মুজিবরদাকে হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে ধরে নিয়ে গেল। তিনদিনের মাথায় মহারাষ্ট্র পুলিশের সাহায্য নিয়ে মধ্যপ্রদেশের পুলিশ বোম্বাই থেকে ধরে আনল যাদব জরিঅলাকে। থানার মধ্যে আমাদের সকলের সামনে ভক্কাভাই তার গালে ভীষণ জোরে একটা থাপ্পড় কষাল। পুলিশ তাড়াতাড়ি জরিঅলাকে সরিয়ে না নিলে ভক্কাভাই তাকে ঘুসিটুসিও মারত।

যাদব জরিঅলা সব টাকা সরাতে পারেনি। তার অনেক টাকা তখনও এখানকার ব্যাঙ্কেই ছিল। ফলে সকলের সব পাওনা হিসেব করে দিয়ে দিতে হল তাকে। শেষে দারোগা, ভক্কাভাই, মাড়োয়ারি, সকলে মিলে মিটিং করে জরিঅলাকে জানাল যে, তার এখান থেকে কারখানা তোলা চলবে না। বিদেশ থেকে সে এই ছেলেদের নিয়ে এসেছে, কারখানা তুলে দিলে এরা কী করবে ? কোথায় যাবে ?

চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদের একঝলক দেখে নিয়ে জরিঅলা বলেছিল, "ইয়ে লোক মেরা সাথ বোম্বাই যায়গা।"

ভক্কাভাই বলেছিল, "বহোত খুব সিদ্ধি ! হুঁয়া পৌঁছকে তুম বোলেগা নোকরি খতম, তব ? নেহিরে। তুমকো হিঁয়াই কারখানা চালানে হোগা। হাঁ। হিঁয়াই চালানে হোগা। ঔর উস্‌মে মুজিব নেহি রহেগা। উস্‌কো ঘর ভেজো।"

দারোগাসাহেব বললেন, "হাম্ মুজিবকো জেল ভেজেঙ্গে। উস্‌কা পাস পয়সা রহনেসেভি ও লেড়কা লোগোকো ভুখা মারনে চাহতা থা।"

যাদব জরিঅলা ভীষণ জব্দ হয়ে গেল। সকলের চাপে বোম্বাইয়ের কারবার গুটিয়ে তাকে রায়পুরের কারখানাই রাখতে হল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সে-কারখানায় আমার একদিনও কাজ করা হয়নি। ঘর ধুয়ে যেদিন প্রথম কারখানাঘরে চাড্ডা পাতা হল সেদিনই বাড়ি থেকে আমি একটা টেলিগ্রাম পেলাম। দাদা লিখেছে, "মা অসুস্থ। তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়।" কারখানার সমস্ত ছেলে ও ভক্কাভাই মিছিল করে আমাকে ট্রেনে তুলে দিল। নিজের পয়সায় টিকিট কিনে দিয়ে ভক্কাভাই বলল, "মা আচ্ছা হোনেসে তুরন্ত চলে আসবি। দের কর না মাত্।"

সকলের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আমি বাড়ি গিয়ে দেখলুম মা নেই। মা মরে গেছেন। তখন আর রায়পুর ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। ঠিক করলুম গ্রামে থাকব। কিন্তু গ্রামেও থাকা হল না। ভাসতে-ভাসতে চলে গেলুম আসানসোলে মাসিরবাড়ি। মেসোমশাই রেলে চাকরি করেন। আমার সব ইতিহাস শুনে বললেন, "তবে তুই আবার স্কুলে ভর্তি হয়ে যা। পড়াশোনা কর।"

আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলুম। আমার জীবনের ধারা একদম পালটে গেল। আমি লেখাপড়া শিখলুম। বি· এ· পাশ করলুম। মেসোমশাইয়ের চেষ্টায় রেলে চাকরিও পেয়ে গেলুম একটা। ট্র্যাভলিং টিকিট চেকারের চাকরি। সংক্ষেপে টি· টি· আই·। ভ্রাম্যমাণ টিকিট-পরীক্ষক।

রায়পুর ছেড়ে এসেছি তা হয়ে গেল বিশ বছর। ট্রেনে আমাদের টিকিট লাগে না। পাস। কতদিন ভেবেছি একবার রায়পুর যাই। ভক্কাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। গৌতম, বাচ্চু, মাসুদ, হায়দার, সকলে নিশ্চয় এখনও রায়পুরে আছে। কিন্তু যাওয়া হয়নি। বোধ হয় ফিরে যাওয়া যায় না। জন্ম থেকে মানুষ তো শুধু সামনের দিকে এগোয়। ফিরবে কী করে ?

আজকাল আর যাবার কথা ভাবি না। আজকাল রাত্রিবেলা গাড়িতে টিকিট পরীক্ষা করবার সময় আমার খুব মনে হয় যে,কারও না কারও সঙ্গে একদিন এই রেলের কামরাতেই দেখা হয়ে যাবে। গৌতম, বাচ্চু, মাসুদ, হায়দার, যে কেউ। এমনকী মুজিবরদাও। হবে নাই বা কেন ? আমরা সবাই একটা রেলগাড়িতে চেপেই তো জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছি। (সমাপ্ত)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

হৃৎপিণ্ডের পিছনের দিকের নানা ধমনী

করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি

(ডাঃ) মণীশ প্রধান

হৃৎপিণ্ডের সামনের দিকের নানা ধমনী

বাড়ির ছাদের চৌবাচ্চা জল ভর্তি। অথচ নীচের তলায় কোনও একটি কল খুলে যদি জল না পাওয়া যায়, তা হলে বুঝতে হবে বাড়ির ওই অংশে চৌবাচ্চা থেকে নীচের কল পর্যন্ত পাইপে কোথাও বাধা পড়েছে। জলের প্রবাহ ঠিক করার জন্য মিস্ত্রি ডেকে শিক দিয়ে বাধা অপসারণের চেষ্টা করা হয়। তাতে যদি কলে জল না আসে তখন পাইপ বদল করতে হয়। এই নীতি অনুসারে করোনারি ধমনী বা আটারিতে রক্ত চলায় বাধা পড়লে নতুন নলি বসিয়ে হার্টের রক্ত সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বাইপাস সার্জারি করা হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে হার্ট থেকে রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়ে দেহের সর্বত্র সরবরাহ হয়। সেই রক্ত কৈশিক নলির (ক্যাপিলারি) মধ্য দিয়ে শিরায় আসে। পরে ছোট ও মাঝারি শিরাগুলি দু'টি প্রধান শিরায় যুক্ত হয়। আরও দু'টি প্রধান শিরার মাধ্যমে হার্টে রক্ত ফিরে আসে। কোনও ধমনী বা শিরায় যদি বাধা পড়ে, তখন আশপাশের সমান্তরাল ধমনী ও শিরার মাধ্যমে রক্ত-চলাচল অব্যাহত থাকে। এতে শরীরের কাজ মোটামুটি চলে যায়। যেমন উত্তর কলকাতা থেকে ধর্মতলা যাওয়ার পথে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে ট্রাফিক বন্ধ থাকলে তখন একটু ঘুরপথে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড বা বিধান সরণি দিয়ে যানবাহন সচল রাখতে হয়।

হার্টের ভেতর থেকে রক্ত প্রধান ধমনী অ্যাওরটা ও তা শাখা-ধমনীর মাধ্যমে মিনিটে ৭০-৮০ বার শরীরের সর্বত্র পাঠানো হয়। হার্ট কিন্তু তার নিজের দরকারমতো রক্ত তার ভেতরের গহ্বর (চেম্বার) থেকে নিতে পারে না। শরীরের অন্য অঙ্গের মতো বিশেষ ধমনীর মাধ্যমে হার্ট তার দরকারমতো রক্ত পায়। করোনারি আটারি বা ধমনী হল হার্টের রক্ত সরবরাহের পথ। তিনটি প্রধান ধমনী হার্টে রক্ত সরবরাহ করে। যদি কোনও কারণে ওই ধমনীর কোনও একটিতে রক্ত চলা বন্ধ হয় বা ব্যাহত হয়, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। যদি রক্ত চলাচল জমাট বাঁধার ফলে পুরোপুরি বন্ধ হয় তখন ওই ধমনী হার্টের যেখানে রক্ত সরবরাহ করত সেই এলাকায় পেশীর কোষগুলি রক্ত না পাওয়ায় মরে যায়। এটাই সাধারণ মানুষের কাছে করোনারি থ্রমবোসিস নামে পরিচিত।

আগেই বলা হয়েছে, শরীরের অন্যত্র রক্ত চলাচল ব্যাহত বা বন্ধ হলে সমান্তরাল ধমনী দিয়ে সেই অংশে রক্ত চলার কাজ মোটামুটি চলে যায়। হার্টেও সমান্তরাল ধমনী আছে, তবে তা নামমাত্র। হঠাৎ রক্ত চলা বন্ধ হলে এই ধমনী কোনও কাজে আসে না। তরুণ বয়সে এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুহার অনেক বেশি। তবে ধূমপান ও অসম্পৃক্ত স্নেহ জাতীয় খাদ্যের প্রভাবে পরিণত বয়সে যাদের প্রধান ধমনী ও শাখা ধমনীর ভেতরের আস্তরণ কোলেসটেরল জাতীয় পদার্থ জমে পুরু হয়ে যায় ও ধমনীর ভেতরের ব্যাস কমে যায়, তাদের ক্ষেত্রে ওই সমান্তরাল ধমনীর সাহায্যে হার্টে রক্ত সরবরাহের কাজ কোনওরকমে চলে যায়। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর ফলে

করোনারি আর্টারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে থ্রম্বোসিস দেখানো হচ্ছে

হার্টের পেশী তার দরকারমতো অক্সিজেন বা খাবার পায় না। এদিকে হার্টের নিজের কাজের জন্য দরকারমতো রক্ত না পাওয়ায় চলাফেরা, সাধারণ কাজের সময়েও বুকে ব্যথা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ব্যথা কমে যায়। অনেক সময় বিশ্রামের সময়েও ব্যথা অনুভব হয়। এটা যেন প্রয়োজনের তুলনায় খাবার না পাওয়ায় হার্টের প্রতিবাদ। হার্টের এই লক্ষণকে বলা হয় 'এনজাইনা'।

এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় তা নিয়ে অনেকেই অনেক বছর ধরে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। বহু পুরনো ওষুধ এমিল নাইট্রেট সাময়িকভাবে করোনারি ধমনীতে রক্ত সরবরাহ বাড়াতে পারে। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে বার করতে হবে। হার্টকে তো পাম্প করে শরীরের সর্বত্র রক্ত পাঠাতে হয়। কিন্তু সে নিজেই যদি তার প্রয়োজনীয় খাবার না পায়, অক্সিজেন না পায়, সে কাজ করবে কী করে ?

বিশ্বের বড় বড় হাসপাতালে পরীক্ষা শুরু হল। লক্ষ্য একটিই : কীভাবে হার্টের রক্ত সরবরাহ আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। প্রথমে বুকের খাঁচার ভেতর দিকের ধমনীর মুখটা ঘুরিয়ে হার্টের আস্তরণের ওপর তাকে বসিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল। যেমন, নদী বা খালের মুখ ঘুরিয়ে শুকনো জমিতে জল সরবরাহ করা হয়, এটাও যেন সেরকমই একটি ব্যাপার। এর ফলে হার্টের আচ্ছাদনে রক্ত সরবরাহ বাড়ল, কিন্তু হার্টের পেশীর অভাব তাতে মিটল না।

১৯৩০ সাল থেকেই অপারেশন করে হার্টে রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু হয়েছিল। আমাদের বুকের খাঁচার সামনের অংশের ভেতর দিকের আস্তরণে অনেক ছোট ও মাঝারি আয়তনের ধমনী আছে। ভেতরের সেই আস্তরণ ধমনী সমেত ছাড়িয়ে নিয়ে হার্টের বাইরের দিকের আচ্ছাদিকার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রক্ত সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধির

চেষ্টা করা হয়। এই পরীক্ষামূলক অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডাঃ বেক। নানাভাবে তিনি চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু কোনও ভাল ফল পাওয়া গেল না। অপারেশনের ঠিক পরেই হার্টের ওপরের আস্তরণে রক্ত-সরবরাহ বাড়লেও, হার্টের পেশীতে রক্তের সরবরাহ বাড়েনি। বুকের খাঁচার ভেতরের যে আস্তরণ ছাড়িয়ে হার্টের ওপর জুড়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে খুব বেশি পরিমাণে তন্তুজাল সৃষ্টি হয়ে ধমনীর ওপর চাপ সৃষ্টি করায় সেগুলি বন্ধ হয়ে গেল কয়েক মাস পরে। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হল।

প্রাথমিক ব্যর্থতার পরে আর কেউ এই কাজে এগিয়ে আসেননি। ১৯৪৬ সালে আবার একবার চেষ্টা হল। বুকের খাঁচার সামনের অংশের পিছন দিকে একজোড়া বড় ধমনী আছে, তার নাম ইন্টারনাল ম্যামারি ধমনী। এই ধমনী দু'টিকে তন্তুজাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এবারে হার্টের পেশীর মধ্যে জুড়ে দেওয়া হল। ১৯৫০ সাল থেকে ডাঃ ভাইনবার্গ এই পদ্ধতিতে অপারেশন শুরু করলেন। বেশ কয়েক বছর এই অপারেশন করার পরে তার ফলাফল সমীক্ষা করে দেখা গেল, এই পদ্ধতিতে অপারেশন করে সুফল পাওয়া যাবে না। এই পদ্ধতিতে ধমনী থেকে তন্তুজাল ছাড়িয়ে নেওয়ায় আগের মতো ধমনীতে চাপ না পড়লেও ধমনীর মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় রক্ত পাওয়া গেল না। এর কারণ ঠিক মতো জানা ছিল না। হয়তো ওই ধমনীর ভেতরের আস্তরণেও স্নেহ জাতীয় পদার্থ জমে তার ভেতরের ব্যাস কমে গিয়েছিল।

দেখা গেল, দু-একজন রোগীর ক্ষেত্রে ৫০ মিলিলিটার রক্ত সরবরাহ পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে মিনিটে ৫-১০ মিলিলিটারের বেশি রক্ত হার্ট পর্যন্ত যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হল।

অবশেষে ১৯৬৭ সালে অপারেশন করে হার্টে রক্ত সরবরাহের চেষ্টায় নাটকীয়ভাবে সাফল্য এল। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হল 'বাইপাস সার্জারি'। এই অপারেশনের নাম অনেকের কাছেই আজ আর অজানা নেই। পথ বন্ধ থাকলে, মানুষকে যেমন কোনও বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়, যানবাহন চালাতে হয়, করোনারি ধমনী বাইপাস সার্জারিতে সেই নীতিকে ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এখানে হার্টে রক্ত পৌঁছে দেওয়ার পথ ছিল না। পথ তৈরি করে নেওয়া হয়। বাড়ির জলের পাইপ নষ্ট হয়ে গেলে নতুন পাইপ বসানো হয়, পুরনো পাইপ ফেলে দেওয়া হয়; এখানেও নতুন রক্তনালী বসানো হয়, তবে পুরনো ধমনী বাদ দেওয়া হয় না।

এই পদ্ধতিকে এক ধরনের 'গ্রাফ্‌ট' অপারেশন বলা যায়। গ্রাফ্‌ট অপারেশনের যা সমস্যা, এই অপারেশনে তা দেখা দিতে পারে। অন্যের শরীর থেকে কোনও কোষ-তন্তু যদি কারও শরীরে বসিয়ে দেওয়া হয়, তার প্রথম ও প্রধান সমস্যা হল 'বর্জন'। গ্রাহক শরীর নিজের গোষ্ঠী ছাড়া অন্যের যন্ত্র বা শরীরের কোনও অংশ নিতে চায় না। যাতে এরকম না হয়, সেজন্য গ্রাহক শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ওষুধ ব্যবহার করে কমিয়ে নেওয়া হয়।

বাইপাস সার্জারির সময় যাতে এই অবস্থা না ঘটে সেজন্য রোগীর নিজের শরীরের অন্য জায়গা থেকে রক্তনালী ব্যবহার করা হয়। এতে অন্তত 'বর্জন' সমস্যা থাকবে না। তবে এই অপারেশনে কোনও ধমনী ব্যবহার করা হয় না, শরীরের শিরা নিয়ে হার্টের উপর জুড়ে দেওয়া হয়।

অপারেশনের জন্য রোগী নির্বাচনের আগে অ্যানজিওগ্রাফি করে দেখে নিতে হবে ক'টি করোনারি ধমনী ও ধমনীর কোথায় রক্ত প্রবাহ থেমে আছে। যে ধমনী বন্ধ তার পাশে শিরা বসিয়ে রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

অপারেশনের জন্য দু'টি সার্জিকাল টিম একই সঙ্গে কাজ করেন। একটি দল রোগীর পা ও উরু থেকে লম্বা স্যাফেনাস শিরা বার করে নেন। ওই সময়ে অন্য দল বুকের মাঝখানের হাড় চিরে হার্টের উপরে আবরণী কেটে করোনারি ধমনীর আশপাশের তন্তুজাল সরিয়ে নেন। অন্য টিমও স্যাফেনাস শিরার উপরের তন্তুজাল তুলে শিরার পেশী স্তর বার করে, করোনারি ধমনীর যেখানে অবরোধ হয়েছে, তার নীচের অংশে শিরার নীচের অংশ জুড়ে দিয়ে উপর অংশ অ্যাওরটার সঙ্গে

১৯৬৭ সালে অপারেশন করে হার্টে রক্ত সরবরাহের চেষ্টায় নাটকীয়ভাবে সাফল্য এল। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হল 'বাইপাস সার্জারি'। এই অপারেশনের নাম অনেকের কাছেই আজ আর অজানা নেই। পথ বন্ধ থাকলে মানুষকে যেমন কোনও বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়, যানবাহন চালাতে হয়, করোনারি ধমনী বাইপাস সার্জারিতে সেই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়েছে।

দীর্ঘ স্যাফেনাস শিরা ও তার শাখা-প্রশাখা

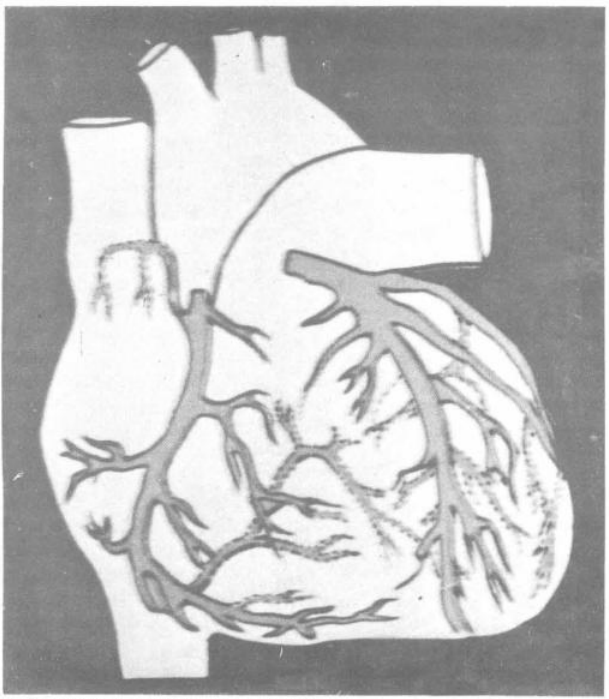

হৃৎপিণ্ড ও নানা শাখাসমেত দক্ষিণ ও বাম করোনারি ধমনী

জুড়ে দেন। শিরার উপরে তন্তুজাল পরিষ্কারভাবে তুলে না নিলে গ্রাফ্‌ট ঠিকমতো নেবে না। আর যদি নেয় পরে জট সৃষ্টি করে শিরার ওপর চাপ দিয়ে ভিতর দিয়ে রক্ত চলার পথ বন্ধ করে দিতে পারে।

আমেরিকাতে ডাঃ ফ্যাভালারো এই পদ্ধতিতে অপারেশন শুরু করেন। পা থেকে স্যাফেনাস শিরা কেটে নিয়ে তাকে ছোট-ছোট অংশে ভাগ করে হার্টের যে করোনারি ধমনীতে রক্ত-চলা কম হয়েছে বলে অ্যানজিওগ্রাফিতে ধরা পড়েছে সেই ধমনীর পাশে শিরা বসিয়ে ধমনীর যেখানে অবরোধ হয়েছে, শিরাকে তার নীচের অংশে ধমনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। উপর দিকে শিরা জুড়ে দেওয়া হয় অ্যাওরটার সঙ্গে। এর ফলে হার্টের যে অংশে রক্ত যাচ্ছিল না, সেই অংশে আবার রক্ত প্রবাহ শুরু হয়।

ডাঃ ফ্যাভালারো এই পদ্ধতিতে প্রথমে দক্ষিণ করোনারি ধমনী অবরোধের চিকিৎসা করেন। এই পরীক্ষায় প্রথমে ভাল ফল পাওয়াতে ডাঃ জনসন বাম করোনির ধমনী অবরোধে ওইভাবে স্যাফেনাস শিরা বাইপাস গ্রাফ্‌ট বসান হল। আগে বাঁ করোনারি ধমনীর অপারেশনের পরে শতকরা ৫০ জনের মৃত্যু হত। পরে অপারেশন পদ্ধতির উন্নতি, অ্যানেসথিসিয়ার উন্নততর প্রক্রিয়ায় মৃত্যুহার কম হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে আমেরিকার সার্জিকাল অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ডাঃ জনসন জানালেন, তাঁর ৩০১টি অপারেশনে মৃত্যুহার শতকরা ১২টি।

এর পরে আর-একজন শল্য চিকিৎসক ডাঃ গ্রিন এক নতুন পদ্ধতিতে অপারেশন আরম্ভ করেন। তিনি স্যাফেনাস শিরার পরিবর্তে বাঁ দিকের ইন্টারনাল ম্যামারি ধমনী, বাঁ করোনারি ধমনীর সঙ্গে যুক্ত করে ইন্টারনাল ম্যামারির রক্ত প্রবাহ করোনারি ধমনীতে নিয়ে এলেন। অনেকটা যেন ব্রহ্মপুত্রের জল মজে যাওয়া গঙ্গা নদীতে চালনা করা। এই অপারেশনের ফল বেশ ভাল। শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ বছর রক্তপ্রবাহ ভাল থাকে। কিন্তু সাফল্য সত্ত্বেও তাঁকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কারণ আগের ইন্টারন্যাল ম্যামারি অপারেশনে ফল ভাল হয়নি। কিন্তু আগের অপারেশনে ম্যামারি ধমনীকে হার্টের মধ্যে বসানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাকে করোনারি ধমনীর অবরুদ্ধ জায়গাটির নীচে জুড়ে দেওয়া হয়।

১৯৮১ সালে আমেরিকায় ১৪০,০০০ বাইপাস সার্জারি হয়েছে। যাদের হার্টে রক্ত সরবরাহ কম হওয়ার জন্য ব্যথা হয়, এবং ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও ব্যথা কমে না, তখনই অপারেশনের কথা ভাবতে হয়। যে রোগীদের তিনটি ধমনীতে অবরোধের জন্য হার্টে রক্ত চলাচল ব্যাহত এবং বুকে ব্যথা হয়, এই অপারেশনের পরে সেই ব্যথা উপশম তো হয়ই, বহু ক্ষেত্রে করোনারি ধমনীর রোগে মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

করোনারি ধমনীতে রক্ত প্রবাহ কম হলে বুকের ব্যথার জন্য এতদিন ওষুধের ওপর নির্ভর করতে হত। যাদের একটি বা দু'টি ধমনী অবরুদ্ধ, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যেত। তবে অপারেশনে ওষুধের চেয়ে ভাল ফল দেখা যায়, আর রোগীরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে কাজে ফিরে যেতে পারছে।

এই অপারেশন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। দেশেই এই অপারেশনে খরচ লাগে ৫০,০০০ থেকে ৯০,০০০-এর কাছাকাছি। স্বভাবত যারা খুব ধনী তারাই এই অপারেশনের সুযোগ নিতে পারে। ইউরোপ-আমেরিকায় অপারেশনের খরচ আরও বেশি।

বাইপাস সার্জারিতে ভাল ফল দেখে আশা করা গিয়েছিল, হার্টে রক্ত পাঠানোর সমস্যার সমাধান বোধ হয় হয়ে গেল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। কারণ, ধমনীর মধ্যে চর্বি জমে যাওয়ার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। এ ছাড়া ধূমপানের অভ্যাসের জন্য রক্তে লিপিড জাতীয় জিনিসের পরিমাণ বাড়তে থাকে। নতুন রক্তনালীতে চর্বি জমে ওই সমস্যা আবার দেখা দেয়। খোঁজখবর নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি, কারও কারও করোনারি ধমনীর অপারেশনের পর আবার নতুন করে অসুখ হয়। কলকাতা শহরে এক সার্জন ব্যক্তিগত আলাপে জানালেন, তাঁর হাতে শতকরা ৩০টি ক্ষেত্রে অপারেশনের পরে আবার করোনারি ধমনীর বিকল্প নালীও অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে হার্টে ম্যামারি ধমনী বসিয়ে এখন ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আসলে অপারেশনটাই সব নয়, মানুষের জীবনের ধারাটাই পালটাতে হবে, তা না হলে নতুন বসানো ধমনীও অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

ফ্যাক্স যন্ত্রের আধুনিক মডেল মিনিফ্যাক্স

কোনও ছবি, নকশা, চার্ট বা সাধারণ লেখা—নথিপত্রের চেহারা যেরকমই হোক না কেন 'ফ্যাক্স' যন্ত্র নিমেষের মধ্যে তার কপি পৌঁছে দেবে এক জায়গা থেকে অন্য আর-এক জায়গায়। ফ্যাক্সিমিলি ট্রান্সমিশন বা ফ্যাক্সই হল নথিপত্রের কপি পলকে চালান করার একমাত্র সহজ পথ। সারা পৃথিবীতেই ফ্যাক্স যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবং তার এই চাহিদার ফলে এখন তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের নতুন মডেল। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স কম্পানি ফ্যাক্স-এর একটি ডেস্কটপ মডেল বের করেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মিনিফ্যাক্স'। এর থেকে যে-কপি বেরোয় সেটা সাড়ে এগারো ইঞ্চি লম্বা, ন' ইঞ্চি চওড়া। যন্ত্রটির বিশেষ গুণ হল : এটা কাজ করে নিঃশব্দে ; পাঁচ কপি পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে এবং কখন কোন নথি কাকে পাঠানো হল তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলে নিজে-নিজেই। এ ছাড়া যন্ত্রটিকে বেহিসেবি ব্যবহার থেকে বাঁচানোর জন্য রয়েছে বিশেষ 'কোড'-এর ব্যবস্থা এবং সাধারণ জেরক্স মেশিনের মতো কোনও নথির কপিও করে দিতে পারে এই যন্ত্রটি। সব মিলিয়ে, মামুলি টেলিফোনের মতোই সহজ সরল মিনিফ্যাক্স-এর ব্যবহারে কায়দা। ফলে এর জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য রোবট

ছক-বাঁধা কাজে অথবা কারিগরি নির্মাণশালায় রোবটের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। এ ছাড়া মানুষের পক্ষে কঠিন এবং ক্ষতিকর কাজেও রোবট এগিয়ে এসেছে সমস্যার সমাধানে। যেমন, রং করার কাজ, খনিগর্ভের বিপজ্জনক কাজ অথবা নিউক্লীয় শিল্প কেন্দ্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইত্যাদি। সুতরাং এ-কথা বলা যায়, স্কুল-ছাত্রদের মধ্যে রোবট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার কাজটা বর্তমানে নিতান্ত জরুরি। এই প্রয়োজনের কথাটা মাথায় রেখেই চণ্ডীগড়ের 'হরিয়ানা স্টেট ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ তৈরি করেছে ভারতের প্রথম শিক্ষামূলক রোবট। এই রোবটটি আসলে একটি যান্ত্রিক বাহু। এর কাজকর্মের ধরন অনেকটা মানুষের হাতের ধরনে তৈরি। যেমন, কোনও নির্দিষ্ট জিনিস এক জায়গা থেকে তুলে আর-এক জায়গায় রাখতে পারে, কম্পিউটারের প্রোগ্রাম অনুযায়ী অনেকগুলো জিনিসকে চাহিদামতো সাজিয়ে ফেলতে পারে। এই রোবটটি তৈরি করা হয়েছে ভারতীয় মাইক্রোকম্পিউটার 'এস সি এল—ইউনিকর্ন'-এর সাহায্যে। স্কুলের ছাত্ররা এই রোবটটির কার্যকলাপ ও নানা পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখে যে রোবট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

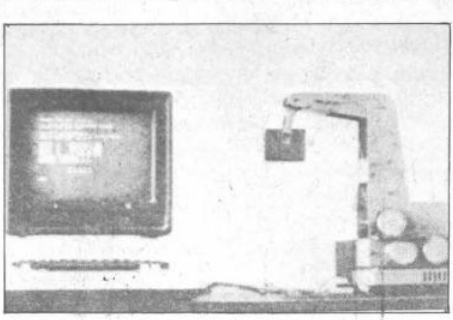

সমুদ্র-সৈকত পরিষ্কার রাখতে

সমুদ্র-সৈকত পরিষ্কার রাখা বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। যেমন সময় তেমনই পরিশ্রম খরচ করতে হয় সৈকত সাফাইয়ের পিছনে। কারণ, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা পড়ে থাকে সৈকতে : সমুদ্রের আগাছা, খালি বোতল, টিনের কৌটো, কাগজ, পলিথিনের প্যাকেট, সিগারেটের টুকরো, এ ছাড়া বালিতে লুকিয়ে থাকা কাচ বা পাথরের টুকরো। ভ্রমণবিলাসীদের নিরাপত্তার জন্য এই সাফাই অত্যন্ত জরুরি।

সম্প্রতি জাপান একটি আধুনিক সৈকত সাফাইয়ের যন্ত্র তৈরি করেছে। পুরনো ধাঁচের যন্ত্রের তুলনায় নতুন এই যন্ত্রটির কর্মক্ষমতা অনেক বেশি। যে-কোনও বালির সৈকতে নিরাপদে চলতে পারে এই যন্ত্র এবং এর ধারালো ফলা কুড়ি সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত বালি খুঁড়ে বাছাই করতে পারে আবর্জনার টুকরো—যেমন, কাচের বা সিগারেটের ছোট টুকরো। এর মধ্যে রয়েছে একটি ঝাঁকুনি খাওয়া ছাঁকনি। এর সাহায্যে বালি পড়ে থাকে বালির জায়গায়, আর আবর্জনা ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়। এ ছাড়া সংগৃহীত আবর্জনা ট্রাকে বোঝাই করার জন্য এর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী বড় মাপের হপার, আর খুশিমতো এর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

অনুসন্ধানী

?
যাচ্চলে ! যথেষ্ট বারুদ নেই···এখন কী করি ?···গুলি ফুরিয়ে গেছে···
না, কুট্টুস, এতে চলবে না । আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে । কাজে হাত দেওয়া যাক ! আর-একটা রাস্তা খোঁড়ার চেষ্টা করতে হবে···
বেশ । তবে ভেবো না পাঁচ মিনিটে বেরিয়ে যেতে পারবে···
এই তো···আস্তে হলেও কাজ ঠিক এগিয়ে চলেছে···কুট্টুস,দেখিস আমরা ঠিক পৌঁছে যাব । আয়, আর-একটু চেষ্টা কর···আরে ! মাটিটা ভেজা মনে হচ্ছে···
আমাকে বলতে হবে না··· গন্ধটাও কেমন অদ্ভুত !

আমেরিকায় টিন টিন

আরেব্বাস !···তেল !···তরল ঐশ্বর্য, কিন্তু তুলে নেবার লোক নেই !
তাজ্জব ! আর আমি ভাবতাম তেল আসে টিন থেকে !
আচ্ছা, বাপু ! এই চুক্তিপত্র, সই করো । তোমার তেলের কুয়োর জন্যে পাঁচ হাজার ডলার দিচ্ছি !
ক-কী করে জানলেন এখানে তেল পাওয়া গেছে ?···তেল বেরিয়েছে দশ মিনিটও হয়নি···
ব্যবহারিক জ্ঞান, বুঝলে খোকা ! নির্ভুল মার্কিন ব্যবহারিক জ্ঞান ! কখনও ব্যর্থ হয় না !
জোচ্চোরটার কথা শুনো না !···এখানে সই করো ! দশ হাজার ডলার দেব··· !
এই, সই কোরো না ! আমি পঁচিশ হাজার দেব !
পঞ্চাশ হাজার !!
এক লাখ !!!
মশাইরা, আমি অত্যন্ত দুঃখিত । এই তেলের কুয়ো আমি বিক্রি করতে পারি না । এর মালিক কালো-পা ইণ্ডিয়ানরা, যারা দেশের এই অঞ্চলে বাস করে···
এ-কথা আগে বলোনি কেন ?
শোনো, সর্দার ! পঁচিশ ডলার দিচ্ছি । আধ ঘণ্টার মধ্যে মালপত্তর নিয়ে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে !
পাঁশুটে-মুখ কি পাগল হয়ে গেছে ?
এক ঘণ্টা বাদে···
দু' ঘণ্টা বাদে···
তিন ঘণ্টা বাদে···
CACTUS & PETROLEUM BANK INC.
পরদিন সকালে···
অত হইচই কেন ?
এই, শোনো তুমি কি জানো না, শহরে উদ্ভট পোশাক পরা নিষেধ ? গাড়ির সামনে থেকে সরে যাও !···তুমি কোথায় আছ বলে মনে করছ ?···এটা কি বুনোদের এলাকা ভেবেছ ?

টিমির ভুল না হলে সোনার বাটগুলি এখানেই আছে ! ধাক্কা দাও !
অসম্ভব ! টিমি কখনও ভুল করে না, ডিক !
তোমরা দু'জন টানতে থাকো··· হেইও হো !
শুরু করছি··· হেইও জোয়ান ! ডালা সরে যাচ্ছে !
উফ্ !
এই তো ! সোনার তরীর সেই ধনরত্ন !!
হুররে ! পঞ্চরত্ন আবার কেল্লাফতে করেছে !!
কিরিন গ্রামে···
দিনকাল এমন হয়েছে···
মিসেস মার্টিন, ভেবে দেখুন, আজ সকালেই শুনলাম কাল যে-দুটো ডাকাতকে ধরেছিল তারা জেলের হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে !
?
এখনও তাদের ফের ধরতে পারেনি !
আরে···ওই বাচ্চা মেয়েটা এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছে ?
তাড়াতাড়ি ওদের সতর্ক করে দিতে হবে ! ওরা একেবারে ডাকাতদের সামনে পড়ে যেতে পারে !

ওদের খুঁজে বের করতে অ্যানের কিছু অসুবিধে হচ্ছে··· এবং সে জানে মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত···
জর্জ ! জুলিয়ান ! ডিক !
অ্যান তাড়াতাড়ি ওদের খবরটা দিল ।
এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে ! ওরা যে-কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে !!!
ঠিক কথা, এখানে থাকা উচিত নয় !
হ্যাঁ···এটা সত্যিই পুলিশের কাজ ! খবরটা অবশ্যই ইন্সপেক্টরকে দিতে হবে !
এবং আশা করব অন্তত একবার ওরা ঠিক সময়ে আসবে !
আমি জানি কী করতে হবে ! পুলিশে খবর দেবার আগে বাটগুলি কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক । তা হলে এগুলি ফের হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না !
উফ ! এটাই শেষ !
এই কুয়োটা আদর্শ জায়গা নয়, তবে সম্ভবত এটাই একমাত্র জায়গা ।
এবার পুরনো কবরের ডালা বন্ধ করতে হবে !
শোনো ! একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি !
চলো, ঘণ্টা-ঘরে লুকিয়ে পড়ি ।
হ্যাঁ, ওরাই আসছে !

জেনকিন্‌স স্কুল, কোচবিহার

একশো আঠাশ বছর আগে যে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই বিদ্যালয় আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এই সমৃদ্ধি অবশ্য একদিনে ঘটেনি, সুদীর্ঘকাল ধরে নানা বাধা-বিপত্তি উত্থান-পতন আর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব হয়েছে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দেয়। হিমালয়ের পাদদেশে রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত কোচবিহারেও সেই আলোড়নের ঢেউ আছড়ে পড়ে। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবীও রাজকুমার এবং রাজকর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ১৮৫৭ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথম দিকে সেই বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ১৮৫৯ সাল থেকে। শোনা যায়, মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণই কোচবিহারের রাজাদের মধ্যে প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি এই অঞ্চলে ১৮৬১ সালে প্রথম ইংরেজি স্কুল 'জেনকিন্‌স স্কুল' স্থাপন করেন। এই স্কুল স্থাপনে আর-এক জজের অবদান কম নয়। তিনি হলেন মেজর জেনারেল ফ্রানসিস জেনকিন্‌স। ফ্রানসিস জেনকিন্‌স ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট ও কমিশনার

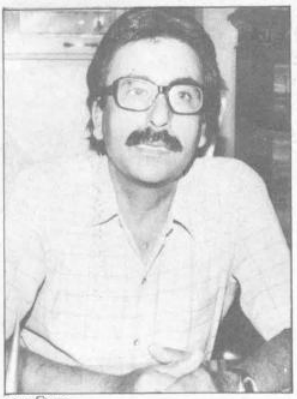

প্রধানশিক্ষক

অব সার্ভে পদে কাজ করতেন। কোচবিহারের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ যখন বয়েসে নবীন, সেই সময় জেনকিন্‌স-সাহেব তাঁর রাজ্যে বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম করেন এবং কোচবিহারের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী হন। এইসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে পরবর্তীকালে কিছু অর্থ উপহার দেন। জেনকিন্‌স-সাহেব সেই অর্থ না নিয়ে কোচবিহারে শিক্ষাপ্রসারের জন্য স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দেন। জেনকিন্‌স-সাহেবের নাম অনুসারে এই স্কুলের নামকরণ হয় জেনকিন্‌স স্কুল।

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাইরের সঙ্গে এই জেলার যোগাযোগ স্থাপন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে এই জেলার রাজা-মহারাজাদের অবদান অপরিসীম। স্কুল স্থাপনের বহু বছর পরেও রাজপরিবার স্কুলের কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি এবং তাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দিতেন।

কোচবিহার শহরের বিখ্যাত সাগরদিঘির পুব দিকটায় পাঁচ-ছ'টি ঘর নিয়ে স্কুল বসত। ১৮৯৭ সালে এক প্রবল ভূমিকম্পে স্কুলের ঘরগুলির বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় তখন মহারাজার ইচ্ছানুযায়ী স্কুলটি স্থানান্তরিত হয় রাজবাড়ির ভেতরে। রাজবাড়ির যে দিকটায় স্কুল বসত তারই পাশে এখন ভিক্টোরিয়া কলেজও চলছে। সেই ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বরেণ্য দার্শনিক, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

স্কুলের বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয় ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি। কোচবিহার শহরের ঠিক মাঝখানে একটি ব্যস্ত রাস্তার কোল ঘেঁষে যেন পাশাপাশি হাত ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে জেনকিন্‌স স্কুল আর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়। প্রায় নব্বই বছরের পুরনো ঈষৎ লাল রঙের স্কুলভবনটির পাশে নতুন স্কুল বাড়িটিও দেখবার মতো। পুরনো এবং নতুনের মাঝখানে বিশাল এক সবুজ মাঠ। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই, নিয়মের কড়াশাসন সব সময় যেন এখানে টহল দিয়ে যায়। প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর স্কুল বসে প্রতিদিন

১০-৪০ মিনিটে। স্কুল আরম্ভ হলে সচরাচর আর কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বর্তমানে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৯০০। শিক্ষকের সংখ্যা ৪০ জন। স্কুলের গ্রন্থাগারটিও বেশ বড়, ১৫ হাজারের মতো বই আছে। মূল্যবান বহু দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। কিন্তু একজন গ্রন্থাগারিকের অভাবে অনেক বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জানালেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক কল্লোল চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তী ১৯৮৩ সাল থেকে এই স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে আছেন। এর আগে মুর্শিদাবাদ সরকারি স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। কথা প্রসঙ্গে কল্লোলবাবু জানালেন, "এই স্কুলের অতীত যেমন উজ্জ্বল, বর্তমানও তেমনিই। স্কুলের বহু প্রাক্তন ছাত্র আজ দেশ-বিদেশে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

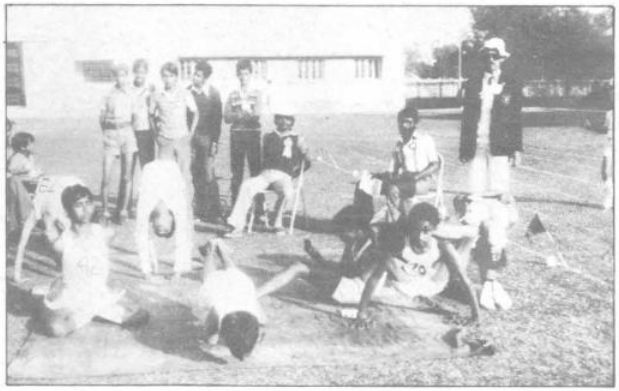

প্রথম ছাত্র

৭১৯ নম্বর পেয়ে **কৌশিক দেবদাস** এবার সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে। বাবা ডঃ অনন্ত দেবদাস অধ্যাপক। কৌশিক বাবার কাছ থেকে পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য পায়। ও নিজে দিনে পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পড়াশোনা করে। ক্লাসের পড়া বাদ দিলে গল্প কবিতা উপন্যাসও সময় পেলে পড়ে। খেলাধুলোর ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। ডাকটিকিট সংগ্রহ কৌশিকের প্রিয় শখ। ভবিষ্যতে সে কী হবে এখনও ঠিক করেনি। ঘুরতে ভাল লাগে। আগামী পরীক্ষাগুলিতে আরও অনেক ভাল রেজাল্ট করবে, এবং সেইভাবে তৈরিও হচ্ছে।

শৌনক সমাজদার মোট ৭৫২ নম্বর পেয়ে নবম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে। বাবা প্রণবকুমার সমাজদার অধ্যাপক। মা জলপাইগুড়ির একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন ; ছেলের পড়াশোনার জন্য সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। শৌনকও দিনে পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পড়াশোনা করে। পাঠ্যপুস্তকের পড়া ছাড়াও গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালবাসে। কুইজ এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নেয় এবং ইতিমধ্যে বহু পুরস্কারও পেয়েছে। পড়াশোনার ব্যাপারে মা-বাবা দু'জনেই ওকে সাহায্য করেন। এ ছাড়াও শৌনকের দু'জন প্রাইভেট টিউটর আছেন।

রাহুল সরকার এবার নবম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে দশম শ্রেণীতে উঠেছে। রাহুল এবার পেয়েছে মোট ৬৪৮ নম্বর। বাবা ডঃ মৃত্যুঞ্জয় সরকার ছেলেকে এঞ্জিনিয়ার করার স্বপ্ন দ্যাখেন, রাহুলেরও ইচ্ছে ও এঞ্জিনিয়ার হবে। রাহুল দিনে ছ'-সাত ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করে। রাহুলরা দু' ভাই, ওর দাদা ডাক্তারি পড়ছে। রাহুলের প্রিয় নেশা গান শোনা আর ডাকটিকিট সংগ্রহ। ও প্রায় হাজারখানেক টিকিট সংগ্রহ করেছে। ওর প্রিয় শিল্পী কিশোরকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুচিত্রা মিত্র। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ওর গল্প-উপন্যাস পড়তে খুব ভাল লাগে। ওর প্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নিজে প্রবন্ধ লেখে। সময় পেলে ক্রিকেট খেলে। সুনীল গাওস্কর, ইমরান খান ওর প্রিয় ক্রিকেটার।

শুধু কোচবিহার জেলা নয়, গোটা উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই স্কুলের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো স্কুল—তা বলে এর কৌলীন্য এতটুকু ম্লান হয়নি কখনও।"

স্কুলের ছাত্রাবাসটিও বেশ বড়, একসঙ্গে ৫০ জন ছাত্র থাকতে পারে।

স্কুলের পড়াশোনার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে প্রধানশিক্ষক জানালেন, "আমাদের স্কুলের ছাত্ররা প্রায় প্রতি বছরই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে জেলায় কিংবা সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। স্কুলের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক।"

স্কুলের অনেক ছাত্র এন· সি· সি· ট্রেনিং নেয় এবং প্রতি বছর ট্রেনিং ক্যাম্প-এ যোগ দিয়ে নিজেদের তথা স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা এবং খেলাধুলোতেও জেলায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে এই স্কুল। সারা বছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্ররা অংশ নেয়। মনীষীদের জন্মদিন, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, টিচার্স ডে, প্রাইজ ডে প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে স্কুলের ছাত্ররা।

খেলাধুলোর বিষয়ে বলতে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গোপেশচন্দ্র দত্ত জানালেন, "১৯৮৬ সালে আমাদের স্কুলের ছাত্ররা ডি· এস· ও· পরিচালিত কোচবিহার জেলা আন্তঃবিদ্যালয় ক্রিকেটে জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়ে রাজ্যস্তরে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এবং ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে ক্রিকেটে জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়ে কলকাতায় যায়।

যোগাসন প্রতিযোগিতায় ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে আমাদের স্কুল জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৮৭ সালে আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছাত্ররা জিমনাসটিক্স-এ এবং ১৯৮৭ সালে ভলিবলে জেলা চাম্পিয়ান, ১৯৮৬ সালে রানার্স হয়।"

স্কুলের পঠনপাঠনের বিষয়ে বলতে গিয়ে ইংরেজির শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কর্মকার এবং প্রিয়ব্রত রক্ষিত জানালেন, "প্রথম থেকেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই স্কুলের যে সুনাম, তা আজও অক্ষুণ্ণ, নতুন পাঠক্রমে ইংরেজি নিয়ে অনেক স্কুল নাকি একটু অসুবিধায় পড়েছে আমরা শুনিতে পাই। আমাদের এখানে কিন্তু আমরা তেমন কোনও অসুবিধা বোধ করি না। আসলে আমরা এমনভাবে ছেলেদের পড়াই, এমন পদ্ধতিতে ইংরেজিটাকে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি, যাতে ছাত্রদের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের তো মনে হয়

১৯৮৮ সালে জেলা চ্যাম্পিয়ান স্কুলের ক্রিকেটটিম

আগেকার পাঠক্রমের থেকে বর্তমান মাধ্যমিক পাঠক্রম অনেক বেশি বাস্তবানুগ এবং সহজ।"

অঙ্কের শিক্ষক সুহাসকুমার সরকার এবং ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক সরোজকুমার চক্রবর্তী কথা প্রসঙ্গে জানালেন, "অনেকে বলেন গ্রামের ছেলেরা নাকি বিজ্ঞান বিভাগে খুব একটা যেতে চায় না ; আমাদের স্কুলের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা উলটো। এখানে বিজ্ঞান বিভাগেই আসতে চায় বেশির ভাগ ছেলে এবং ফলাফলও ভাল করে। অঙ্কে তো মাধ্যমিকে অনেকেই১০০-র মধ্যে ১০০ পেয়ে যাচ্ছে,তিনটি চারটি বিষয়ে লেটার তো হামেশাই পায়। আমাদের স্কুলে তিনটি ল্যাবরেটরি আছে। তিনটি ল্যাবরেটরিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, সেখানে আমরা ছাত্রদের হাতে-কলমে শেখাই।" সহকারী প্রধানশিক্ষক মোহিতরঞ্জন কুণ্ডু জানালেন, "দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুলে শিক্ষকতা করছি। স্কুলের সুনামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষকদের উজ্জ্বল ভূমিকা। আমরা সব সময় লক্ষ রাখি ছাত্রদের কত সহজে একটা জিনিস বোঝানো যায়, সেই দিকে। আমাদের একটা সমস্যা আছে, বর্তমান পাঠক্রমে কারিগরি বিভাগ উঠিয়ে দেওয়ায় এই বিভাগের বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি এখন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও ওই জিনিসগুলির কোনও গতি হচ্ছে না।"

সবার কথা শেষ হলে প্রধানশিক্ষক কল্লোল চক্রবর্তী স্কুলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "এই স্কুলের যে সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক সুনাম, যে ঐতিহ্য, আমরা তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। কাজ না করা বা কাজে ফাঁকি দেওয়ার কথা আমরা এখানে-ওখানে শুনি, আমাদের স্কুলে কিন্তু ওই জিনিসটা এখানও ঢোকেনি। আমার শিক্ষকবন্ধুরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। সমস্যার কথা যদি বলেন, বলব আছে। যেমন,এক্ষুনি আমাদের ভীষণ প্রয়োজন একজন লাইব্রেরিয়ানের, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জীব-বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকেরও খুব দরকার। প্রয়োজন একজন ইংরেজির শিক্ষকের। অফিসের কাজের জন্য একজন ক্লার্কের প্রয়োজন—এগুলো আমরা চাইছি, কিন্তু পাচ্ছি না। তবু বলব এইসব অসুবিধার মধ্যেও আমরা এখনও অনেক ভাল জায়গায় আছি। জীবনে মানুষ গড়ার কাজকে যখন ব্রত করে নিয়েছি,তখন এভাবেই চলতে হবে আমাদের।"

নীরদ রায়

ফোটো : অলক কুণ্ডু

ছোটদের পড়তেই হবে যে-সব বই

শেখর বসুর

কালজয়ী কাহিনীর সংকলন

বারোটি কিশোর-ক্লাসিক

দাম ২০·০০

গত চারশ বছর সময়কালের মধ্যে যত বিদেশী ক্লাসিক বেরিয়েছে, তার মধ্যে থেকে প্রধান বারোটিকে বেছে নিয়েছেন শেখর বসু তাঁর এই আশ্চর্য গ্রন্থে। ঝরঝরে গতিময় বাংলায় ছোটদের মনের মতো করে শুনিয়েছেন সেই বারোটি ক্লাসিকের গল্প।

যুগোত্তীর্ণ এই কাহিনীগুচ্ছে রয়েছে—দি স্টোরি অব ডন কুইক্সোট, রবিনসন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেল্‌স, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন, দি হাঞ্চব্যাক অব নোটরদাম., দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, আংকল টমস কেবিন, হাইডি, টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সি, দি অ্যাডভেঞ্চারস অব টম স্যায়ার, ট্রেজার আইল্যাণ্ড এবং দি হাউণ্ড অব দ্য বাস্কারভিল্‌স।

নিছক ভাষান্তর নয়, পৃথিবীবিখ্যাত এই গ্রন্থগুলির মূল মেজাজ ও সৌন্দর্যের সঙ্গেই পরিচয় করানোর প্রয়াস এই পরিশ্রমী ও অন্তরঙ্গ সৃষ্টিকর্মে। অসাধারণ এই গ্রন্থের অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে—লেখক-লেখিকাদের সচিত্র জীবনী, প্রতি কাহিনীর প্রেক্ষাপটের বর্ণনা এবং কিশোর-ক্লাসিক তথা অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তর দুর্লভ তথ্যে ভরপুর সুদীর্ঘ, সজীব একটি আলোচনা।

এই লেখকের কৌতুকস্নিগ্ধ ও চমকপ্রদ একটি কিশোরোপন্যাস:

সাত বিলিতি হেরে গেল ৮·০০

সুভাষ ভট্টাচার্যের

বাংলা শেখার আনন্দপাঠ

বাংলা ভাষার সাত-সতেরো

দাম ১০·০০

চঞ্চল বালিকা, নাকি চঞ্চলা বালিকা ? দরিদ্ররা নাকি দরিদ্রেরা ? কোনটা ঠিক ? কী কখন লিখতে হবে, কিই বা কখন ? রাম ও শ্যাম হবে, নাকি রাম আর শ্যাম ? ব্যাবসা লিখব, না ব্যবসা ? 'রিবেট বাদ দিয়ে দাম কত ?'—এই বাক্যটি কি শুদ্ধ না অশুদ্ধ ? শুধু কি বানান আর বাক্যগঠন নিয়ে এমনতর সমস্যা আমাদের, উচ্চারণ নিয়েও তো বিস্তর খটকা। লিখি অ, বলি ও। কখনও অ-কারান্ত উচ্চারণও করি। কখন করি ? কেনই বা করি ?

বাংলা ভাষার এমন সাত-সতেরো নিয়েই এই বই। কিছু মজা আর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে মজাদার আলোচনা। আলোচনা তো নয়, যেন গল্প। বাংলা ভাষার প্রয়োগ নিয়ে যাঁর অসামান্য গ্রন্থ, সেই সুভাষ ভট্টাচার্যই ছোটদের হাতে তুলে দিয়েছেন এই আনন্দপাঠ।

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

রহস্য, রোমাঞ্চ, অলৌকিক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
নৃসিংহ রহস্য ১০·০০

অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের
চেনাশোনার বাইরে ১২·০০

সত্যজিৎ রায়ের
ব্রেজিলের কালো বাঘ (অনুবাদ-গ্রন্থ)
১৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
হলদে বাড়ির রহস্য
ও দিনে ডাকাতি ৮·০০
ডুংগা ১০·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভূমিকম্পের পটভূমি ৬·০০

হাত বাড়ালেই ভূত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
রাতের প্রহরী ২৫·০০
পাঁচমুণ্ডির আসর ১০·০০

লীলা মজুমদারের
সব ভুতুড়ে ২০·০০

সত্যজিৎ রায়ের
তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আঁধার রাতের অতিথি ৮·০০

শৈলেন ঘোষের
ভূতের নাম আকুশ ১০·০০

ঘুসি মারার কৌশল 'সিকেন জোদান জুকি'

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় যে দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছি তার নাম 'সানচিন্ দাচি'। এই ভঙ্গি থেকে কিওকুশিন ক্যারাটের হাতের কৌশল, যেমন পাঞ্চ (ঘুসি মারার কৌশল), ব্লক (মার আটকানোর কৌশল), চপ (হাতের সাহায্যে মারের আর একরকম কৌশল) এই কৌশলগুলো অনুশীলন করতে হবে। হাতের সাহায্যে মারার কৌশল এবং মার আটকানোর কৌশলগুলোর মধ্যে আমি প্রথমে পাঞ্চ বা ঘুসি মারার কৌশল নিয়ে একে-একে আলোচনা করব। ক্যারাটে শুরুর আগে মনকে শান্ত করে নেওয়া উচিত, এবার প্রথমে রেডি স্টান্স বা 'ইওই দাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর হাতের ও পায়ের ভঙ্গি ও জায়গার হেরফের করে 'সানচিন্ দাচিতে দাঁড়াতে হবে। হাতের মুঠো শক্ত করে দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। হাত দুটো যেন শরীরের মধ্য ভাগের রেখা বরাবর নিজের থুতনির সমান উচ্চতায় থাকে। এইবার বাঁ হাতটাকে সামনে রেখে ডান

হাতটাকে মুঠো শক্ত রেখে কনুই থেকে মুড়ে মুঠোটা ডান দিকে পাঁজরার সঙ্গে স্পর্শ করে রাখতে হবে। ডান মুঠোর আঙুলগুলো ওপর দিকে রাখতে হবে। বাঁ হাতের মুঠোয় আঙুলগুলো নীচের দিকে রাখতে হবে। এবার মুখে ঘুসি মারার জন্য

শরীর ও হাত দুটোর অবস্থা ঠিক হল।

সিকেন জোদান জুকি (মুখে ঘুসি মারার কৌশল) : এই শব্দটা জাপানি, সিকেন কথাটার মানে মুঠো, জোদান কথাটার মানে শরীরের ওপরের অংশ (গলা থেকে মাথা পর্যন্ত), জুকি কথাটার মানে আঘাত। জোদান জুকি-সোজাসুজি থুতনি লক্ষ্য করে মারার অভ্যাস। হাতের মুঠো শক্ত রেখে তর্জনী ও মধ্যমার যে প্রথম সন্ধিস্থল উঁচু হয়ে থাকে, সেই অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষের মুখে আঘাত করতে হবে। হাতের অন্য অংশ স্পর্শ করা সঠিক পদ্ধতি নয়। এবার ডান মুঠোটা ডান পাঁজরা স্পর্শ করা অবস্থা থেকে সামনের দিকে ছুঁড়তে হবে, ডান মুঠোর আঙুলগুলো সামনের দিকে যাবার সময়ও ওপর দিকে থাকবে। অনুশীলনের সময় যে-কোনও কৌশল নিজের উচ্চতায় সমান ধরে প্রয়োগ করা উচিত। ডান মুঠোটা যখন সামনের দিকে আঘাত করার জন্য যাচ্ছে তখন আঘাত করার একটু আগে কবজি থেকে ঘুরে (হাতের মুঠোর আঙুলগুলো

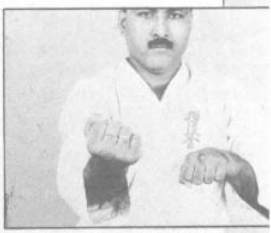

নীচের দিকে চলে যাবে) গিয়ে তর্জনী ও মধ্যমার প্রথম সন্ধিস্থল সামনের দিকে ঠিক অবস্থায় আসবে ও প্রতিপক্ষের থুতনিতে আঘাত করবে। ডান হাতের মুঠো যখন সামনের দিকে যাবে বাঁ হাতের মুঠো পিছনে নিজের দিকে আসবে। বাঁ হাতের মুঠো পিছনের দিকে আসার সময় আঙুলগুলো নীচের দিকে থাকবে এবং বাঁ পাঁজরা স্পর্শ করার আগে কবজি থেকে ঘুরে আঙুলগুলো ওপর দিকে হয়ে যাবে। এইভাবে একবার ডান হাত দিয়ে ঘুসি তারপর বাঁ হাত দিয়ে ঘুসি মারার অনুশীলন চলবে প্রতি হাতে কুড়িবার করে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে শরীরের ওপরের অংশ কোমর থেকে যেন সামনে সোজা হয়ে থাকে, কবজি সোজা ও শক্ত থাকবে। মুঠো যেন শক্ত থাকে, ও সবশেষে খেয়াল রাখতে হবে যে, হাত সামনে ছোঁড়ার সময় (ঘুসি মারার জন্য), যেন কনুই বা হাত ও কাঁধের সন্ধিস্থলে ঝাঁকুনি না লাগে। প্রথমে আস্তে-আস্তে অভ্যাস করা উচিত, তারপর আস্তে-আস্তে গতি বাড়ানো দরকার। *ফোটো : উৎপল সরকার*

ধাঁধা

বাজার থেকে ছোট্কা ফিরেছে ঘণ্টাখানেক আগে। ফিরে এসে এক কাপ চা খায় ছোট্কা, বিশেষত, ছুটির দিন হলে। আজও খেয়েছে। আর তখনই বলে গেছে আমায়, ঘণ্টাখানেক বাদে যেন একবার উপরে যাই। কারণটা অবশ্য বলার দরকার হয়নি। ছোট্কা নিজেই জানে, আজ ধাঁধা দেবার দিন। আমি তো জানিই। উপরে গিয়ে দেখি ছোট্কা ধাঁধার খাতাটা খুলে কীসব লিখছে। আমাকে দেখেই বলল, "ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল সতুবাবু? কী কাণ্ড, আর আমার কবিতাটা লেখাই হল না!" কবিতা! ছোট্কা কি ধাঁধার কথা ভুলে কবিতা লিখতে বসে গেছে? তাও আবার ধাঁধার খাতায়! আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। ছোট্কা আমার উদ্‌ভ্রান্ত মুখটা লক্ষ করেছে। তখনই তাই মজার মুখ করে বলল, "এখনও কবিতাটা হয়নি। তবে ছড়া, না পুরোপুরি ছড়াও বলব না, সাঙ্কেতিক একটা ছড়া তৈরি হয়েছে। শুনবে সতুবাবু?" বলেই, উত্তরের অপেক্ষা না করে ছোট্কা পড়ে যেতে লাগল, "গ্রামের বুড়ি/ ডিমের ঝুড়ি/ গাড়ির চাকা/ ডিমের ঝাঁকা।/ ভাঙল ডিম/ হিসেবহীন।/ হিসেব চাই/ সেই ধাঁধাই⋯।"
শেষ লাইনে ধাঁধার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। ও হরি, ধাঁধা আছে এর মধ্যে! ছোট্কা তখন হো-হো করে হাসছে। হাসি সামলে বলল, "না, পদ্যে হল না, গদ্যেই বলি ধাঁধাটা। লিখে নাও সতুবাবু।" আমি লিখে নিলাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ ঝুড়িতে করে ডিম এনে বাজারে বিক্রি করেন এক গ্রামের বুড়ি। সেদিন কী হল, এক গাড়ির ধাক্কায় বুড়ির ডিমের ঝুড়ি গেল ছিটকে, বুড়ি পড়ে গেলেন রাস্তায়। লোক জমে গেল। ডিমের বুড়িকে গাড়ির মালিক প্রশ্ন করলেন, 'খুব লাগেনি তো?' বুড়ির অবশ্য সত্যিই তেমন লাগেনি। কিন্তু ডিমের শোকে কাতর। গাড়ির মালিক তখন টাকা দেবেন বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'টা ডিম ছিল ঝুড়িতে?' উত্তরে বুড়ি যা বললেন, তাই নিয়েই এই ধাঁধা। 'ডিম ছিল পঞ্চাশ থেকে একশোর মধ্যে, ঠিক কত খেয়াল নেই। তবে হ্যাঁ, এটা মনে আছে যে, একবার দুটো করে আর-একবার তিনটে করে সব ক'টা ডিম বাড়িতে সাজিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম একটা ডিমও পড়ে থাকে না। কিন্তু পাঁচটা করে সাজাতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল, তখন দেখেছিলাম—তিনটে ডিম আলাদা থেকে যায়।'
এ-থেকে কি বলা সম্ভব, কত ডিম ছিল বুড়ির ঝুড়িতে?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ কল কষ্টদায়ক?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
মারমলাট
গতবারের উত্তর ॥ (১) ছাত্রীসংখ্যা ৫৬, ছাত্রসংখ্যা ৪০। (২) পলস্তারা। (৩) পলিতকেশ।

সত্যসন্ধ

কত কথা

পুষ্পটি তিন অক্ষরে
শেষ দুটিতে ফল,
বলতে হবে টক্ করে
পারিস যদি বল।

উপরের ছড়াটি হঠাৎই আমার হাতে এসেছে। ছড়া তো নয়, রীতিমত ধাঁধা! দ্যাখো তো এতে যা জানতে চাওয়া হয়েছে

তা তোমরা ঠিক-ঠিক বলতে পারো কি না!
২। শব্দ বাড়িয়ে সমার্থক শব্দ আগেরবার করেছ। এবারে সে-রকম আরও দুটি শব্দের অর্থ হল। এই অর্থ ধরে দুটি করে বর্ধিতাকার সমার্থক শব্দ ভাবতে

হবে। বর্ধিতাকার বলতে সেই একটাকে বাড়িয়ে আর একটা 'ক্রমেল' থেকে 'ক্রমেলক'। (ক) খরগোশ। (খ) পাখি।
৩। কোন্ মামার আওয়াজ শুনলে বুক ঢিপঢিপ করে?

উত্তর : ১। বকুল (শেষ দুটি অক্ষরে কূল)। ২। (ক) শশ, শশক। (খ) বিহঙ্গ, বিহঙ্গম। ৩। দামামা।

কথক

মজার খেলা

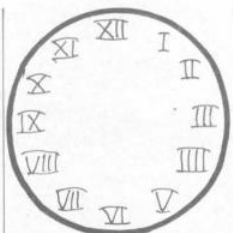

ঘড়ির ছবি আঁকা খুব সহজ, তাই না?
হ্যাঁ, আমরা সবাই পারি ঘড়ির ছবি আঁকতে। একটা গোল এঁকে তার মধ্যে লিখে যাওয়া এক থেকে বারো। কাঁটা আঁকার ঝামেলা না থাকলে তো কথাই নেই।
এবারের মজার খেলায় এমনই সহজ একটা ঘড়ির ছবি আঁকতে হবে। কাঁটা আঁকার দরকার নেই। শুধু যা মনে রাখতে হবে তা হল, সংখ্যাগুলো লেখা হবে রোমান ছাঁদে। তাও সবক্ষেত্রে চেনা চেহারা মিলবে না, তার বদলে বসবে সহজ একটা

চেহারা। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে, কী বলতে চাইছি:
লক্ষ করে দ্যাখো, চারটাকে কেমন অন্যভাবে লেখা হয়েছে। এর অবশ্য একটা কারণ রয়েছে, সমাধান দেখলেই জানতে পারবে। তার আগে সমস্যাটির কথা বলি।
ঘড়িটাকে চারটে ভাগে ভাগ করতে হবে। এমন চারটে ভাগ, যাতে প্রত্যেক ভাগের যোগফল হয় ২০।
তোমরা নিজেরাই এর উত্তর করতে পারবে। যারা পারবে না, তাদের জন্য, শুধু তাদেরই জন্য একটা সমাধান দেওয়া হল—

মজারু

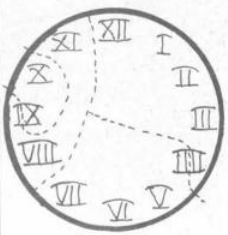

ধাঁধানো ছবি

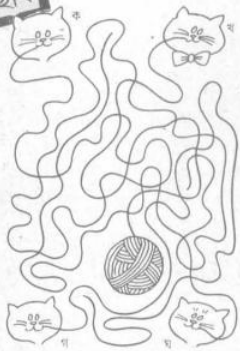

চারদিকে চারটি বিড়াল। প্রত্যেকটি বিড়াল মুখে ধরে আছে সুতো। কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে কোন বিড়ালের সুতোয় বাঁধা আছে উলের বল। দ্যাখো না চেষ্টা করে না পারো কি!

উত্তর : খ-বিড়াল

চিত্রক

হাসিখুশি

ছোট একটি ছেলেকে কাঁদতে দেখে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি হারিয়ে গেছ খোকা?" খোকা বলল, "দেখুন না, আমি আমার দিদিমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, আর ওঁর সর্বক্ষণই কিছু-না-কিছু হারিয়ে ফেলা অভ্যেস।"

প্রতিবেশী : বান্টি, তুমি এত জোরে ছুটছ কেন?
বান্টি : দুটো ছেলের মধ্যে মারামারি বন্ধ করবার জন্য আমি ছুটছি!
প্রতিবেশী : ছেলে দুটি কে?
বান্টি : একজন বাবু আর একজন আমি নিজে।

শিক্ষক : কোন তিনটি কথা আজকাল ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে?
ছাত্র : আমি জানি না।
শিক্ষক : তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ।

কিসের ফোটো

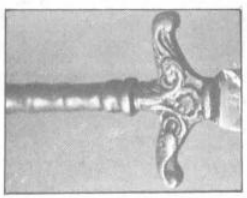

গত সংখ্যায় ছিল চার টুকরো পেঁয়াজের ফোটো
ফোটো : রবিন বিশ্বাস

ট্যানগ্রাম

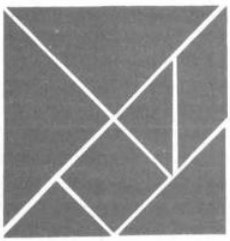

গত সংখ্যায় তোমরা হয়তো অনেকেই পাখি বানাতে পেরেছ। যারা পারোনি তাদের জন্য সমাধান দেওয়া হল।

শুরুতেই তোমাদের মানুষের বিচিত্র ভঙ্গিমার কথা বলেছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখবে তোমাদের আশপাশে কত মানুষ, তাদের কত বিচিত্র ভঙ্গিমা। কেউ দৌড়চ্ছে, কেউ বসে আছে, কেউ-বা আবার পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে শুয়ে আছে।

ইচ্ছে করলে এ-সবই তোমরা সাতটা টুকরো দিয়ে বানাতে পারো। আর তার জন্য চাই খুব ভালভাবে দেখতে শেখা। এবার বেশ কয়েকটি মানুষের ভঙ্গিমা দেওয়া হল। নিজেরা সেগুলো দেখে বানাও। আর শেষ ছবিটার সমাধান রইল না, চেষ্টা করে দ্যাখো পারো কি না।

প্রবীর

আঁকিবুকি

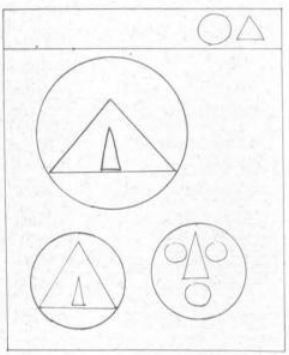

বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে

এবারে তোমরা আঁকার পাতায় দ্যাখো বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে কেমন ফুটে উঠছে মুখের আদল। অন্য কিছু কল্পনা করে আঁকো না তোমরা! দেখবে তোমরাও খুব মজা পাবে।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই মলাটে বন্দী ভূত

ভূতের গল্প
সম্পাদনা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শঙ্খচিল পাবলিকেশন
কলকাতা-৬
১২ টাকা

বাংলা-সাহিত্যে একদা ভূতের প্রবল আধিপত্য ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর বাড়াবাড়ন্ত, ভূত-সমাজ ইদানীং বড় অসহায়। ভূত সংরক্ষণের জন্য আজকাল লেখক-পাঠক কেউই তত মাথা ঘামান না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় দরদী লেখক। তিনি ভূত-গোষ্ঠীর এই বিষম বেদনা মর্মে-মর্মে অনুভব করেছেন বলেই দুই মলাটের মধ্যে হরেক প্রজাতির ভূতকে ধরে ফেলেছেন। লিখেছেন ভূতদের সুখদুঃখ নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ মর্মস্পর্শী ভূমিকা। ভূত-সম্প্রদায় এবং ভূতপ্রেমিক পাঠকেরা তাঁর প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, বিমল কর, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের ভৌতিক গল্পগুলির মধ্যে আনন্দ-বেদনা, রহস্য রোমাঞ্চ ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠেছে। কোথাও লেখকের ভূত, কোথাও দেশপ্রেমিকের

ভূত— পাতায়-পাতায় বিস্তর ভূতের দাপাদাপি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে কেবল পছন্দ করবে না ভূতেরা, কেননা, তিনি ভূত-বিশ্বাসে আঘাত করেছেন। তাঁরই আঁকা অসামান্য প্রচ্ছদের আর দীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকার কথা তো আগেই বলেছি। ঘরে-ঘরে বাঁধিয়ে রাখবেন তেনারা!

ছোটদের জন্য অন্যরকম বই

স্টার ওয়ার
প্রভাত হালদার
সোমা প্রকাশন
কলকাতা-৯
১৬ টাকা

ছোটরা এখন আর তেমন রূপকথার গল্প পড়ে না। সায়েন্স ফিকশন, ফ্যানট্যাসিতে ডুবে থাকে। তাই বিস্তর এই ধরনের গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে, বইও বেরোচ্ছে প্রচুর। কিন্তু সত্যিকারের যোগ্য লেখকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অনেকেই ভালভাবে বিজ্ঞান না জেনে কল্পনায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। নিরাশ হচ্ছেন পাঠক। এইরকম সময়ে প্রভাত হালদারের 'স্টার ওয়ার' পড়ে মন খুশিতে টইটম্বুর হয়ে উঠল। জমজমাট কাহিনী। ছোটদের ভাল লাগবে। আণবিক যুদ্ধের পটভূমিকায় ছোটদের উপযোগী উপন্যাস রচনা সহজ কাজ নয়, কিন্তু প্রভাতবাবু তা পেরেছেন। স্টার ওয়ার প্রকৃতই প্রাণবন্ত রচনা। তবে ভাষাভঙ্গি তেমন আধুনিক নয়। ছোটদের লেখার গদ্য হওয়া চাই ঝরঝরে, সংযত।

ছোটদের বইয়ে বানান-ভুল একেবারেই থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই বইতে অজস্র ভুল আছে।
বইটিতে অনেক পাতাজোড়া ছবি আছে। কিন্তু কোথাও আলাদা করে শিল্পীর নাম নেই। নেই প্রচ্ছদশিল্পীর নামও।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

মানস-ভ্রমণের অনুপম চিত্র

ত্রিকৈলাস ও মানস-সরোবর
শ্যামসুন্দর বসু
আনন্দ পাবলিশার্স, লিমিটেড,
কলকাতা-৯
২৫ টাকা

তুষারমৌলি হিমালয়ের কোলে এক আদি তীর্থ কৈলাস ও মানস সরোবর। কৈলাসে বাস করেন মহাদেব। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুরাণ গ্রন্থে এর অজস্র বর্ণনা আছে। কেবল ধর্মীয় মাহাত্ম্য নয়, কৈলাস বা মানস সরোবরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও প্রবাদতুল্য। এই অনুপম প্রকৃতি বশিষ্ঠ দেব, দত্তাত্রেয় প্রমুখ বিখ্যাত মুনি-ঋষিদের পদার্পণে পুণ্যস্থান হয়ে উঠেছিল। রাবণ, অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম সকলেই কখনও-না-কখনও এই পুণ্যক্ষেত্রে এসেছেন। কৈলাস পর্বতের নানা নাম পাওয়া যায় পুরাণে—বৈদ্যুত পর্বত, হেমকূট, মেরু পর্বত ইত্যাদি। মহারাজ অশোক কুমায়ুনের কত্যুরি রাজা নন্দীদেবকে তিব্বত জয় করতে পাঠালে তিনি এই অঞ্চলকে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক জল। বহু শতাব্দী ধরেই তিব্বতের অন্তর্গত কৈলাস চিনের অংশভুক্ত। তা সত্ত্বেও বহু তীর্থযাত্রী বন্ধুর পথ অতিক্রম করে কৈলাস ও মানস ভ্রমণে গেছেন। ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর এই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

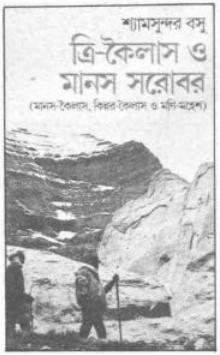

১৯৮১ সালে চিন ভারতীয় যাত্রীদের কাছে কৈলাস এবং মানসকে উন্মুক্ত করে দেয়। তবু বাধা-বিঘ্ন এখনও কিছু কম নয়। শ্যামসুন্দর বসু তাঁর 'ত্রিকৈলাস ও মানস-সরোবর' গ্রন্থে এই মানস-ভ্রমণের সুন্দর ছবি এঁকেছেন। কৈলাস ও মানসের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি এবং মানুষজনের বর্ণনায় কৈলাস ও মানস সরোবর আমাদের কাছে প্রায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ঠিক একইভাবে হিমালয়ের এ-পারে, হিমাচল প্রদেশের দুই প্রান্তে, কিন্নর-কৈলাস ও মণি-কৈলাস বা মণিমহেশের বর্ণনাও লেখকের অভিজ্ঞতার স্পর্শে হয়ে ওঠে বিশিষ্ট সাহিত্য-কীর্তি। লেখকের এটি প্রথম গ্রন্থ, সে হিসেবে যথেষ্ট সার্থক।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

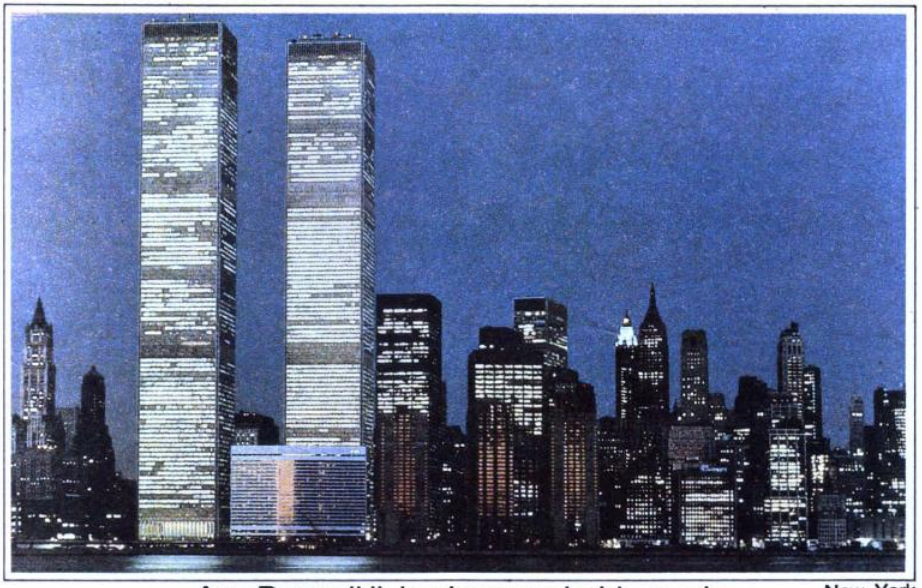

New York

Any Bengali living here probably reads Prabasi Anandabazar every week.

Prabasi Anandabazar was created exclusively
for the Bengalis living abroad.
Every week, we lead our readers to places of great interest.
We give them a complete package of news and features.
With topics ranging from politics to recipes; from
beauty-tips and fashion to literature and sport.
Thirty two pages with offset-printing clarity—
including eight pages in sparkling colour.
We sell the kind of quality that's tried and true.
We give advertisers an exclusive, affluent clientele
and a perfect environment.

Prabasi Anandabazar: The international weekly from The Ananda Bazar Group of Publications.

প্রবাসী আনন্দবাজার

একমাত্র সার্ফ

"হ্যাঁ", ললিতা দেবী বলেন, "সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে,সবচেয়ে ভাল ক'রে, তাই আমার তো আর অন্য কিছু নয়, শুধু সার্ফই চাই!"

একমাত্র সার্ফই সবচেয়ে সাদা ক'রে ধোয়।